ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সংগ্রামে
অবিভক্ত বাঙলা

সুস্নাত দাশ

প্রাইমা পাবলিকেশনস্
৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল, ১৯৬১

প্রকাশক :
উপমা সেনগুপ্ত
৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর :
মদনমোহন কুমার
মদন প্রেস
১/১ সি, গোয়াবাগান স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ : সুবোধ দাশগুপ্ত

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

ফ্যাসিবাদের উদ্ভব, প্রকৃতি ও আগ্রাসী রূপ

বিংশ শতাব্দীতে সব থেকে ভয়ঙ্কর, অমানবিক ও প্রতিক্রিয়াশীল ভাবাদর্শ রূপে ফ্যাসিবাদের আত্মপ্রকাশ সমগ্র মানব-সভ্যতার সামনে এক কালান্তক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছিল। বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে এরকম প্রলয়ঙ্কর ভাবাদর্শ ইতিপূর্বে আর দেখা যায় নি। সব থেকে বিস্ময়ের বিষয় হলো, যে-ইউরোপ ছিল সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা, উদারনৈতিকতা ও সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শের ধারক ও বাহক, সেই ইউরোপই হয়ে উঠল এই নিকৃষ্ট মতাদর্শের সূতিকাগার।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের অবশ্যম্ভাবী ফল ছিল মানবসমাজের হিতকারী শক্তিরূপে কমিউনিজমের উত্থান। সমাজ-বিকাশের ঐতিহাসিক দ্বান্দ্বিক নিয়মে কমিউনিজমই হতে চলেছিল আগামী দিনের মানবসভ্যতার প্রধান চালিকা শক্তি।

কিন্তু সমাজ-বিকাশের এই অনিবার্য ধারাটিকে অনেকেই আবার গ্রহণ করতে পারেনি। কারণ, কমিউনিজমের বিজয়ের অর্থ হলো—ধনতন্ত্রবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের অবসান। তাই মূলত কমিউনিজমকে প্রতিহত করতে এবং বিশ্বজোড়া ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনকে বজায় রাখতে, এককথায় ইতিহাসের চাকাকে উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দেবার উদ্দেশ্যেই প্রতিবিপ্লবী ও প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্তরূপে আবির্ভূত হয়েছিল—ফ্যাসিবাদ।

১. ফ্যাসিবাদের স্বরূপ :

ফ্যাসিবাদ কেন, কখন ও কিভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল সে-সম্পর্কে নানা-ধরনের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা রয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয় পৃথিবীর উপনিবেশগুলির মানচিত্রের পরিবর্তন ঘটিয়ে। বনেদী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি যুদ্ধজয়ের মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত দুর্বলতর সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির হাত থেকে অনেক উপনিবেশ কেড়ে নেয় এবং একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। বিশ্বের এক বড় অংশই হয় তাদের পদানত।

ভার্সাই-চুক্তির পর ইউরোপে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে-ভারসাম্য সৃষ্টি হয় তার পরিবর্তনের অভিলাষই হলো পরবর্তী যুগের ফ্যাসিবাদের আবির্ভাবের প্রাথমিক কারণ—এই অভিমত পোষণ করেন অধিকাংশ ঐতিহাসিক। ইংল্যাণ্ড-ফ্রান্স বনাম ইতালি-জার্মানী শক্তিগোষ্ঠীর বিরোধ এর থেকেই জন্মলাভ করে। চরিত্রগত বিচারে এটা ছিল অবশ্যই একপ্রকার সাম্রাজ্যবাদী বিরোধ ও

দ্বন্দ্ব। অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই দুটি পরস্পরবিরোধী সাম্রাজ্যবাদীগোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধ হতে চেষ্টা করেছে সাম্যবাদী সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে। এর উদাহরণও ইতিহাসে আছে।

ফ্যাসিবাদ জন্মলাভ করে সঙ্কটাচ্ছন্ন পুঁজিবাদের গর্ভ থেকেই। রজনী পাম দত্ত তাঁর গ্রন্থের[১] দ্বাদশ অধ্যায়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তীকালে পুঁজিবাদের বিশ্বজোড়া সংকট, 'পুঁজিবাদের স্থিতিশীলতা' তত্ত্বের অন্তঃসারশূন্যতা এবং ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদের গর্ভ থেকে কিভাবে ফিন্যান্স ক্যাপিটাল বা লগ্নীপুঁজির মালিকদের সাহায্যপুষ্ট চরম সন্ত্রাসবাদী ফ্যাসিস্ত রাষ্ট্র আত্মপ্রকাশ করে—তথ্য ও যুক্তির সাহায্যে তা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন।

ফ্যাসিবাদের শ্রেণীচরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আর. পি. দত্ত বলেছেন যে, এর কোনো সুসংবদ্ধ সংজ্ঞা নির্দেশ করা যায় না। তবে একথা অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট-ভাবে বলা যায় যে, ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র হলো ফিন্যান্স ক্যাপিটালের মালিকদের নিষ্ঠুরতম সন্ত্রাসবাদী একনায়কতন্ত্র।

রজনী পাম দত্ত ফ্যাসিবাদের কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। বৈশিষ্ট্যগুলি আধুনিক ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কোনো কোনো পর্যায়ে (এমনকি তা কোনো ফ্যাসিস্ত রাষ্ট্র অপেক্ষা কোনো অংশেই কম নয়) কমবেশি দেখতে পাওয়া যায়। বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ :

এক) উৎপাদন কৌশলের অগ্রগতি এবং শ্রেণীদ্বন্দ্ব-সঞ্জাত আসন্ন বিপ্লবের মোকাবিলা করে ধনতন্ত্রকে রক্ষা করা।

দুই) স্বাধীন শ্রমিক আন্দোলনকে সীমাবদ্ধ ও দমন করা এবং সংগঠিত শ্রেণী-সহযোগিতার ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

তিন) ক্রমাগত পার্লামেণ্টারী গণতান্ত্রিক অধিকার বাতিল এবং পরিশেষে পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করা ও সামরিক একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, যা ধনতান্ত্রিক স্বৈরশাসনের তীব্রতার স্বাভাবিক রূপ।

চার) শিল্পে ও বাণিজ্যে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজির ক্রমবিস্তৃতি এবং প্রতিটি সাম্রাজ্যবাদী ব্লকের একটি মাত্র আর্থ-রাজনৈতিক ইউনিটে কেন্দ্রীভবন।

পাঁচ) সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য বিস্তার—যা সাম্রাজ্যবাদের মধ্যেকার ক্রম-বর্ধমান দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধের পথকে প্রশস্ত করে।[২]

এই বৈশিষ্ট্যগুলির দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, ফ্যাসিবাদের সামগ্রিক নীতিসমূহের সারাংশ ও নির্যাস আধুনিক ধনতন্ত্রের মধ্যেও সুস্পষ্টরূপে বিরাজিত। লেনিন কথিত 'সাম্রাজ্যবাদ : ধনতন্ত্রের সর্বোচ্চ পর্যায়' তত্ত্বের পরীক্ষিত সত্যতা এখানেই। কিন্তু এই জাতীয় আগ্রাসী ধনতন্ত্রও কখনোই ফ্যাসিবাদ নয়।

বস্তুত, উপরোক্ত নীতিসমূহকে রূপায়িত করার জন্য কী পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে, কী রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছে, এর মধ্যেই পূর্ণাঙ্গ ফ্যাসিবাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি নিহিত আছে। সুতরাং তত্ত্বানুযায়ী—ফ্যাসিবাদ

অবশ্যই ধনতান্ত্রিক বুর্জোয়া রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যেই বিকশিত হয়ে ওঠে। কিন্তু বুর্জোয়া রাষ্ট্রকাঠামো মাত্রই ফ্যাসিবাদী নয়।

পূর্বোক্ত গ্রন্থটির ভূমিকাংশে রজনীপাম দত্ত এ-প্রসঙ্গে সুস্পষ্টভাবে এই কথাগুলিও বলেছেন :

"ফ্যাসিবাদ অবশ্যম্ভাবী নয়। ফ্যাসিবাদ পুঁজিবাদের বিকাশের কোনো আবশ্যিক স্তরও নয়—যার ভেতর দিয়ে সব দেশকে যেতেই হবে। ফ্যাসিবাদের সম্ভাবনা ব্যর্থ করে দিয়েই সমাজবিপ্লব সম্ভব—যেমনটি হয়েছে রুশ দেশে। কিন্তু সমাজবিপ্লব বিলম্বিত হলে ফ্যাসিবাদও অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

"ফ্যাসিবাদকে প্রতিরোধ করা যায়। প্রতিরোধের মাধ্যমে তাকে পরাভূতও করা যায়। ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে যদি কোনো মোহ না থাকে, তাহলেই তাকে প্রতিরোধ ও পরাভূত করা সম্ভব। ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদই জন্ম দেয় ফ্যাসিবাদের। পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের অবক্ষয়ের মধ্যেই ফ্যাসিবাদের জন্ম।" ৩

[ইংরাজী থেকে অনূদিত]

১৯২৮ সালে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ষষ্ঠ কংগ্রেসের কর্মসূচীতে ফ্যাসিবাদের যে-সাধারণ সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছিল তার মূল বক্তব্য ছিল :

"বিশেষ কয়েকটি ঐতিহাসিক অবস্থা ও কারণে ধনতন্ত্র তার প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদী বিকাশে ফ্যাসিবাদী নীতি গ্রহণ করে। এই বিশেষ অবস্থা তখনই দেখা দেয় যখন ধনতন্ত্র সংকটাপন্ন হয়, ধনতান্ত্রিক সম্পর্কগুলি অস্থির হয়ে ওঠে ; সমাজে শ্রেণীচ্যুত মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ; শহর ও গ্রামের বিরাট সংখ্যক পেটিবুর্জোয়া সম্প্রদায় গরীব হয়ে পড়ে ; বুদ্ধিজীবীদেরও বড় অংশ নিঃসম্বল হয় এবং ধনতন্ত্রের উপর প্রোলেতারিয়েত শ্রেণীর আক্রমণের আশঙ্কা যখন তীব্রতর হয়ে ওঠে।"

এই পরিপ্রেক্ষিতেই ফ্যাসিস্তরা জাতীয়তাবাদের বুলি আওড়ায় এবং পার্লামেন্টারী প্রথাকে বাজারের দর-কষাকষির উপকরণ বলে মনে করে। এদের কলাকৌশলের মধ্যে রয়েছে শ্রমিকশ্রেণীর সবথেকে অনুন্নত অংশকে তাদের অসন্তুষ্টির সুযোগ নিয়ে দলভুক্ত করা এবং সংকটকালে ধনতন্ত্রবিরোধী স্লোগান দিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার পর ধনতন্ত্রের সন্ত্রাসমূলক স্বৈরাচারকে চালু করা। আসল উদ্দেশ্য হলো সামাজিক বিপ্লবকে রোখা।

উপরোক্ত অবস্থাগুলির পটভূমিতে বুর্জোয়াশ্রেণী নিজ শাসনব্যবস্থাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য ক্রমশ অধিকতর মাত্রায় সংসদীয় ব্যবস্থা ত্যাগ করে ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার দিকে ঝুঁকে পড়তে বাধ্য হয়।

ফ্যাসিবাদী পদ্ধতি আদর্শগতভাবে 'জাতীয় চিন্তার' খোলস পরা বুর্জোয়াশ্রেণীর বিভিন্ন প্রতিনিধিত্ব সহ প্রত্যক্ষ একনায়কত্বের ব্যবস্থা। এরা মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী, বেকার ও সমাজের অন্যান্য স্তরের বিক্ষোভকে কাজে লাগানোর জন্য চাতুর্যপূর্ণ বাগাড়ম্বর করে। ফ্যাসিবাদী পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর দুর্দশা ও সোস্যাল ডেমোক্রাসির

নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ গ্রহণ করে পশ্চাৎপদ শ্রমিকদের আকৃষ্ট করে। ফ্যাসিবাদ বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন নীতি গ্রহণ করে। এরা পুঁজিবাদের সংকটের যুগে পুঁজিবাদ বিরোধী অবস্থান নেয়; কিন্তু রাষ্ট্রক্ষমতায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার পর পুঁজিবাদের পক্ষে, পুঁজিপতিশ্রেণীর সন্ত্রাসমূলক একনায়কত্বের ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করে।

ফ্যাসিবাদের সংজ্ঞাকে আরও তীক্ষ্ণভাবে বিশ্লেষণ করা হয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সপ্তম কংগ্রেসে। ১৯৩৫-এর এই অধিবেশনেই জর্জি ডিমিট্রভ তাঁর সুবিখ্যাত 'যুক্তফ্রন্ট থিসিস' পেশ করেন।[৪] এতে ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে বলা হয়েছে:

"ফ্যাসিবাদ হলো লগ্নীপুঁজিরই শক্তি। এ হলো শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক ও বুদ্ধিজীবী-দের বিপ্লবী অংশের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী প্রতিহিংসার সংগঠন। পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ফ্যাসিবাদ হলো জাতিদম্ভের নগ্নরূপ যা অপরাপর জাতির বিরুদ্ধে পাশবিক ঘৃণার প্ররোচনা দেয়।...

"ফ্যাসিবাদের ক্ষমতালাভ এক বুর্জোয়া সরকার থেকে অপর এক সরকারে মামুলি উত্তরণ মাত্র নয়, এ হলো বুর্জোয়াদের শ্রেণী-কর্তৃত্বের একটি রাষ্ট্রীয় রূপ। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের স্থলে অন্য এক রাষ্ট্রীয় রূপের প্রকাশ্য সন্ত্রাসমূলক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা।...

"ফ্যাসিবাদ অনেক ক্ষেত্রে জনগণকে আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়। কারণ, জনগণের সবচেয়ে জরুরী প্রয়োজন ও দাবিগুলির কাছে সে মহা বাগাড়ম্বরে আবেদন করে। ফ্যাসিবাদ শুধু জনগণের মধ্যে গভীরভাবে বদ্ধমূল সংস্কার-গুলিকেই উস্‌কিয়ে দেয় না, উপরন্তু নানাভাবে তাদের বিপ্লবী ঐতিহ্যকেও কাজে লাগায়।...

"ফ্যাসিবাদ চরম সন্ত্রাসবাদীদের স্বার্থেই কাজ করে, কিন্তু জনগণের কাছে নিজেকে নির্যাতিত জাতিগুলির রক্ষকের ছদ্মবেশে উপস্থিত করে এবং অপমানিত জাতীয় অনুভূতিগুলোকে নাড়া দেয়, যেমন জার্মান ফ্যাসিবাদীরা করেছিল যখন তারা 'ভার্সাই-চুক্তির বিরোধিতা'-র স্লোগান তুলে পেটিবুর্জোয়া জনগণের সমর্থন অর্জন করেছিল।...

"সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল ধরনের ফ্যাসিবাদ হলো জার্মান ফ্যাসিবাদ। জাতীয় সমাজতন্ত্র বলে অভিহিত করার ধৃষ্টতা দেখালেও, সমাজতন্ত্রের সঙ্গে এর কোনো মিলই নেই। হিটলারের ফ্যাসিবাদ শুধুমাত্র বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ নয়, এ হলো পাশবিক জাতিদম্ভ। এ হলো রাজনৈতিক দস্যুতার এক শাসন-ব্যবস্থা এবং শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক, পেটিবুর্জোয়া ও বুদ্ধিজীবীদের বিপ্লবী অংশের বিরুদ্ধে প্ররোচনা ও নির্যাতনের ব্যবস্থা। এ হলো মধ্যযুগীয় বর্বরতা ও পাশবিকতা, অন্যান্য জাতিসমূহের বিরুদ্ধে বল্গাহীন আক্রমণ।...

"জার্মান ফ্যাসিবাদ আন্তর্জাতিক প্রতিবিপ্লবের উদ্যত খড়্গ রূপে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের প্রধান প্ররোচক হয়ে এবং সমগ্র বিশ্বের মেহনতী মানুষের মহান

পিতৃভূমি সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জেহাদের প্রবর্তক রূপে কাজ করে চলেছে।...

"ফ্যাসিবাদ যে-কোনো মুখোশই ধারণ করুক, যে-কোনো রূপেই নিজেকে উপস্থাপিত করুক এবং যে-কোনো পথেই ক্ষমতায় আসুক, তবুও ফ্যাসিবাদ হলো শ্রমিকশ্রেণীর এবং সমস্ত মেহনতী মানুষের সবচেয়ে ঘৃণ্য শত্রু।"

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সপ্তম কংগ্রেসে তাঁর বক্তব্যের শেষে জর্জি ডিমিট্রভ ফ্যাসিবাদের সংজ্ঞাকে সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখ করেন :

ফ্যাসিবাদ হলো : নিপীড়িত মানুষের উপর লগ্নীপুঁজির নগ্ন আক্রমণ।

ফ্যাসিবাদ হলো : সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধ ও তার দ্বারা প্ররোচিত আগ্রাসী যুদ্ধ।

ফ্যাসিবাদ হলো : সবথেকে রক্ষণশীল সংকীর্ণ প্রতিক্রিয়া ও প্রতিবিপ্লব।

ফ্যাসিবাদ হলো : শ্রমিকশ্রেণী ও নিপীড়িত সমস্ত মানুষের পয়লানম্বরের শত্রু।[৫]

প্রকৃতপক্ষে, রজনী পাম দত্ত ও ডিমিট্রভ কর্তৃক প্রদত্ত তত্ত্বকেই ফ্যাসিবাদের মূল অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় দর্শন রূপে চিহ্নিত করা চলে। ফ্যাসিবাদের এই ক্ল্যাসিকাল সংজ্ঞা ছাড়াও এর নিকৃষ্টতম জীবনদর্শনের আরো পরিচয় পাওয়া যায় হিটলারের আত্মজীবনী 'মাইন ক্যাম্ফ' এবং রোজেনবার্গ রচিত 'মাইথাস' নামক নাৎসী-দর্শন থেকে। এই ভয়ঙ্কর গ্রন্থ দুটি থেকে ফ্যাসিজমের আদর্শ ও কর্মপন্থা রূপে যে কয়টি মূল নীতির পরিচয় পাওয়া যায় তা হলো নিম্নরূপ :

ক) রক্ত কৌলীন্য। জার্মান জাতিই দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি। তারাই প্রকৃত আর্য। পৃথিবী শাসন করার একমাত্র তারাই অধিকারী।

খ) গণতন্ত্র একধরনের পাগলামী। কারণ, দশজন মূর্খ মিলে একজন বুদ্ধিমান হয় না। জার্মান জাতির সকলেই যে গণতান্ত্রিকভাবে সমানাধিকার পাবে তা নয়। শাসন-ক্ষমতা মুষ্টিমেয় প্রতিভাধরেরই হাতে থাকবে। তাদেরই নাগরিক রূপে গণ্য করা হবে, তারাই রাজ্য শাসন করবে, আর সকলে 'হুকুমদারী' করবে মাত্র।

গ) জনসাধারণ নির্বোধ মেষের পাল মাত্র। তাদের হাতে শাসন ক্ষমতা ও ভোটাধিকার না দিয়ে তাদের শ্রমের কাজে খাটানোই উচিত। পশু খাটিয়ে যত লাভ হচ্ছে, মানুষ খাটিয়ে তার চেয়ে অনেক বেশি লাভ হবে। কাজেই জার্মান জাতির বুদ্ধিমান নেতারা বিশ্বের সকল মানুষকে খাটালেই বিশ্বসভ্যতার অধিকতর কল্যাণ হবে।

ঘ) নারীজাতির স্থান শুধুমাত্র গৃহাঙ্গনেই। তারা সুখী পরিবার সৃষ্টি করবে। শ্রমক্লান্ত পুরুষের সেবা এবং সুস্থ ও বলিষ্ঠ সন্তান উৎপাদন করবে।

ঙ) জ্ঞান-বিজ্ঞান-সভ্যতা সবকিছু জার্মান জাতিরই দান। এর উন্নতি বিধানও একমাত্র জার্মান জাতিই করতে পারে। কাজেই অপর সকল জাতির স্বাধীন চিন্তাকে এবং জাতি রূপে অপর সকল জাতিকে নির্মূল করলেই বিশ্বে সুন্দর সভ্যতা গড়ে উঠবে।

চ) এসব কাজ করতে হলে বিশ্বের সকল জাতির রাষ্ট্র-ক্ষমতা লোপ করে জার্মান জাতির রাষ্ট্রপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং এ কাজে যতটা প্রয়োজন বলপ্রয়োগ করতে হবে।

সুতরাং এটাই হলো উগ্র জাতিবিদ্বেষী, স্বৈরতান্ত্রিক, অমানবিক, আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী ও মনুষ্যত্বহীন ফ্যাসিবাদের প্রকৃত স্বরূপ।

২. ফ্যাসিবাদের আগ্রাসী রূপ ঃ

১৯২২ সালের অক্টোবর মাসে মুসোলিনীর নেতৃত্বে ফ্যাসিস্ত পার্টি ইতালির রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অবসানের অব্যবহিত পরেই (১৯১৯) ইতালির রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশ বৈপ্লবিক ও অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠতে থাকে। রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবের নব অনুপ্রেরণায় যুদ্ধবিধ্বস্ত ও অর্থনৈতিক সংকটে জর্জরিত ইতালিতে ধীরে ধীরে কমিউনিস্ট এবং সমাজতান্ত্রিকদের প্রভাব বাড়তে থাকে। ১৯২১ সালে ইতালির সাধারণ নির্বাচনে দেখা গেল সোস্যালিস্ট ও কমিউ-নিস্টরা অনেক বেশি ভোট পেয়ে সদস্যপদে নির্বাচিত হয়েছেন। সোস্যালিস্টরা ১২২টি এবং কমিউনিস্টরা দখল করেছেন ১১৬টি আসন; কিন্তু মুসোলিনীর ফ্যাসিস্ত পার্টি করায়ত্ত করছে মাত্র ৩৫টি আসন।[৬]

কমিউনিস্টদের এই ক্ষমতা বৃদ্ধিতে ইতালির ধনিক সম্প্রদায় আতঙ্কিত হয়ে উঠল। ইতিমধ্যেই কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে শ্রমিকরা ইতালির কলে-কারখানায় ধর্মঘট আন্দোলনের মাধ্যমে নিজেদের শক্তিকে সংগঠিত করে তুলছিল। কমিউ-নিস্ট বিপ্লবের আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল নিয়মতান্ত্রিক সোস্যালিস্টরাও। তারা ফ্যাসিস্তদের সঙ্গে হাত মেলালো। পুঁজিপতিশ্রেণী, অভিজাত আমলা ও সেনা-নায়করা মুসোলিনীকে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিলে ফ্যাসিস্তশক্তি ১৯২২-এর ২৮শে অক্টোবর 'রোম যাত্রা' করে ও ইতালির রাষ্ট্রক্ষমতা বলপ্রয়োগে অধিকার করে। এরপর তারা গণতন্ত্রের কণ্ঠ রুদ্ধ করে কমিউনিস্ট সহ সমগ্র বিরোধীপক্ষকে উচ্ছেদ করার অভিযানে মাতে এবং উগ্র জাতীয়তাবাদ ও প্রাচীন রোমসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আদর্শ প্রচার করতে থাকে। ১৯২৬ সালে মুসোলিনী পুরোপুরি ডিক্টেটর বা 'ডুসে' রূপে ইতালির একচ্ছত্র শাসক হয়ে বসলেন। শুরু হলো ইউরোপে প্রথম ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাস।

এর পরবর্তীকালে হিটলারের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত নাৎসীবাদ হলো মূলত জার্মান-ফ্যাসিবাদ। বস্তুত, এটা ছিল মুসোলিনীর স্বৈরাচার অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর। ধনতান্ত্রিক সঙ্কট ও কমিউনিস্ট বিরোধিতার মধ্য দিয়েই জার্মান ফ্যাসিবাদের উৎপত্তি। ১৯২৯-৩০ সালে বিশ্বব্যাপী যে প্রচণ্ড অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয় তার থেকেই নাৎসীবাদ ও ফ্যাসিবাদ চরম রূপে আত্মপ্রকাশ করে। ইউরোপেও এই মন্দাজনিত অর্থনৈতিক সংকট (Economic depression) তীব্র আকার ধারণ করে। ১৯২৯ থেকে ১৯৩২, এই সময়কালের মধ্যেই জার্মানীতে শিল্পোৎপাদন শতকরা ৪০ ভাগ

কমে যায়। বেকার সমস্যা অত্যন্ত তীব্র আকার ধারণ করে।[৭] ১৯১৯-এর ভার্সাই-চুক্তির বিরুদ্ধে জার্মান জনমত তখন সংগঠিত। এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে জার্মান কমিউনিস্টরা দ্রুতবেগে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করছিল। শ্রমিকশ্রেণীর বৃহত্তম দল 'সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি'ও তখন অত্যন্ত জনপ্রিয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে কমিউনিস্ট-বিপ্লবের আশঙ্কায় ভীত জার্মান পুঁজিপতিশ্রেণী ইতালির মুসোলিনীর মতোই জার্মানীতেও হিটলারের নাৎসী পার্টিকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হতে সবরকম সাহায্য করে। এই সময় কমিউনিস্ট ও সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠন করলে হয়তো নাৎসী পার্টিকে প্রতিরোধ করা সম্ভব হতো—কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভবপর হয়নি। ১৯৩৩ সালে 'ইহুদি-বিরোধী, পুঁজিবাদ-বিরোধী, কমিউ-নিস্ট-বিরোধী, বিদেশী-বিরোধী, প্রজাতন্ত্র-বিরোধী ও ভার্সাইচুক্তি-বিরোধী' স্লোগান দিয়ে হিটলার চরম নাৎসী স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠা করে।[৮] এই সময় বিরোধী দলের হাজার হাজার রাজনৈতিক কর্মী ও নেতাকে হয় গ্রেপ্তার কিংবা গুপ্তভাবে হত্যা করা হতে থাকে। কমিউনিস্ট পার্টি এবং তার সদস্যদের উপর নেমে আসে অকথ্য নির্যাতন। হিটলারের নাৎসী দলের দ্বারা জার্মানীতে নির্বিচারে চলতে থাকে ইহুদি নিধন ও কমিউনিস্ট হত্যার অভিযান। প্রগতিশীল চিন্তা-ভাবনার অধিকারী এবং বিশেষ করে ইহুদি-বংশোদ্ভূত শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী-বিজ্ঞানীদের উপর নেমে আসে ভয়ংকর সন্ত্রাস ও নিপীড়নের স্টীম রোলার। বিজ্ঞানী আইন-স্টাইন ও সাহিত্যিক টমাস মান দেশ থেকে দেশান্তরে পালিয়ে বেড়াতে থাকেন। ১৯৩৩-এর ১০ই মে বার্লিনের রাজপথে নাৎসী দল সংঘটিত করে বিশ্বের বরেণ্য সাহিত্যিক ও মনীষীদের কালজয়ী গ্রন্থের বহ্ন্যুৎসব। হিটলারের আত্মজীবনী **'Mein Kampf'** পরিণত হয় নাৎসী বাইবেলে।

প্রকৃতপক্ষে, ১৯৩৩ সালে জার্মানীতে হিটলারের ক্ষমতা দখলের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপে তথা সমগ্র পৃথিবীর সামনেই ফ্যাসিবাদ এক ঘনীভূত প্রচণ্ড বিপদরূপে আত্মপ্রকাশ করে। ইউরোপে যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও লীগ অব নেশনস্-এর সংগঠন কার্যত ভেঙে পড়ে। জার্মানী লীগ অব নেশনস্ থেকে বেরিয়ে আসে। ইতিমধ্যে জাপানেও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংকটের মোকাবিলায় ফ্যাসিবাদী আদর্শ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে এবং শেষপর্যন্ত জাপানেও গণতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে কায়েম হয় সামরিক আধিপত্যবাদ।

এরপর অতি দ্রুত ফ্যাসিবাদী, উগ্রজাতিবিদ্বেষী ও নগ্ন সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ ছড়িয়ে পড়তে থাকে দেশে দেশে। শুরু হয় প্রত্যক্ষ ফ্যাসিস্ত আগ্রাসন। ইতিপূর্বে ১৯৩১-এ জাপান মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করেছিল। ১৯৩৫-এ ইতালি আবিসিনিয়া (ইথিওপিয়া) আক্রমণ করে এবং ১৯৩৬ সালে সেটি অধিকার করে। ১৯৩৬-এ জার্মানী ও ইতালীর প্রত্যক্ষ মদতে ফ্যাসিস্ত জেনারেল ফ্রাঙ্কো স্পেনের নির্বাচিত পপুলার ফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালায়। স্পেনের গৃহযুদ্ধকে দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের ড্রেস রিহার্সাল বলা যেতে পারে। ১৯৩৭-এ রোম-বার্লিন-টোকিও যৌথভাবে

সোভিয়েত ইউনিয়ন বিরোধী অক্ষশক্তি গড়ে তোলে। কমিউনিস্ট বিরোধী এই ফ্যাসিস্ত অক্ষশক্তির প্রতি তখন চলছে ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকারের নির্লজ্জ তোষণ নীতি, যার জঘন্য পরিণতি হলো ১৯৩৮-এর 'মিউনিক চুক্তি'।

ইতিমধ্যে ১৯৩৪ সাল থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে জার্মানীর যুদ্ধোৎপাদন বেড়েছে প্রায় ২২গুণ, সামরিক শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৩৫ গুণ এবং সামরিক উৎপাদনও বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৮/১০ গুণ। ১৯৩৮-সালে মহাশক্তিমান জার্মানী কর্তৃক অস্ট্রিয়া ও চেক-সুদেতেন অঞ্চলটি দখল করার ঘটনা সমগ্র বিশ্বকে ফ্যাসি-বাদের বিপদ সম্পর্কে সচকিত করে তোলে।

এতদিন ধরে সোভিয়েত ইউনিয়ন বারংবার ইঙ্গ-ফরাসী শক্তিবর্গকে ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদের ভয়ঙ্কর বিপদ সম্পর্কে সচেতন করার চেষ্টা করে আসছিল। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে 'ঐক্যবদ্ধ যুক্তফ্রন্ট' গঠনের আহ্বানও ১৯৩৫-এ মস্কোতে অনুষ্ঠিত 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক-'এর সপ্তম কংগ্রেস থেকে দেওয়া হয়। প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা জর্জি ডিমিট্রভের 'যুক্তফ্রন্ট তত্ত্ব' সমগ্র বিশ্বে তখন সুবিদিত। তথাপি ইঙ্গ-ফরাসী শক্তি অন্ধ আর উগ্র কমিউনিস্ট বিরোধিতায় নিমজ্জিত হয়ে নিতান্ত মূর্খের মতো হিটলারের প্রতি তোষণ নীতি চালিয়ে যাচ্ছিল। এরফলে একান্ত বাধ্য হয়েই আত্মরক্ষার জন্য ১৯৩৯ সালের ২৩শে আগস্ট সোভিয়েত ইউনিয়ন নাৎসী জার্মানীর সঙ্গে এক 'অনাক্রমণ চুক্তি' করে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন, এটা কোনো মৈত্রী চুক্তি নয়। নিছকই পূর্বদিকে জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-ব্যবস্থা গড়ার জন্য পশ্চিম-ফ্রন্টকে শত্রুমুক্ত রাখার সাময়িক প্রচেষ্টা রূপে একটা সামরিক কৌশল ছিল এই রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি। হিটলারের সঙ্গে তৎকালীন ইঙ্গ-ফরাসী শক্তিবর্গের সোভিয়েত ইউনিয়ন বিরোধী চক্রান্তের বিরুদ্ধে সাময়িক ও সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে এটা ছিল একটা রক্ষা-কবচও বটে।

ইতিমধ্যে ১৯৩৯-এর ৭ই এপ্রিল মুসোলিনী আলবেনিয়া দখল করে নেয় এবং এর আগে ১৫ই মার্চ হিটলার দখল করে নিয়েছিল চেকোস্লোভাকিয়ার ভূখণ্ড। ইঙ্গ-ফরাসী শক্তিবর্গ এর বিরুদ্ধে তখন একটা প্রতিবাদও জানায়নি। শুধু তারা বসে প্রহরগুনেছিল এবং কামনা করছিল 'বলশেভিক রাশিয়ার পালা' কখন আসবে। কিন্তু ২৪শে মার্চ জার্মানী পোল্যাণ্ডের ডানজিগ বন্দর দাবি করে। এতদিনে প্রকৃত বিপদ উপলব্ধি করে ঘুম থেকে যেন জেগে ওঠে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স। পোল্যাণ্ড জার্মানীর অধিকারে যাওয়া মানে—সমগ্র বলকান অঞ্চল এবং সেইসঙ্গে এশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাকারী পথের উপর পশ্চিমী শক্তিবর্গের অধিকার হারানো। তাছাড়া ধনতান্ত্রিক পোল্যাণ্ড ছিল ইঙ্গ-ফরাসী শক্তির আশ্রিত রাষ্ট্র।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার নেতা মার্শাল স্তালিন তখনো ইঙ্গ-ফরাসী শক্তির কাছে হিটলার-বিরোধী ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গড়ার আহ্বান জানাচ্ছেন। কিন্তু 'চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী'। জার্মানীর বিরুদ্ধে পোলিশ সীমান্তে রুশ সৈন্য

সমাবেশের অনুমতি ইঙ্গ-ফরাসী-পোল সরকার দিল না। বরঞ্চ হিটলারের সঙ্গে আপসের চেষ্টা করতে থাকলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন। হিটলার ততদিনে পশ্চিমী শক্তিবর্গের সামরিক দুর্বলতা বেশ ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছেন। তিনি দ্রুত আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়নকে নিরপেক্ষ অবস্থানে রাখতে চাইলেন।[৯] ইঙ্গ-ফরাসী শক্তিবর্গের প্রতি ক্ষুব্ধ-বিতৃষ্ণ স্তালিন এই পরিপ্রেক্ষিতে রুশ-জার্মান চুক্তিতে বাধ্য হয়ে সম্মত হলেন। ১৯৩৯-এর ১লা সেপ্টেম্বর, জার্মানী কর্তৃক পোল্যাণ্ড আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। সমগ্র বিশ্ববাসী এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালেই প্রত্যক্ষ করল ফ্যাসিবাদের নগ্নতম আগ্রাসী ভূমিকা এবং মানব-সভ্যতাধ্বংসী নিষ্ঠুরতম বর্বরতার বীভৎস রূপ।

তথ্য-নির্দেশ

১. Fascism and Social Revolution, R. P. Dutt.
২. Ibid ; p. 101.
৩. Fascism and Social Revolution, R. P. Dutt.
৪. From Peace Front to People's War,
2nd Edition, Ed. G. Adhikari ; pp.-16-21.
৫. Ibid ; p.-21.
৬ Fascism and Social Revolution, R. P. Dutt.
৭. The Rise and Fall of the Third Reich, William L. Shirer.
৮. The Between War-World, J. Hampden Jackson.
৯. Battle for the World, Max Werner ; p. 43.

দ্বিতীয় অধ্যায়

আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলন ও রবীন্দ্রনাথ

বাঙলার ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথই ছিলেন প্রথম ভারতীয় অগ্রচারী সাহিত্যিক যিনি সকলের আগে ফ্যাসিবাদের স্বরূপ উপলব্ধি করে সেই চণ্ড ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে নিজের কণ্ঠকে সোচ্চার করেছিলেন এবং লেখনীকে করেছিলেন তীক্ষ্ণায়ুধ।

একজন মহান মানবতাবাদী লেখক রূপে রবীন্দ্রনাথ যে-কোনো ধরনের মানববিদ্বেষী মতাদর্শ, আগ্রাসনবাদ ও শান্তি বিঘ্নিতকারী শক্তির বিরুদ্ধে বরাবরই সোচ্চার ছিলেন। যুদ্ধের বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ও শান্তির সপক্ষে তাঁর কবিকণ্ঠ ছিল সর্বদাই মুখর। কিন্তু ফ্যাসিবাদের স্বরূপ উপলব্ধিতে কবির কিছু বিলম্ব ঘটেছিল। আন্তর্জাতিক, বিশেষত ইউরোপীয় রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের অভাবে কবি ফ্যাসিবাদের মানবসভ্যতা-বিদ্বেষী রূপের সঙ্গে এর সূচনা-পর্বে পরিচিত হতে পারেন নি। বরঞ্চ তিনি ভ্রমবশত হয়েছিলেন ফ্যাসিস্ত-চক্রান্তের শিকার। ইতালির ফ্যাসিস্ত শাসকশ্রেণী কবিকে ব্যবহার করেছিল নিজেদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো একজন বিশ্বব্যক্তিত্বের কাছে কোনো ঘটনাই বেশিদিন সত্যিই গোপন থাকতে পারে না। ফ্যাসিবাদের মানবসভ্যতা-সংহারক আসল রূপও একদিন কবির কাছে প্রকাশিত হলো। এ বিষয়ে অবশ্য সেদিন কবির প্রধানতম সহায়ক ও বন্ধু ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী মনীষী রোম্যাঁ রোলাঁ এবং তাঁর সাথী ফরাসী 'ক্লার্তে' বুদ্ধিজীবী-গোষ্ঠী। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন বাঙলা ও বাঙালীর মানস-চেতনাকে।

১. ক্লার্তে (Clarte) গোষ্ঠী, রোলাঁ, বারব্যুস ও রবীন্দ্রনাথ :

প্রথম মহাযুদ্ধ চলাকালে ১৯১৬ সালে জাপানেই রবীন্দ্রনাথ যুদ্ধ, সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয়তাবাদ-বিরোধী বক্তৃতামালায় সর্বপ্রথম সুকঠোর ভাষায় জঙ্গী ন্যাশনালিজম, সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতা এবং যুদ্ধের বিরুদ্ধে তাঁর অভিমত জ্ঞাপন করেছিলেন। যুদ্ধের মূল কারণ সম্পর্কে কবি তাঁর ঐ ভাষণে বলেন :

"আসল সত্য কথাটা হচ্ছে, পাশ্চাত্য সভ্যতার উৎপত্তি এবং তার গোটা ইতিহাসের সার কথাটাই হচ্ছে—বিরোধ-সংঘর্ষ ও রাজ্য জয়ের ইতিহাস।

এটা হচ্ছে যেন—এক দল লুঠেরা, যাদের সর্বদাই চাই শিকারের যোগান। বস্তুত, এই জাতিগুলি তাদের শিকার ও মৃগয়া ক্ষেত্রের প্রসারের জন্ত নিজেদের মধ্যে অবিরাম যুদ্ধ করে চলেছে।"[১] [ইংরাজী থেকে অনূদিত]

রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত এই বক্তৃতামালা পাঠ করার পরই ফরাসী মনীষী রোমঁ্যা রোলাঁ রবীন্দ্রনাথের প্রতি আকৃষ্ট হন। রোলাঁ তাঁর ভগ্নীর সাহায্যে এর অংশ-বিশেষ ফরাসী ভাষায় তর্জমা করিয়ে তাঁর একটি রচনা প্রকাশ করলেন (১৯১৭)। সম্ভবত এরই ফলে আঁরি বারব্যুস প্রমুখ ফ্রান্সের প্রগতিশীল লেখকদেরও রবীন্দ্রনাথের রাজনীতিক চিন্তার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ ঘটে।[২]

যুদ্ধাবসানের পর কিছু সংখ্যক প্রগতিশীল ফরাসী বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে আঁরি বারব্যুস 'ক্লার্তে' (Clarte) লেখকগোষ্ঠীর পত্তন করেন। এই গোষ্ঠীর লেখক ও বুদ্ধিজীবীরাই এক যুক্ত আবেদন ও ফতোয়া প্রকাশ করেছিলেন। বারব্যুস স্বয়ং তাঁর **'Le Luer Dans L' Abime'** পুস্তিকায় তাঁদের সঙ্ঘের মূল উদ্দেশ্য এবং কার্যসূচীর কথা সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এর মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে তাঁরা ঘোষণা করলেন সর্বাত্মক জেহাদ বা যুদ্ধ। 'যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' —এইটিই হলো তাঁদের মূল আদর্শ ও লক্ষ্য।[৩]

'ক্লার্তে' নামকরণ হয়েছিল বারব্যুসের অন্যতম বিখ্যাত যুদ্ধ-বিরোধী উপন্যাস 'Clarte'-এর নামানুসারে। বস্তুত, তাঁর এই উপন্যাসটি প্রকাশের অল্পকাল পরেই (১৯১৯ অক্টোবর থেকে) 'Clarte গোষ্ঠীর' কাজকর্ম পুরোদমে শুরু হয়ে যায়। স্বল্পকালের মধ্যেই ইংল্যাণ্ড, জার্মানী এবং ইউরোপের আরো কয়েকটি দেশে এর শাখা কমিটি স্থাপিত হয়। বারব্যুস, মার্তিনে, আনাতোল ফ্র্যাঁস, জুল রমঁ্যা, পল ক্যুটুর প্রমুখ প্রখ্যাত লেখক ও মনীষীরা ছিলেন মূল ফরাসী শাখার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। রোমঁ্যা রোলাঁ এই গোষ্ঠীর সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক হলেও এর প্রত্যক্ষ সদস্য ছিলেন না। তিনি আর-একটি স্বতন্ত্র ধারায় বিশ্বের বিবেকী বুদ্ধিজীবীদের সংগঠিত করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন।[৪]

'ক্লার্তে'-গোষ্ঠী কিন্তু 'শান্তিবাদী' বা 'Pacifist' ছিলেন না। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাকে তাঁরা সমর্থন করতেন। তাঁদের ঘৃণা ছিল 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের' বিরুদ্ধে, 'ন্যায় প্রতিষ্ঠার যুদ্ধের' বিরুদ্ধে নয়। অপরদিকে রোমঁ্যা রোলাঁ অন্তত প্রথম দিকে ছিলেন পুরোমাত্রায় শান্তিবাদী (Pacifist)। শান্তি বিঘ্নিতকারী যে-কোনো যুদ্ধের প্রতিই ছিল তাঁর সুতীব্র ঘৃণা। রবীন্দ্রনাথকেও তিনি স্বমতে আনার প্রচেষ্টা শুরু করেন।

এর প্রথম দৃষ্টান্ত রূপে বলা যায়, রোলাঁ যখন যুদ্ধশেষে 'চিন্তার স্বাধীনতার ঘোষণাবাণী' (**Declaration of Independence of Thought**)-এর মাধ্যমে যুদ্ধের ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের বিবেকী বুদ্ধিজীবীদের সঙ্ঘবদ্ধ হবার আহ্বান জানালেন, তখন এই ঘোষণাবাণীটি পাঠিয়ে রবীন্দ্রনাথের সমর্থনের জন্ত তিনি তাঁকে প্রথম পত্র লেখেন (১০ই এপ্রিল, ১৯১৯)।[৫] কিছু দিনের

মধ্যেই ভারতবর্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথ এ ব্যাপারে তাঁর পূর্ণ আন্তরিক সমর্থন ও অভিনন্দন জানিয়ে রোলাঁকে জবাবী পত্র লেখেন।[৬]

সম্ভবত ঐ জুন-জুলাই মাসের মধ্যেই বারব্যুস 'ক্লার্তে'র ঘোষণাবাণীটিও রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এবং 'ক্লার্তে'র ঐ ১৫ দফা ঘোষণাপত্রে (যা প্রধানত ছিল মানবাধিকার সংক্রান্ত ও শান্তিবাদী)[৭] কবি স্বাক্ষরও করেছিলেন।

১৯২০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টি। আঁরি বারব্যুস, মনাৎ ও মার্তিনে প্রমুখ বুদ্ধিজীবী নেতৃবৃন্দ কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করলে 'ক্লার্তে' গোষ্ঠীর মধ্যেও বিরোধ ও সংঘাত দেখা দেয়। রোমাঁ্যা রোলাঁ প্রথম দিকে 'শিল্পীর চিন্তার স্বাধীনতা ও ব্যক্তি-অধিকার'কে দল ও রাজনীতি-নিরপেক্ষ রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। অপরদিকে তাঁর ঘনিষ্ঠ সুহৃদ বারব্যুস 'সামাজিক ও রাজনৈতিক দায়বদ্ধতায়' বিশ্বাসী ছিলেন। একজন নিষ্ঠাবান ও সচেতন কমিউনিস্ট রূপে বারব্যুস তাই রোলাঁর তথাকথিত 'চিন্তার স্বাধীনতার' ভাববাদী মোহজাল ভাঙতে অগ্রসর হন।[৮] ১৯২১ সালের ২রা ডিসেম্বর থেকে ১৯২২-এর মাঝামাঝি, এই প্রায় ছয় মাস ধরে রোলাঁ-বারব্যুস আদর্শগত বিতর্ক চলে। ইতিমধ্যে ইউরোপের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একদিকে সদ্যোজাত সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাষ্ট্রকে আতুর ঘরেই হত্যা করার জন্য প্রতিবিপ্লবী পশ্চিমী রাষ্ট্রশক্তি জোটের চক্রান্ত ও আক্রমণ চলতে থাকে পুরোদমে; অপর-দিকে ইতালিতে মুসোলিনীর নেতৃত্বে ফ্যাসিবাদ রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে বিশ্বের সামনে ভয়ঙ্কর বিপদ রূপে আবির্ভূত হয়।

বারব্যুসের সঙ্গে তীব্র মতাদর্শগত বিতর্কের অবসানে অবশেষে রোমাঁ্যা রোলাঁ পৃথিবীর সামনে সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের বিপদকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারেন। এরপর থেকে আজীবন ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামই ছিল তাঁর জীবনের প্রধানতম লক্ষ্য। আর, অনিবার্যভাবেই কবিসার্বভৌম রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে সঠিক লক্ষ্যে পরিচালনা করার ক্ষেত্রেও এই মহান মনীষীর ভূমিকা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। বিশেষকরে দ্বিতীয়-বার ইতালি সফরের (১৯২৬) সময় যে-মারাত্মক বিভ্রান্তি ও প্রতারণার শিকার হন রবীন্দ্রনাথ তার থেকে তাঁকে মুক্ত হতে আন্তরিকভাবে সাহায্য করেছিলেন ফরাসী মনীষী রোমাঁ্যা রোলাঁ।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, যাঁরা মনে করেন বা বলেন যে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলন সর্বপ্রথম শুরু করেন ও নেতৃত্ব দেন কমিউনিস্ট বা মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীগণ—তাঁদের সঙ্গে আমি কোনোমতেই সহমত পোষণ করতে পারছি না। কারণ, যে বিশিষ্ট মনীষী ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সংগ্রামে অন্যতম প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন—সেই রোলাঁ অবশ্যই কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য কিংবা মতাদর্শগত ভাবেও মার্কসবাদী ছিলেন না। কিন্তু একথা সত্য যে, তার

প্রধানতম সহযোগী অঁারি বারব্যুস ছিলেন একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কমিউনিস্ট নেতা ও বুদ্ধিজীবী।

২. ফ্যাসিস্ত ইতালি সফরে রবীন্দ্রনাথ এবং কিছু বিভ্রান্তি :

পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে, ১৯২২-এর অক্টোবরে ইতালিতে মুসোলিনীর নেতৃত্বে ফ্যাসিবাদ কায়েম হয়। কিন্তু ফ্যাসিবাদের উদ্ভব এবং তার ভয়াবহ পরিণাম ও বিপদের সর্বনাশা তাৎপর্য, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক ও ইউরোপীয় রাজনীতির সূক্ষ্ম ও জটিল কার্যকারণ-সম্পর্ক, ভারতবর্ষের মতো অনগ্রসর দেশে বসে ঐ বিষয়ে প্রায় অনবহিত কবির পক্ষে সঠিকভাবে উপলব্ধি করা তৎকালে সত্যিই সম্ভব ছিল না। তাছাড়া কবি যখন তাঁর 'বিশ্বভারতী' এবং গঠনমূলক কাজ নিয়ে খুবই ব্যস্ত ছিলেন সেই সময়েই ধূর্ত মুসোলিনী অধ্যাপক তুচ্চি ও ফর্মিকি-কে "বিশ্বভারতী'তে ভিজিটিং প্রফেসর রূপে পাঠালেন (নভেম্বর, ১৯২৫)। আর সেই সঙ্গে পাঠালেন 'বিশ্বভারতী'র জন্য ইতালীয় ভাষায় প্রকাশিত অসংখ্য মূল্যবান পুস্তকরাজি। স্বভাবতই কবি এর দ্বারা কিছুটা আকৃষ্ট হয়েছিলেন।[৯] রোলঁা এবং রবীন্দ্রনাথের একান্ত কাছের মানুষ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের মতো কয়েকজন অবশ্য বিশ্বাস করতেন যে, ঐ দুজন তথাকথিত 'ভারততত্ত্ববিদ' ইতালীয় অধ্যাপক ছিলেন মুসোলিনীর একান্ত অনুগত ফ্যাসিবাদী বুদ্ধিজীবী, যাঁরা কবিকে ইতালি ভ্রমণে প্ররোচিত করে তাঁর মুখ দিয়ে ফ্যাসিজম্ ও মুসোলিনীর সমর্থনে প্রশংসাসূচক বিবৃতি আদায় করার জন্য ইতালির ফ্যাসিস্ত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হয়েছিলেন।[১০]

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবেই প্রতারিত হয়েছিলেন এবং ১৯২৬-এর মে-জুন মাসে তিনি সানন্দে ইতালি সফরেও যান। প্রথমে তিনি ভেবেছিলেন এটি একটি বে-সরকারী সফর ; কিন্তু নেপলসে অবতরণ করেই তিনি সর্বপ্রথম জানতে পারেন যে, ইতালির ফ্যাসিস্ত সরকারের আমন্ত্রণেই তিনি এই সফরে এসেছেন। তখন অবশ্য তাঁর আর পশ্চাদাপসরণের পথ ছিল না। এরপর চললো পুরোদস্তুর কণ্ডাকটেড ট্যুর। মুসোলিনীর সঙ্গে একাধিকবার সাক্ষাৎকার, গঠনমূলক কর্মকাণ্ড পরিদর্শন এবং নানা শ্রেণীর নারী-পুরুষের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় মুসোলিনীর এবং ফ্যাসিজম্-এর অকুণ্ঠ প্রশস্তি শ্রবণ, মোটামুটি এই ছিল রবীন্দ্রনাথের ইতালি সফরের কর্মসূচী।

এর পরবর্তী ঘটনা সকলেরই জানা। ড. নেপাল মজুমদার[১১] ও সৌরীন্দ্র মিত্র-র[১২] গবেষণা থেকেই আমরা জানতে পারি যে, সৌজন্যবশত কিংবা প্রতারণা ও বিভ্রান্তির শিকারে পরিণত হয়ে ফ্যাসিস্ত ইতালির উদ্দেশে কবি যেসব প্রশস্তিবাক্য উচ্চারণ করেছিলেন সেইসব নির্বিবাদে মুসোলিনীর প্রতি আরোপ করে ফ্যাসিস্ত-প্রেস পরমানন্দে মিথ্যা প্রচার শুরু করে দিল এবং বিশ্ববাসীর মনে এমন ধারণার জন্ম দিল যে, রবীন্দ্রনাথ যেন ফ্যাসিবাদের একজন বড় সমর্থক। সংবাদ

রূপে এগুলিকে সত্য মনে করে ইউরোপের 'লিবারেল প্রেস'-এর মাধ্যমে, এমনকি সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শে চালিত বেশ কিছু পত্র-পত্রিকাতেও, রবীন্দ্রনাথের এই ফ্যাসিবাদকে সমর্থনের সংবাদ ফলাও করে প্রচারিত হলো। অন্যদিকে, এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ইউরোপের পত্রপত্রিকা, এমনকি ভারতবর্ষের 'অমৃতবাজার', 'পাইওনিয়র' প্রভৃতি পত্রিকাগুলি এই অভাবনীয় ঘটনায় বিস্ময় প্রকাশ করে।[১৩]

এই প্রসঙ্গে সৌরীন্দ্র মিত্র-কৃত একটি গুরুতর বিভ্রান্তির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা বিশেষভাবে প্রয়োজন। সৌরীন্দ্র মিত্র তাঁর গবেষণাগ্রন্থের একস্থানে রবীন্দ্রনাথের ইতালি সফর প্রসঙ্গে আলোচনাকালে বলেছেন :

"......শুধু য়ুরোপেই নয় স্বদেশেও ইতালি-সফর সম্বন্ধে পত্র-পত্রিকায় বিরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হচ্ছিল। জার্নালের এক জায়গায় রোলাঁ লিখেছেন যে, কবির বহুকালের সহযোগীরাও আলোচ্য বিষয়ে সোচ্চার হয়েছিলেন। রোলাঁ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কথাই ইঙ্গিত করেছেন মনে হয়। কিন্তু এই প্রসঙ্গে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে ঐ সময়ে কবির যে কয়েকটি রুষ্ট চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হয় তাতে বোঝা যায় প্রবাসী ও মডার্ন রিভিয়ুপত্রে যে মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলি তাঁর রচনা নয়, তাঁর পুত্র শ্রী অশোক চট্টোপাধ্যায়ের (প্রবাসী, আশ্বিন ১৩১৩, বিবিধপ্রসঙ্গ এবং **Modern Review, August, September 1926, Notes** দ্রষ্টব্য)।"[১৪]

সৌরীন্দ্র মিত্র-র এই ভাষ্য থেকে সাধারণ পাঠকদের মধ্যে বিভ্রম সৃষ্টি হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। উপরোক্ত বক্তব্য থেকে মনে হবে যে, রবীন্দ্রনাথের ইতালি সফর বা তাঁর সঙ্গে মুসোলিনীর সাক্ষাৎকার অন্যান্য অনেক প্রগতিশীল পত্র-পত্রিকার মতো 'প্রবাসী' বা 'মডার্ন রিভিয়্যু'-এর কাছেও অত্যন্ত অপছন্দ ছিল এবং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের অনুপস্থিতিতে তাঁর সুযোগ্যপুত্র অশোক চট্টোপাধ্যায় পত্রিকা দুটির সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করে রবীন্দ্রনাথের ফ্যাসিস্ত-'তোষণ নীতির' (তখন এইভাবেই প্রচারিত হয়েছিল) তীব্র সমালোচনা শুরু করেন এবং তাতে কবি অত্যন্ত রুষ্ট হন। আমার ধারণা, উক্ত প্রসঙ্গে সৌরীন্দ্র মিত্র-র অতি স্বল্প আলোচনাই হলো এই বিভ্রান্তির মূল কারণ।

প্রকৃত ঘটনা কিন্তু এর সম্পূর্ণ বিপরীত। সাহিত্য-সমালোচক অবন্তী সান্যালের গবেষণামূলক একটি প্রবন্ধ [১৫] এ বিষয়ে যথাযথ আলোকপাত করেছে। রামানন্দ-পুত্র অশোক চট্টোপাধ্যায় সেসময় মুসোলিনী বা ফ্যাসিজম্ বিরোধী তো ছিলেনই না, উপরন্তু বহু দিগ্‌ভ্রান্ত বুদ্ধিজীবীর মতো তিনিও ছিলেন মুসোলিনীর গুণমুগ্ধদেরই একজন। সামগ্রিকভাবে 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিয়্যু'-এর নীতিতে ফ্যাসিবাদের প্রতি কোনো পক্ষপাতিত্বই ছিল না। কিন্তু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বিদেশ সফরকালে (২৭শে জুলাই, ১৯২৬-এ জেনেভা যাত্রা) এবং রবীন্দ্রনাথের ইতালি সফর শুরু হয়ে গেলে অশোক চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিয়্যু'-এর পাতায় আকস্মিকভাবে শুরু হয়ে গেল মুসোলিনী ও ফ্যাসিস্ত

দলের ধারাবাহিক গুণকীর্তন। এই সময়কালে 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিয়্যু' পত্রিকা দুটিতে প্রকাশিত প্রাসঙ্গিক প্রতিবেদনগুলির একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ অবন্তী সান্যাল তাঁর পূর্বোক্ত গবেষণামূলক নিবন্ধে তুলে ধরেছেন।

১৩৩৩ সনের আষাঢ় সংখ্যার 'প্রবাসী'তে রবীন্দ্রনাথের নেপেলস্ থেকে স্পেশাল ট্রেনে রোম যাত্রা, মুসোলিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার, রোম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আমন্ত্রণ পর্যন্ত সংবাদ-বিবরণ প্রকাশিত হয়। পরের মাসে শ্রাবণ সংখ্যায় ছাপা হয় মুসোলিনীর একটি হাতে আঁকা মুখাবয়ব এবং মুসোলিনীর প্রশস্তি। সম্ভবত ততদিনে এদেশে মুসোলিনী সম্পর্কিত উক্তির জন্যে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনার কথা (ইংলণ্ডের সংবাদপত্র ও ব্যক্তিগত চিঠিপত্র মারফৎ) ভালোভাবেই পৌঁছে গেছে। তারই জবাব দেওয়ার জন্যই যেন 'প্রবাসী'তে লেখা হলো: 'নবোদিত অরুণের মতো ফ্যাসিস্ট দলের নেতা মুসোলিনীর আবির্ভাব', 'জগতের সভায় উচ্চাসন অধিকার', 'ইতালির নবীন প্রাণে বিশ্বজয়ের উল্লাস' ইত্যাদি। আরও বলা হলো: " · আমাদের দেশের এই দুর্দশার দিনে এই মহা শক্তিশালী পুরুষের জীবনী ও কার্যকলাপ বিশেষভাবে আলোচিত হইবার যোগ্য। অবশ্য পৃথিবীতে নিন্দুকের অভাব নাই। রাজতন্ত্রপরায়ণ জাতি সমূহ নানা মিথ্যা অভিযোগে ইঁহার মহৎ জীবনকে কলংকিত করিবার প্রয়াস পাইতেছে। কিন্তু পরুষত্ব ও তেজ জয়লাভ করিবেই। বর্তমান জগতের সর্বাপেক্ষা চিন্তাশীল কবি রবীন্দ্রনাথ এই শক্তিকে নমস্কার ও অভিনন্দন নিবেদন করিয়াছেন।"

ভাদ্র সংখ্যায় 'বিবিধপ্রসঙ্গ' বিভাগে 'রবীন্দ্রনাথের সহিত শত্রুতা' শিরোনামায় প্রকাশিত সংবাদ-নিবন্ধে বলা হলো: "এবার কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ইতালিতে উক্ত দেশের রাষ্ট্রনেতা মুসোলিনীর অতিথিরূপে অবস্থান করেন। মুসোলিনী ইউরোপের একজন মহাক্ষমতাশালী লোক এবং তাঁহাকে ইতালি-সম্রাট বলিলেও চলে। এহেন ব্যক্তির অতিথি হওয়া একজন বাঙালীর পক্ষে বিশেষ গৌরবের কথা, সন্দেহ নাই। মুসোলিনীর শত্রু অনেক, এবং রবীন্দ্রনাথেরও শত্রুর অভাব নাই। এই সকল কারণে আমরা জনসাধারণকে রবীন্দ্রনাথ ও মুসোলিনীর খবর বিশেষ সাবধানতার সহিত পাঠ ও বিচার করিতে অনুরোধ করি। দুইজনেরই জীবন, আদর্শ, পরস্পরের সম্বন্ধে মতামত প্রভৃতি নানা দিক দিয়া মিথ্যার সাহায্যে দুর্নাম রটাইবার চেষ্টা হইতেছে। এ চেষ্টা যাহারা করিতেছে তাহারা ভারতের বন্ধু নহে, আমাদের পক্ষে কবি ফিরিয়া আসার পূর্বে এসকল বিষয়ে কোন মতামত পোষণ না করাই শ্রেয়।"

ইতিমধ্যে আগস্টের প্রথমেই 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান' পত্রিকায় প্রকাশিত কবির চিঠি ও প্রাসঙ্গিক সংবাদের মাধ্যমে সারা দুনিয়ায় রবীন্দ্রনাথের ফ্যাসিজম্ বিরোধিতার বার্তা প্রচারিত হয়ে গিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের এই মত পরিবর্তনে সবথেকে অখুশি ও অসন্তুষ্ট হন অশোক চট্টোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ ফ্যাসিস্ত ডিক্টেটর মুসোলিনীর আতিথ্য গ্রহণ করায় ব্যথিত ও স্তম্ভিত ইয়োরোপীয় জনমতের মধ্যে

যে-বিরূপতা জাগে সে-সম্পর্কে বক্রোক্তি করে 'প্রবাসী'র আশ্বিন সংখ্যায় লেখা হলো :…"রবীন্দ্রনাথ ইতালিতে বিপুল সম্মান ও অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছেন। যদিও এখনো এদিক ওদিক দুই একজন প্রজাতন্ত্র ও সাধারণতন্ত্রবাদী, সাম্রাজ্যতন্ত্রপরায়ণ 'খুনে' মুসোলিনীর আতিথ্য গ্রহণ করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথকে গালাগালি করিয়াছেন।" বহু বাগ্‌বিস্তারের পর রবীন্দ্রনাথের মতপরিবর্তন সম্পর্কে লেখকের মনের কথা স্পষ্ট করে বলা হলো :

…"কবি পূর্বে ইতালীয় গভর্ণমেণ্টের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া ও তৎপরে তাঁহাদিগের যে সমালোচনা করিয়া ইতালীয়দিগের মনে যে অসন্তোষের ভাব জাগ্রত করিয়াছেন তাহা ভারতের পক্ষে কোন প্রকারেই লাভজনক হইতে পারে না। যে অতিথি ও যে আতিথ্য দান করে তাহাদের মধ্যে পরস্পর ব্যবহারের যে-আদর্শ তাহাও ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।"

রবীন্দ্রনাথ যখন ভিয়েনায় বসে 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিয়্যু'-এর পাতায় অশোক চট্টোপাধ্যায়ের এই সকল কীর্তি প্রশান্ত মহলানবীশ ও রথীন্দ্রনাথের মাধ্যমে অবহিত হলেন স্বভাবতই তখন তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও রুষ্ট হন। সে-সময় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কবির সঙ্গেই ছিলেন। কবি 'প্রবাসী'র পাতাগুলো রামানন্দবাবুর হাতে দিয়ে বললেন : আপনার কাগজ থেকে কি এই ধরনের লেখা ডিজার্ভ করি? তাঁর পুত্র 'ফ্যাক্ট' জানে না বলে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় অজুহাত দেখালেন। কয়েকদিন পরে জেনেভায় তিনি এক চিঠিতে জানালেন, তিনি ফিরে গিয়ে পুত্রের 'ভুল' সংশোধন করবেন।[১৬] কিন্তু নিছক 'ভুল' বা 'ফ্যাক্ট' না-জানার অজুহাত রবীন্দ্রনাথ কিছুতেই মেনে নিলেন না। ২৫ অক্টোবর দেশের ঠিকানায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে এক চিঠিতে লিখলেন :

…"আপনার কাগজে এটা মতঘটিত প্রতিবাদ নয়, ব্যক্তিগত অবমাননা।… মডার্ন রিভিউ ও প্রবাসীতে যে-প্রসঙ্গে সমালোচনা বেরিয়েছে সে হচ্ছে ফ্যাসিস্ট দলের প্রতি আমার আতিথ্যবিরুদ্ধ ব্যবহার। সে-সম্বন্ধে আমার যদি অপরাধ হয়ে থাকে, তাহলে বন্ধুরা কিছু পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হতে পারেন; কিন্তু তাঁদের রক্ত অত্যন্ত বেশী গরম হয়ে উঠবার মতো বিষয় এটা নয়।… লেখাটাকে'ভুল' বলেছেন? কিসের ভুল? ঘটনার ভুল? এ সম্পর্কে যেটুকু ঘটনা প্রাসঙ্গিক সে আমার চিঠিতেই আছে। কিন্তু লেখক ব্যঙ্গ করে বলেছেন, চিঠি আমার কিনা, তাঁর সন্দেহ রয়ে গেছে। অথাৎ তাঁর মতে চিঠি আমার এতই অযোগ্য যে এটাকে জাল বলে মনে করলেই আমার লজ্জা রক্ষা হয়। বোধহয় ইটালীতে কোনো ফ্যাসিস্ট কাগজেও এমন ছদ্ম কুটিল অলঙ্কার প্রয়োগ করা হয়নি।[১৭]

সুতরাং অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই বোঝা যাচ্ছে যে, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র অশোক চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে যে-তথ্য সৌরীন্দ্র মিত্র তাঁর গবেষণাগ্রন্থে পেশ করেছেন তা সত্যনিষ্ঠ নয় বরং তা যথেষ্ট বিভ্রান্তিকর।

যাহোক, রবীন্দ্রনাথের ইতালি সফর নিয়ে বিভ্রান্তি যখন ঘনীভূত তখন রোম্যাঁ রোলাঁ কালিদাস নাগকে এক পত্রে (৭ই জুলাই, ১৯২৬) লেখেন :

"...জাপানে প্রদত্ত স্বাজাত্যের বিরুদ্ধে সেই বক্তৃতা পাঠ করার পর য়ুরোপের একটি ক্ষুদ্র বিদগ্ধ গোষ্ঠী রবীন্দ্রনাথকে গুরু বলে, ন্যায়ধর্ম ও মুক্তির বিগ্রহ বলে প্রণাম জানিয়ে আসছেন। ভেবে দেখো তাঁরা কী পরিমাণে বিভ্রান্ত হলেন যখন জানলেন য়ুরোপের সবচেয়ে ঘৃণ্য সেই পাশাবিক নিপীড়ক—নরঘাতক, অমেন্দোলা ও মাত্তিয়োতির হত্যাকারী মুসোলিনীর সরকারী অতিথি হলেন রবীন্দ্রনাথ।"[১৮]

বলাবাহুল্য, ইউরোপের 'একটি ক্ষুদ্র বিদগ্ধ গোষ্ঠী' বলতে নিঃসন্দেহে রোলাঁ এ-ক্ষেত্রে ফ্রান্সের **'Clarte'** গোষ্ঠীর কথাই উল্লেখ করেছিলেন। যাহোক, রোলাঁর আমন্ত্রণে কবি সদলে ইতালি সফর শেষে সুইজারল্যাণ্ডের ভিলেন্যুভ-এ এলেন তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে। এ প্রসঙ্গে পরবর্তীকালে রোম্যাঁ রোলাঁ তাঁর অবিস্মরণীয় জার্নাল **'I will not rest'**-এ লিখেছেন :

"...আমি রবীন্দ্রনাথের চোখ খুলিবার চেষ্টা করিলাম। এ চেষ্টা আমার পক্ষে খুব সহজ হয় নাই। ফ্যাসিজমের আসল রূপ আমি তাঁহার নিকট খুলিয়া ধরিলাম। ইহার হিংস্রনীতির কবলে যাহারা পড়িয়াছে তাহাদের সহিত তাঁহার সংযোগ সাধন ঘটাইলাম। রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে বিচলিত হইলেন। যে-ফ্যাসিজম্ তখন তাঁহার নাম ভাঙাইতেছিল তাহার সহিত তিনি খোলাখুলি-ভাবে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিলেন। ইতালীয় বন্ধুগণের নিকট এবং সি. এফ. এণ্ডরুজের নিকট লিখিত চিঠিতে তিনি তাঁহার মত পরিবর্তনের কথা ব্যক্ত করিলেন।"[১৯]

রোম্যাঁ রোলাঁ সততার সঙ্গেই উল্লেখ করেছেন যে, 'এ চেষ্টা আমার পক্ষে খুব সহজ হয় নাই।' বাস্তবিকই ঘটনাও ছিল তাই। ভিলেন্যুভ্-এ রোলাঁর কাছ থেকে প্রকৃত তথ্য অবহিত হয়ে ফ্যাসিস্ত-প্রেস তাঁর সম্বন্ধে যেসব মিথ্যা প্রচার করেছে তার প্রতিবাদ করতেই কবি শুধু রাজী হলেন। কিন্তু রোলাঁ ঠিক এটুকুতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি একদিকে যেমন কবির বিরুদ্ধে সমস্ত মিথ্যা প্রচারের অবসান চেয়ে ছিলেন, তেমনি আশা করেছিলেন যে, ফ্যাসিবাদের দ্বারা যাঁরা উৎপীড়িত হয়েছেন অথবা স্বেচ্ছায় নির্বাসন বরণ করে যাঁরা ইউরোপের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছেন, সেই সব অগণিত রুদ্ধকণ্ঠ, হৃতশ্বাস ও ছন্নছাড়া মানুষের হয়ে কবি উদাত্ত কণ্ঠে ইতালির ফ্যাসিস্ত সরকারকে ধিক্কার দেবেন।

কিন্তু সেই মুহূর্তেই রবীন্দ্রনাথ তা করতে প্রস্তুত ছিলেন না। রোলাঁর চাপে প্রায় বাধ্য হয়েই[২০] ৩০শে জুন ভিলেন্যুভ্-এ কবি যে প্রবন্ধটি রচনা করলেন তাতে তিনি আবেগহীন তত্ত্বালোচনার ভাষাতেই শেষ পর্যন্ত পরোক্ষভাবে জানালেন যে, এই ফ্যাসিবাদকে তিনি সমর্থন করেন না। মুসোলিনী সম্বন্ধে যা লিখেছেন তার মধ্যে কিছু প্রশংসার ভাবও আছে এবং আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি

নেপোলিয়ন এবং আলেকজাণ্ডারেরও উল্লেখ করলেন, যদিও প্রবন্ধের শেষ কয়েক লাইনে কর্মবীরদের চেয়ে চিন্তানায়কদেরই যে তিনি বেশি মূল্য দেন সেকথারও উল্লেখ করলেন প্লেটোর মতো দার্শনিকসুলভ নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে।[২১]

এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, উক্ত প্রবন্ধটিতে মুসোলিনী বা সামগ্রিকভাবে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক কিছু ছিল না; বরঞ্চ দুই বিশ্বখ্যাত বীর—নেপোলিয়ন ও আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে মুসোলিনীর তুলনা শেষ পর্যন্ত ফ্যাসিস্ত-দেরই যে সাহায্য করবে, এরকম ধারণায় রোলাঁ এবং তাঁর সঙ্গীরা নৈরাশ্যে প্রায় ভেঙে পড়েন। কেউ কেউ তো (যেমন, সম্পাদক দুয়ামেলে) কবির উপব ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে যান। রোলাঁ কবিকে এই প্রবন্ধ প্রকাশ না করতে অনুরোধ জানালে কবি রাজী হন। এরপর অসহিষ্ণু ও বিক্ষুব্ধ রোলাঁ তাঁর জার্নালে লিখলেন:

"ফ্যাশিবাদের বিরুদ্ধে তথ্যভিত্তিক কিছু বলতে কবি অনিচ্ছুক, কেননা তিনি বিচারে অক্ষম। তিনি কিছুই দেখেননি, কিছুই শোনেননি, কিছুই বোঝেননি, কিছুই জানেন না। অতএব তিনি হস্তপ্রক্ষালনপূর্বক দূরে সরে দাঁড়ালেন।"[২২]

প্রকৃতপক্ষে, পরের মুখে ঝাল খাওয়ার স্বভাব কিংবা ব্যক্তিত্বহীনতা অন্তত রবীন্দ্রনাথের ছিল না। তাঁর ৩০ শে জুন (১৯২৬)-এর প্রবন্ধের ব্যাখ্যায় কবি রোলাঁকে যে-কথা বলেছিলেন তার যৌক্তিকতা তো সত্যিই অস্বীকার করা যায় না। তিনি বলেছিলেন:

"আমি যা বলেছি তার বেশি কিছু আর বলতে পারছি না, তার কারণ এর চেয়ে বেশি আর কিছু আমি দেখিনি।"[২৩]

বস্তুতই, স্বেচ্ছায় হোক বা ঘটনাচক্রেই হোক, রবীন্দ্রনাথ ইতালিতে গিয়ে-ছিলেন সরকারের অতিথি হয়ে। তাঁকে যা দেখানো হয়েছে বা শোনানো হয়েছে তিনি তাই দেখেছেন বা শুনেছেন। এটাও অনস্বীকার্য যে, তাঁকে দেখানো হয়ে-ছিল ফ্যাসিজমের একটা অলঙ্কৃত এবং সুসজ্জিত মঞ্চদৃশ্য। তিনি যা দেখেছেন বা শুনেছেন, অন্তত সেইসময়ে, তার মধ্যে মুসোলিনী বা ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধতা করার মতো কিছুই ছিল না। ফ্যাসিস্ত নৃশংসতার বহু তথ্যই কবির অজ্ঞাত ছিল, অনেক কিছুই ফ্যাসিস্ত সরকার তাঁর কাছে গোপন করেছিল। সুতরাং যা তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বাইরে তেমন কিছু সম্পর্কে কবি মতামত প্রকাশ করতে চাইবেন না, এটাই স্বাভাবিক। রোমাঁ রোলাঁও সে কথা পরে সঠিকভাবে উপ-লব্ধি করে 'রবীন্দ্রনাথের চোখ খুলিবার' জন্য আয়োজন করেছিলেন।

কবি ভিলেন্যুভ্ থেকে বিদায় নেন ৪ঠা জুলাই। তাঁর প্রথম যাওয়ার কথা ছিল জুরিখে, সেখান থেকে ভিয়েনায় এবং তারপর ইউরোপের অন্যান্য স্থানে। কবি ভিলেন্যুভ্ ত্যাগ করার পরদিনই রোলাঁ ফ্যাসিস্ত সরকারের উৎপীড়নে দেশত্যাগী অধ্যাপক জিইসেপে সাল্‌ভেমিনিকে এক পত্রে (৫ই জুলাই) অনুরোধ করেন যে, তিনি যেন ইতালিতে ফ্যাসিস্ত অত্যাচার ও নিপীড়নের প্রত্যক্ষদর্শীর

বিবরণ কবিকে শোনান এবং তাঁকে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী শিবিরে নিয়ে আসেন। কেননা, অপপ্রচারের দ্বারা ফ্যাসিস্ত-প্রেস রবীন্দ্রনাথকে স্বদলভুক্ত ব'লে ঘোষণা করছে।[২৪] রোলাঁ অন্য একটি পত্রে আরো লেখেন, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, কবি যথাসময়ে তাঁর মহান এবং কঠোর বাণী উচ্চারণ করবেন এবং চক্রান্তকারীদের সকল অপচেষ্টা বিধ্বস্ত হয়ে যাবে।"[২৫]

রবীন্দ্রনাথকে ফ্যাসিবাদের ভয়াবহতা ও বিপদ সম্পর্কে অবহিত করে, তাঁকে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনের পুরোভাগে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য রোম্যাঁ রোলাঁর ভূমিকা সত্যিই অনস্বীকার্য। এমনকি, ভিলেনুাভ-এ অবস্থানকালে রবীন্দ্রনাথের ৩০শে জুনের প্রবন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে রোলাঁ যখন সাময়িকভাবে ক্ষুব্ধ ও হতাশ, তখনও ফ্যাসিস্ত-প্রেসের অপপ্রচারে যাঁরা বিভ্রান্ত হয়েছেন তাঁদের রোলাঁ বারবার সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, ঐ মিথ্যা প্রচারে তাঁরা যেন কর্ণপাত না করেন। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ফ্যাসিজমকে সমর্থন করা অসম্ভব। ১৯২৬-এর ৬ই জুলাই থেকে ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কাছে লেখা রোলাঁর চিঠিপত্রে এই বিশ্বাসই প্রতিধ্বনিত হয়েছে।[২৬]

ইতিমধ্যে ভিয়েনায় অধ্যাপক সাল্‌ভেমিনি, অধ্যাপক সাল্‌ভাডোরি ও তাঁর স্ত্রী—আইনজীবী মদিল্লিয়ানি (যিনি মাত্তিয়োতি-হত্যামামলা পরিচালনা করার জন্য নির্যাতিত হন) এবং আরো দুই-একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি নিভৃতে কবির সঙ্গে আলাপ করে ফ্যাসিস্ত সরকারের অমানুষিক অত্যাচারের মর্মন্তুদ কাহিনী বিবৃত করেন।[২৭] এসব কাহিনী শুনে কবি অত্যন্ত বিচলিত হলেন এবং রোলাঁকে লিখলেন :

> "ইতালি সফরের ফলে আমার মনে যে মলিনতার স্পর্শ লেগেছিল সম্প্রতি এক মুক্তিস্নানে তা দূর হয়েছে। ফলাফল পরে জানতে পারবেন।"[২৮]

এর পরেই 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান'-এ কবির সেই ঐতিহাসিক প্রতিবাদলিপি প্রকাশিত হলো। সি. এফ. এনড্রুজের কাছে লেখা যে-পত্র 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান'-এ (লণ্ডন, ৫ই আগস্ট, ১৯২৬) প্রকাশিত হলো তাতে কবি লিখলেন :

> "ফ্যাসিবাদের কর্মপদ্ধতি ও নীতির সঙ্গে সমগ্র মানবতাই সংশ্লিষ্ট। যে-আন্দোলন নিষ্ঠুরভাবে মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে দমন করে, বিবেক বিরোধী কাজ করতে মানুষকে বাধ্য করে এবং হিংস্র রক্তাক্ত পথে চলে বা গোপনে অপরাধ সংঘটিত করে—সে আন্দোলনকে আমি সমর্থন করতে পারি এমন উদ্ভট চিন্তা আমার কোনো কারণ নেই। আমি বরাবরই বলে এসেছি যে, পাশ্চমা রাষ্ট্রগুলি সযত্নে উগ্র জাতীয়তাবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবকে লালন-পালন করে সারা পৃথিবীর সামনেই এক ভয়াবহ বিপদ সৃষ্টি করছে।"[২৯]
>
> [অনূদিত]

এছাড়া 'ডেলি নিউজ'-এর প্রতিনিধির সঙ্গে তাঁর ইতালি ভ্রমণের অভিজ্ঞতার বর্ণনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন :

"যে মুহূর্তে আমি জেনেছি সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয়তাবাদের প্রতি অন্ধ আসক্তিই ফ্যাসিবাদের লক্ষ্যস্থল সেই মুহূর্তেই তার প্রতি আমার সমস্ত সহানুভূতি আমি প্রত্যাহার করে নিয়েছি।...

"যে সকল ইতালীয় আমার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা আমার বক্তব্যকে বিকৃত করেছেন। জানতে পারলাম এমন ধারণার নাকি সৃষ্টি হয়েছে যে ফ্যাসিবাদের প্রতি আমার একটা নিরুচ্চার মুগ্ধতা ছিল। কাজেই তীব্র অনিচ্ছা নিয়েই আমি এই ভ্রান্ত ধারণার নিরসনে বাধ্য হলাম।"[৩০]

['দ্য স্টার' থেকে উদ্ধৃত অংশ ; লণ্ডন, ৫.৮.২৬]

রবীন্দ্রনাথ এই সর্বপ্রথম খোলাখুলি ও কঠোরভাবে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশ করলেন। সম্ভবত তাঁকেই বাঙলা তথা ভারতবর্ষের প্রথম মানুষ বলা চলে যিনি বিশ্ব-ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলনে সামিল হলেন। এরপর থেকে আমৃত্যু রবীন্দ্রনাথ ফ্যাসিবাদ, নাৎসীবাদ ও সামরিকবাদের বিরুদ্ধে তাঁর কণ্ঠস্বরকে বারংবার উচ্চগ্রামে তুলে ধরেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের ইতালি সফর সম্পর্কিত যাবতীয় বিভ্রান্তির অবশ্য অবসান ঘটে 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান'-এ তাঁর প্রতিবাদপত্র প্রকাশিত হবার পরেই। কিন্তু ১৯৩০ সালে মুসোলিনীর উদ্দেশে লিখিত কবির চিঠির একটি খসড়ার উল্লেখ করে অধুনা দু' একজন গবেষক রবীন্দ্রনাথের ফ্যাসিস্ত-বিরোধিতার যথার্থতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন ও সংশয় প্রকাশ করেছেন। তাঁদের বক্তব্য হলো—১৯২৬ সালের ঘটনার পরেও, ১৯৩০ সালে, কবি মুসোলিনীর সঙ্গে বিরোধ মিটিয়ে আপস করে নিতে চেয়েছিলেন। তথ্য-প্রমাণ স্বরূপ তাঁরা ১৯৩০ সালে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পূর্বোক্ত সেই পত্রের উল্লেখ করেছেন। এই চিঠির আলোচনা প্রসঙ্গে ঐ গবেষকরা এমন কথা বলতে চেয়েছেন যার অর্থ দাঁড়ায়—রবীন্দ্রনাথ ইতালির ফ্যাসিস্ত-শাসন ও ফ্যাসিজম্ সম্পর্কে তাঁর বিবৃতি ইত্যাদিতে ইতিপূর্বে যেসব অভিযোগ উত্থাপন করেছেন, তা প্রত্যাহার করে নিয়েই তিনি যেন মুসোলিনীর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে চেয়েছিলেন, এমনকি ভবিষ্যতে কবি ফ্যাসিজম্ বা ইতালির ফ্যাসিস্ত-শাসন বা আগ্রাসন সম্পর্কে তাঁর স্বাধীন মতামত ও সমালোচনার অধিকারও এজন্য পরিত্যাগ করতে আগ্রহী ছিলেন।[৩১]

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এই জাতীয় ভ্রমাত্মক উদ্ভট গবেষণা এবং অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও খণ্ডিত দৃষ্টির পরিচায়ক। ১৯৩৬ সালে ইতালির আবিসিনিয়া আক্রমণ এবং এর বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ কবির বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কথা আমরা সকলেই জানি। তা সত্ত্বেও কবির বিরুদ্ধে এই সব অসংগত অভিযোগ উত্থাপিত হয় কি করে?

এ কথা সত্য যে, ১৯৩০-এর নভেম্বর মাসে কবি 'বিশ্বভারতীর' জন্য অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে আমেরিকায় যান। সেখানেই তাঁর সঙ্গে 'ইতালি কেলেঙ্কারী'র নায়ক

সেই অধ্যাপক ফর্মিকি-র (যাকে কবি ছাড়া তাঁর আর সমস্ত সহযোগীই ফ্যাসিস্ত-চর ব্যতীত অন্যকিছু মনে করতেন না। কবি এই ইতালীয় অধ্যাপক সম্পর্কে অন্তরে কিছুটা দুর্বলতা পোষণ করতেন, এটা অনেকেরই জানা।) সাক্ষাৎ ঘটে। হয়তো ফর্মিকিই কবির সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ খুঁজছিলেন। এর পর প্রকৃত অর্থেই রোরুদ্যমান ফর্মিকির প্ররোচনায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর একান্ত সচিব অমিয় চক্রবর্তীকে দিয়ে মুসোলিনীকে পাঠানোর জন্য একটি চিঠির খসড়া তৈরি করেন (শান্তিনিকেতনের 'রবীন্দ্রভবনে' এই চিঠির খসড়া সযত্নে রক্ষিত আছে)। ৩২

আমেরিকা থেকে প্রেরিত এক পত্রে ১৯৩০ সালের ২১শে নভেম্বর কবি তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথকে লেখেন :

"······চিঠিটা এই সঙ্গে পাঠাই। যদি দ্বিধার কারণ না থাকে পাঠিয়ে দিস্। চিরটাকাল ইটালির সঙ্গে ঝগড়া লাগিয়ে রাখা ঠিক নয়।"৩৩

পুত্র রথীন্দ্রনাথকে লেখা এই পত্র পাঠাবার সময় কবি মুসোলিনীকে লেখা অমিয় চক্রবর্তীর খসড়া করা চিঠিটিও সংযোজিত করে দেন।

বস্তুতই, খসড়া চিঠিটিতে এমন কোনো বাক্য ছিল না যার দ্বারা রবীন্দ্রনাথের ফ্যাসিবাদের প্রতি সমর্থনকে সূচিত করে। বরঞ্চ এমন কিছু বাক্য ছিল যার দ্বারা স্পষ্ট করে না-বললেও ইতালির শাসনব্যবস্থা ও ফ্যাসিজম্ সম্পর্কে তাঁর পূর্ব ধারণা ও মতের যে বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি, এই কথাটিই সুকৌশলে বাক্য-বিন্যাসের মাধ্যমে তিনি বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন।৩৪

যাহোক, বিশিষ্ট রবীন্দ্রগবেষক ড. নেপাল মজুমদারের মতে, এই চিঠি মুসোলিনীকে পাঠানো হয়নি। সম্ভবত কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ইতালি নিয়ে নতুন আর একটি উৎপাত সৃষ্টির ঝুঁকি নিতে চাননি। এ চিঠি পাঠানো হলে মুসোলিনী ও ফর্মিকি এর পূর্ণ সুযোগ নিয়ে ঢাক ঢোল পিটিয়ে এই খবর 'রয়টার'কে দিয়ে বিশ্বভারতীর সঙ্গে পুনরায় একটি জমকালো সম্পর্কস্থাপনে নিশ্চয় তৎপর হয়ে উঠতেন ; কিন্তু তা ঘটে নি।

কবি সম্পর্কে বর্তমান গবেষকদের উক্ত অভিমত এবং অভিযোগ তাই গ্রহণ-যোগ্য নয়। একথাও সত্যি যে, ১৯২৬-এর পর থেকে কবি ফ্যাসিবাদের সঙ্গে কোনো আপসই করেননি। কিন্তু এটাও লক্ষণীয় যে, মতাদর্শরূপে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে তিনি যতই সোচ্চার হোন না কেন, ইতালির ফ্যাসিস্ত-নায়ক মুসোলিনী সম্পর্কে তিনি ব্যক্তিগতভাবে তেমন কোনো কঠোর মনোভাব প্রায় প্রকাশই করেননি। এর কারণ কি? অনুমিত হয়, মুসোলিনীর ব্যক্তিত্ব ও সৌজন্যবোধ রবীন্দ্রনাথকে অনেকখানি প্রভাবিত করেছিল। রোম্যাঁ রোলাঁর মতে, এটা কবির অতি সারল্য এবং অনভিজ্ঞতার পরিচায়ক। শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্র মিত্র-র মতে, "আজ হয়তো অনেকেই আবিসিনিয়ার যুদ্ধ থেকে আরম্ভ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত মুসোলিনীর ভূমিকার কথা স্মরণ করে রোলাঁর অভ্রান্ত ঐতিহাসিক দৃষ্টির তারিফ করবেন কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ সত্য হবে না।······মুসোলিনী-চরিত্রে দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও

তাঁর মধ্যে অসাধারণত্ব কিছু ছিল একথা বিশ্বাস করবার মতো ব্যক্তি সে সময় যে ফ্যাসিবিরোধীদের মধ্যেই অনেকে ছিলেন তার অনেক নজির আছে।"[৩৫] সম্ভবত রবীন্দ্রনাথও ছিলেন তাঁদের মতোই একজন, অন্তত ১৯৩৬ সালে ইতালি কর্তৃক আবিসিনিয়া দখল করার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত।

এ প্রসঙ্গে গবেষক ড. নেপাল মজুমদার লিখেছেন :

"১৯২৮-২৯ সালের পর ইউরোপে মুসোলিনী ও ইতালির ফ্যাসিস্ত-শাসন সম্পর্কে উত্তেজনা অনেকটা শান্ত বা থিতিয়ে এসেছিল। পৃথিবীর সব বড় বড় রাষ্ট্রই তাকে রাজনৈতিক স্বীকৃতি দিয়েছে। বিশেষকরে, ভারতবর্ষের রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবী মহলের একটা বড় অংশের মধ্যে মুসোলিনী ও ফ্যাসিজম্ সম্পর্কে তখন একটা উচ্চ ধারণা ও রঙীন প্রত্যাশার শিহরণ জাগছে (মুষ্টিমেয় কমিউনিস্ট ও সোস্যালিস্টরা ছাড়া)। এমন কি গান্ধীজী, পণ্ডিত মালব্য, সুভাষচন্দ্র প্রমুখ কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতারাও অনেকে ইতালির আবিসিনিয়া আক্রমণের আগে পর্যন্ত মুসোলিনীর ও ফ্যাসিজমের প্রকৃত চরিত্ররূপ সঠিক উপলব্ধি করতে সক্ষম হননি। কেউ কেউ মুসোলিনী ও ফ্যাসিস্ত মতাদর্শের প্রকাশ্যে উচ্চ প্রশংসা করেছেন।"[৩৬]

বাঙলাদেশের বুদ্ধিজীবী সমাজের মধ্যেও ফ্যাসিজম্ সম্পর্কে মোহ সেই সময় কিছু কম ছিল না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতালীয় ভাষা-সাহিত্যের অধ্যাপক পি. এন. রায় (প্রমথনাথ রায়), অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা সেই সময় মুসোলিনী এবং ফ্যাসিস্ত-শাসনব্যবস্থা ও রাষ্ট্রকাঠামো সম্পর্কে প্রশংসাসূচক প্রবন্ধাদি লিখে চলেছিলেন—'**Modern Review**'-এর পাতায়।[৩৭] এই সবকিছুই হয়তো রবীন্দ্রনাথকে সাময়িকভাবে প্রভাবিত করেছিল, এই অনুমান অসঙ্গত নয়। যাহোক, এসব সত্ত্বেও নানা ধরনের বিভ্রান্তি কাটিয়ে রবীন্দ্রনাথ ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে একজন আপসহীন বিবেকবান সংগ্রামী যোদ্ধা রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, একথাও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য।

৩. বিশ্ব-ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের যোগদান ঃ

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের উদাত্ত কণ্ঠস্বর শোনা যেতে থাকে ১৯২৭ সাল থেকেই। ১৯২৭-এর ২৩শে ফেব্রুয়ারি, প্যারিসের স্থালবুলিয়েতে আঁরি বারব্যুস ও রোমাঁ রোলাঁর নেতৃত্বে প্রথম ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের প্রাক্কালে (১৯২৭) বারব্যুস একটি মর্মস্পর্শী চিঠিসহ রবীন্দ্রনাথের কাছে স্বাক্ষর প্রার্থনা করে 'মুক্ত চেতনার প্রতি আবেদন' (**The Appeal to The Free Spirits**) ঘোষণাপত্রটি পাঠান। এই ঘোষণাপত্রে ভারতবর্ষ থেকে একমাত্র রবীন্দ্রনাথই স্বাক্ষর করে সানন্দচিত্তে বারব্যুসের নিকট একটি জবাবীপত্র প্রেরণ করেন।[৩৮] এই ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছিল :

"......আমরা সর্বত্র লক্ষ্য করছি যে ফ্যাসিবাদের নামে, স্বাধীনতার সমস্ত

বিজয়কে হয় ধ্বংস নতুবা বিপদাপন্ন করা হচ্ছে। সংগঠন গড়ার অধিকার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের ও বিবেকের স্বাধীনতা—যা শত শত বৎসরের আত্মত্যাগ ও আয়াসে অর্জিত হয়েছে—আজ সেই সবকিছুকেই নির্দয়ভাবে নির্মূল করা হচ্ছে। প্রগতির এই দেউলিয়া অবস্থায় আমরা আর নীরব দর্শকের ভূমিকায় থাকতে পারি না।

"আমাদের ধারণা, ইদানীংকালে পৃথিবীতে মনীষা ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে যে যতটুকু প্রভাব বিস্তারে সক্ষম, তাঁদের সকলকে ফ্যাসিবাদের বর্বর অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে একটি সংগঠনে মিলিত হতে আহ্বান জানানোর সময় এসেছে ...।"[৩৯]

[ইংরাজী থেকে অনূদিত]

১৯২৮ সালের মার্চ-এপ্রিলে রোলাঁ ও বারব্যুসের উদ্যোগে **'World League of Peace'** নামক একটি শান্তি সংস্থার পক্ষ থেকে **'Golden Book of Peace'** পুস্তিকার সংকলনটি প্রকাশের আয়োজন চলতে থাকে। সংঘের পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথের কাছে বাণী প্রেরণের অনুরোধ জানানো হলে কবি একটি বাণী পাঠিয়ে দেন (৩০ শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৮), এতে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধসৃষ্টির বিরুদ্ধে কবির সুতীব্র ঘৃণা ও রোষ প্রকাশ পায়।[৪০]

প্রসঙ্গত এই সময়কালীন আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো—'সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সঙ্ঘ' বা **'League Against Imperialism'**-এর উদ্যোগে ব্রাসেলস্ শহরে অনুষ্ঠিত পৃথিবীর নির্যাতিত জাতিগুলির মহাসম্মেলন (ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধ, ১৯২৭)। আঁরি বারব্যুস স্বয়ং এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। এছাড়া সম্মেলনে রোলাঁ, মাদাম সান ইয়াৎ সেন, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী প্রমুখ নেতা ও মনীষীর বাণীও পাঠ করা হয়।[৪১] জওহরলাল নেহরু স্বয়ং ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন।[৪২]

চীনের ব্রিটিশ অধিকৃত রাজ্যগুলি রক্ষার অজুহাতে এই সময় ইংরাজরা ভারতবর্ষ থেকে বিরাট এক সেনাবাহিনী পাঠিয়েছিল। ব্রাসেলস্ সম্মেলনে এর বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার জানানো হয়।[৪৩] এমন একটি সাম্রাজ্যবাদী শয়তানী অভিযান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথও নীরব থাকতে পারেননি। তিনি ব্রিটিশের সাম্রাজ্যবাদী অভিসন্ধির নিন্দা করে একটি বিবৃতি দেন, যা **'Modern Review'**-তে প্রকাশিত হয়।[৪৪]

ব্রাসেলস্ সম্মেলনের অব্যবহিত পরেই প্যারিসের স্যালব্যুলিয়েতে সর্বপ্রথম বৃহৎ ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সভার অধিবেশন হয় ১৯২৭-এর ২৩ শে ফেব্রুয়ারি। ইতিমধ্যে এই সম্মেলনের প্রাক্কালে বারব্যুস ও রোলাঁ ইতালিতে মুসোলিনীর ও ফ্যাসিস্তদের ক্রমবর্ধমান পৈশাচিক তাণ্ডবলীলাকে প্রতিহত করার জন্য সারাবিশ্বের বিবেকবান বুদ্ধিজীবীদের সঙ্ঘবদ্ধভাবে এগিয়ে আসার জন্য আবেদন জানান **'Committee for the Defence of the Victims of Fascism and the**

White terror'-এর মাধ্যমে। প্যারিস সম্মেলনে রোলাঁ, বারব্যুস ও আইনস্টাইন সভাপতিত্ব করেন।[৪৫]

অল্পকালের মধ্যেই ইউরোপ তথা সমগ্র পৃথিবীব্যাপী সেই ভয়ঙ্কর অর্থনৈতিক সঙ্কট (১৯২৯-৩০) শুরু হয়ে যায়। এর পরই বিশ্বপরিস্থিতি ক্রমশই ঘোরালো হয়ে উঠতে থাকে এবং সেই সঙ্গে পুরোদমে চলতে থাকে যুদ্ধ-প্রস্তুতিও। জার্মানীতে 'নাৎসীবাদ' আত্মপ্রকাশ করে, যা এক নতুন ধরনের উগ্র ফ্যাসিবাদেরই নামান্তর। ১৯৩১ সালে জাপান 'লীগ অব নেশনস্' ত্যাগ করে মাঞ্চুরিয়া দখল করে নেয়। এই পরিপ্রেক্ষিতেই বারব্যুস ও রোলাঁ 'আমস্টার্ডামের বিশ্বশান্তি সম্মেলন' (২৭-২৮শে আগস্ট, ১৯৩২) আহ্বান করেন।[৪৬] আমাস্টার্ডামের শান্তি সম্মেলনে বিশ্বের প্রায় সকল শান্তিকামী প্রতিষ্ঠান থেকেই প্রতিনিধিরা যোগদান করেন। ইতিপূর্বে এত ব্যাপকভিত্তিক শান্তি সম্মেলন আর অনুষ্ঠিত হয়নি। যাঁরাই যুদ্ধের বিরুদ্ধে, এমনকি যাঁরা বিবেকের নির্দেশে যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছিলেন তাঁদেরও অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। এই সম্মেলনে ভারতবর্ষের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন বীঠলভাই প্যাটেল। রবীন্দ্রনাথ এই সম্মেলনে একটি বাণী পাঠিয়েছিলেন বলে সংবাদপত্রের খবর থেকে জানা যায়। তিনি এর প্রতি জানিয়েছিলেন পূর্ণ সমর্থন এবং সাংগঠনিক কমিটিতে তাঁর নামও ছিল। অবশ্য কবির এই বাণীটির সন্ধান এখনও পাওয়া যায়নি।[৪৭] আমস্টার্ডাম সম্মেলন উপলক্ষে বারব্যুস নিজে রবীন্দ্রনাথকে কোনো চিঠি লিখেছিলেন কি-না তাও জানা যায় না। ১৯৩২ সালের বসন্তকালে রোলাঁ এবং বারব্যুস যুক্তভাবে স্বাক্ষর করে 'বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবীদের এক সংযুক্তফ্রন্ট' গঠনের জন্য আবেদন জানান। সেটি রবীন্দ্রনাথকে পাঠানো হয়েছিল কি-না এবং হয়ে থাকলে কবি তার জবাবে কিছু লিখেছিলেন কি-না, তাও জানা যায় না।[৪৮]

যাহোক, ১৯৩৩ সালে হিটলারের নেতৃত্বে চরম ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্ররূপে জার্মানীর আত্মপ্রকাশ ইউরোপের বুদ্ধিজীবীদের খুব দ্রুত ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলনে টেনে আনে। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যে সংগঠন গড়ে তোলার ইচ্ছা 'মুক্ত চেতনার প্রতি আবেদন'-এ ১৯২৭ সালে প্রকাশ পেয়েছিল, তাই শেষপর্যন্ত কার্যকর হয় ১৯৩৩ সালের জুন মাসে—'ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্তর্জাতিক কমিটি' গঠনের মাধ্যমে। রোমাঁ রোলাঁ এর সভাপতি নির্বাচিত হন।[৪৯] যুদ্ধ, সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনকে বিশ্বব্যাপী সংগঠিত ও প্রসারিত করাই ছিল এই কমিটির মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। ঐ একই বছরে, অর্থাৎ ১৯৩৩-এর জুন মাসেই প্যারিসে একই উদ্দেশ্যে বসেছিল একটি রাজনৈতিক সম্মেলন—'Anti-Fascist Workers' Congress'। এর উদ্যোক্তা ছিল কমিউনিস্ট, সোশ্যাল ডেমোক্রেট ও প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীগণ। এরও পূর্বে ১৯৩১ সালে 'আইনস্টাইন ওয়ার রেজিস্টার্স' ইণ্টারন্যাশনাল' নামে বিজ্ঞানীদের একটি সংস্থা ইউরোপে ফ্যাসিবাদ-বিরোধী প্রচার চালায়। তাছাড়া, লণ্ডনের 'No More War Movement', 'League

of Fighter for Peace', International League of Women for Peace and Liberty', 'International Anti-militarist Bureau' প্রভৃতি বহু শান্তিবাদী প্রতিষ্ঠান (মূলত এরা ছিল প্যাসিফিস্ট) ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলনে সামিল হয়।[৫০]

ইতিমধ্যে ১৯৩৩ সালে হিটলারের নেতৃত্বে নাৎসীরা জার্মান ফ্যাসিবাদী আদর্শে দীক্ষিত হয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় অমানবিক বীভৎস তাণ্ডব। হিটলারের নির্দেশে ১০ই মে বার্লিনের রাজপথে বিশ্বের বরেণ্য মনীষীদের পুস্তকাবলীর বহ্ন্যুৎসব করা হয়। রাইখস্ট্যাগে আগুন লাগিয়ে তার দোষ চাপানো হয় কমিউনিস্টদের উপর। শুরু হয় বুলগেরীয় কমিউনিস্ট নেতা জর্জি ডিমিট্রভের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা। হিটলার দ্রুত সমগ্র জার্মানীর সামরিকীকরণ করতে শুরু করে। বিশ্বের শান্তিবাদী (pacifist) সংগঠনগুলি সত্যিই উপলব্ধি করতে পারে, যুদ্ধের বিপদ আসবে এবার ফ্যাসিস্তদের কাছ থেকেই। হিটলারের উগ্র সোভিয়েত ইউনিয়ন বিরোধী জেহাদ সাম্যবাদী বুদ্ধিজীবীদের ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সংগ্রামে আরো তৎপর করে তোলে। ১৯৩৫-এর ২১ শে জুন রোম্যাঁ রোলাঁ, আঁরি বারব্যুস ও ম্যাক্সিম গোর্কির উদ্যোগে নারকীয় ফ্যাসিবাদ ও তার হিংস্র যুদ্ধায়োজনকে পরাস্ত করার পথ আবিষ্কারের জন্য পৃথিবীর অগ্রগণ্য প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মানবিকতাবাদী সাহিত্যিকদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেনা আঁদ্রে জিদ, ঈ. এম. ফর্স্টার, আঁদ্রে মালরো, অলডস হাক্সলি, জুলিয়া বাঁদা, ওয়াল্ডো ফ্রাঙ্ক, মাইকেল গোল্ড, জন স্ট্রাচি প্রমুখ বিশ্বখ্যাত মনীষী ও বুদ্ধিজীবীগণ। ভারতবর্ষ থেকে এই সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করেন মুলকরাজ আনন্দ।[৫১] এই সম্মেলনের কিছু পরেই লণ্ডনে ব্রিটিশ ও ভারতীয় সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীগণ মিলিত হয়ে গঠন করেন 'প্রগতি লেখক সংঘ', যা ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গেই নিজেদের সংযুক্ত করে নেয়। ভারতবর্ষেও পড়ে এর সুদূর প্রসারী প্রভাব।

আঁরি বারব্যুস ও রোম্যাঁ রোলাঁ ফ্যাসিবাদ ও যুদ্ধসৃষ্টির চক্রান্তের বিরুদ্ধে তাঁদের আপসহীন প্রচেষ্টা চালিয়েই যান। তাঁরা ১৯৩৫-এর ১১ই নভেম্বর ('যুদ্ধ-বিরতি দিবস') প্যারিসে একটি শান্তি মহাসম্মেলন আহ্বান করেন। এই শান্তি সম্মেলনে যোগদান ও তাকে সফল করে তুলবার আহ্বান জানিয়ে বারব্যুস সকল দেশের যুদ্ধ-বিরোধী ও শান্তিকামী মানুষের কাছে উদাত্ত আহ্বান জানালেন। উল্লেখযোগ্য যে, বারব্যুস এই সময় (১৯৩৫-এর জুন মাসের মাঝামাঝি) সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা এক পত্রের মাধ্যমে ভারতবর্ষে গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ নেতৃস্থানীয়দের কাছে এই সম্মেলনে সাহায্য ও সহযোগিতা করার আবেদন জানান।[৫২]

ভারতীয় নেতৃত্ব ও বুদ্ধিজীবীদের কাছে লেখা বারব্যুসের এই আবেদনের মর্মার্থ প্রকাশিত হয় 'আনন্দবাজার পত্রিকায়'—১৯৩৫-এর ৯ই জুলাই। বলাবাহুল্য,

বারবুসের এই আবেদনে ভারতবর্ষের নেতারা তৎক্ষণাৎ সাড়া দিয়ে শান্তি সম্মেলনে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। স্থির হয়—রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী, সরোজিনী নাইডু ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ইউরোপের ঐ শান্তি সম্মেলনে ভারতবর্ষের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করবেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এই শান্তি সম্মেলনের সংবাদ দিয়ে 'প্রবাসী'তে লিখলেন :

"পৃথিবীর গবর্ণমেণ্টপক্ষীয় লোক নহেন এরূপ কতকগুলি আদর্শানুরাগী (**idealist**) মনীষী আছেন যাঁহারা বাস্তবিক জাতিতে জাতিতে শান্তি চান। তাঁহারা লেখা, বক্তৃতা প্রভৃতি দ্বারা সকল দেশের জনগণকে যুদ্ধ বিরাগী ও শান্তির অনুরাগী করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের মুখপাত্র স্বরূপ ফ্রান্সের বিখ্যাত সম্পাদক ও গ্রন্থকার আঁরী বারব্যুস্ (**Henri Barbusse**) আগামী নভেম্বর মাসে প্যারিসে শান্তিবাদের সমর্থক একটি কংগ্রেসের আয়োজন করিতেছেন। সকল দেশের লোকদের সমর্থন এই কংগ্রেসের উদ্যোক্তারা চান। সকল দেশের প্রতিনিধিরা কংগ্রেসে উপস্থিত হইবেন ; উপস্থিত হইতে না পারিলে নিজ নিজ বক্তব্য লিখিয়া পাঠাইবেন। কবিসার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, কবি ও স্বরাজ প্রতিষ্ঠার অন্যতম নেত্রী সরোজিনী নাইডু এবং পত্রিকা সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট হইতে আপাততঃ উদ্যোক্তারা ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব করিতে সম্মতি পাইয়াছেন।"[৫৩]

উল্লেখযোগ্য, এই সময়ে বিশ্বশান্তি কংগ্রেসের পক্ষে ভারতেও একটি জাতীয় উদ্যোগ কমিটি (**National Initiative Committee of the World Peace**) গঠিত হয়।[৫৪]

এই কমিটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, সরোজিনী নাইডু, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, পণ্ডিত নীলকান্ত দাস, নবকৃষ্ণ চৌধুরী, কে. এল. যোগলেকর, আচার্য নরেন্দ্র দেও, সম্পূর্ণানন্দ, আর.এস. রুইকর প্রমুখ আরও অনেকেই ছিলেন।[৫৫]

কিন্তু অত্যন্ত আকস্মিকভাবে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত বারব্যুসের জীবনাবসান ঘটে মস্কোতে, বিশ্বশান্তি কংগ্রেসের মাত্র কিছুদিন আগে। এই দুঃখজনক ঘটনায় বিশ্বশান্তি সম্মেলন পিছিয়ে গেল প্রায় এক বছর। ১৯৩৬ এর সেপ্টেম্বরে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তবে ১৯৩৫ সালেই মস্কোতে অনুষ্ঠিত 'কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনাল'-এর সপ্তম কংগ্রেসে ডিমিট্রভের ঐতিহাসিক 'যুক্তফ্রণ্ট'-এর (**United Front**) থিসিস গৃহীত হওয়ার পর বারব্যুস ও রোলাঁ পরিচালিত যুদ্ধ ও ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলন এবং শান্তি আন্দোলনের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্যটি নতুন করে প্রতিভাত হয়। বস্তুত, এরপর থেকেই দেশে দেশে কমিউনিস্টরাই সাম্রাজ্যবাদ, যুদ্ধ ও ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলন এবং বিশ্বশান্তি আন্দোলনের সব থেকে উদ্যোগী সংগঠক এবং নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করেন।

ইতিমধ্যে ইতালি পুরোদমে আবিসিনিয়া দখলের উদ্দেশ্যে সামরিক আক্রমণ

শুরু করে দিয়েছিল। স্থগিত বিশ্বশান্তি সম্মেলন রোলাঁর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় এর কিছুকাল পরেই (৩—৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬), ব্রাসেলস্ নগরীতে। এই সম্মেলনে পৃথিবীর ৩৫টি দেশের ৭৫০টি জাতীয় ও ৪০টি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের চার হাজারেরও বেশি প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে রোলাঁ, হাইনরিখ মান, কাউণ্ট কার্লো সাফ্রোজা এবং ভারতবর্ষ থেকে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়—এই চারজনের নামে একটি যুক্ত আবেদন প্রচারিত হয়।[৫৬]

এই সম্মেলনকে অভিনন্দন জানিয়ে সদ্য-সংগঠিত 'ভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘ'-র পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু, প্রমথ চৌধুরী, প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখের স্বাক্ষরযুক্ত একটি বাণী প্রেরণ করা হয়।[৫৭]

এছাড়া রবীন্দ্রনাথ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সরোজিনী নাইডু, জওহরলাল নেহেরু প্রমুখ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরাও স্বতন্ত্রভাবে ব্রাসেলস্ সম্মেলনে বাণী প্রেরণ করেন।[৫৮] এর কিছুদিনের মধ্যেই ভারতে 'লীগ এগেইনস্ট ফ্যাসিজম্ এ্যাণ্ড ওয়ার'-এর ভারতীয় শাখা কমিটি গঠিত হয় এবং রবীন্দ্রনাথ হয়েছিলেন এর সভাপতি। বস্তুত এই সময় থেকেই ভারতে যুদ্ধ ও ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলন প্রবল ও ব্যাপক আকার ধারণ করে, বিশেষ করে স্পেনে ও চীনে ফ্যাসিস্ত আক্রমণের পরে এর ব্যাপকতা আরও বৃদ্ধি পায়।

৪. স্পেনে ও চীনে ফ্যাসিস্ত-আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ:

১৯৩৬ সালে স্পেনে ফ্যাসিস্ত শক্তির সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণের বিরুদ্ধে সারাবিশ্বে তুমুল আলোড়ন ও আন্দোলন চলতে থাকে। জার্মান ও ইতালীয় ফ্যাসিস্ত বোমারু বিমানগুলি রাত্রির অন্ধকারে মাদ্রিদ, বার্সিলোনা প্রভৃতি নগর ও শহরগুলিতে প্রবলভাবে বোমাবর্ষণ করে সব কিছু বিধ্বস্ত করতে থাকে। এমন কি বিদ্যালয়, হাসপাতাল, এ্যাম্বুলেন্স, রেডক্রস, শুশ্রূষা-কেন্দ্র ও শিশু-আবাসগুলিও এই আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পেল না। স্পেনে ফ্যাসিস্তদের এই বীভৎস নারকীয় তাণ্ডবলীলার বিরুদ্ধে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের গণতন্ত্রবাদী ও বিবেকী শিল্পীরা দলে দলে সশস্ত্র প্রতিরোধ-সংগ্রামে এগিয়ে আসেন। এই সময়ই গঠন করা হয় আন্তর্জাতিক বাহিনী বা 'ইণ্টারন্যাশনাল ব্রিগেড'। পৃথিবীর উজ্জ্বলতম প্রতিভার অধিকারী শিল্পী-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই কলম, তুলি, ভায়োলিন, গীটার ফেলে স্পেনের রণাঙ্গণে ছুটে আসেন রাইফেল হাতে ফ্যাসিস্ত বর্বরতাকে প্রতিরোধ করার জন্য। স্পেনের বিখ্যাত কবি ফ্রেডেরিকো গর্সিয়া লোরকা, সঙ্গীতজ্ঞ পাব্লো ক্যাসালস, ইংলণ্ডের সেরা মহিলা ভাস্কর ফেলিসিয়া ব্রাউন এবং তরুণ সাহিত্য-সমালোচক র‍্যালফ্ ফক্স এবং ক্রাস্টোফার কডওয়েল (প্রকৃত নাম—ক্রীস্টোফার সেণ্ট জন স্প্রীগ) স্পেনের রণক্ষেত্রে প্রাণ দেন। এছাড়া প্রখ্যাত লেখক-শিল্পী এইচ. জি. ওয়েলস, ঈ. এম. ফর্স্টার, ডেলাইল বার্নস্, ভার্জিনিয়া উলফ্, জন স্ট্রাচি প্রমুখ অনেকেই স্পেনের ফ্যাসিস্ত বর্বরতার তীব্র নিন্দা করে স্পেনের গণতান্ত্রিক

সরকারের পক্ষে লেখনী ধারণ করেন। ইতিমধ্যে 'লীগ এগেইনস্ট ফ্যাসিজম্ এ্যাণ্ড ওয়ার'-এর পক্ষে রোলাঁ ও পল ল্যাঁজভাঁর আবেদন ভারতবর্ষে এসে পৌঁছায়, ফৈয়জপুরে কংগ্রেস অধিবেশন চলাকালেই। এছাড়াও রোলাঁর একটি স্বতন্ত্র আবেদনও প্রচারিত হয় বিশ্বের সকল বুদ্ধিজীবী ও গণতান্ত্রিক মানুষের উদ্দেশে।[৫৯]

পঁচাত্তর বছরের বাধর্ক্য নিয়েও রবীন্দ্রনাথ কিন্তু স্পেনের ঘটনায় নীরব থাকতে পারেননি। সবার অনুরোধে 'লীগ এগেইনস্ট ফ্যাসিজম্ এ্যাণ্ড ওয়ার'-এর ভারতীয় শাখার সভাপতি হতে তিনি উৎসাহ সহকারে রাজী হন। এর পরেই স্পেনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তাঁর বিখ্যাত বিবৃতি—'মানবতার বিবেকের কাছে আবেদন' প্রচার করেন। এই আবেদনে তিনি বলেন :

"স্পেনে আজ বিশ্বসভ্যতা পদদলিত। স্পেনের জনগণের গণতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে ফ্রাঙ্কো বিদ্রোহের ধ্বজা উড়িয়েছে। অর্থ ও জনবল দিয়ে বিদ্রোহের সাহায্য করছে আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদ। স্পেনের সুন্দর সমতলভূমি মূর ও বিদেশী সেনাবাহিনী দখল করে নিচ্ছে, সঙ্গে থাকছে মৃত্যু, ক্ষুধা ও দুর্দশা।

"শিল্প-সংস্কৃতির গৌরবকেন্দ্র মাদ্রিদ জ্বলছে। বিদ্রোহীদের বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত হচ্ছে তার শিল্পের অমূল্য সম্পদ। হাসপাতাল ও ক্রেশও রেহাই পায়নি। নারী ও শিশুদের খুন করা হচ্ছে, গৃহহারা ও নিঃস্ব করা হচ্ছে।

"আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদের এই প্রলয়ঙ্কর বন্যাকে রোধ করতেই হবে। স্পেনে যে জাতিগত কুসংস্কার, যে লুণ্ঠন ও যুদ্ধের গৌরব প্রতিষ্ঠার অমানুষিক পুনঃপ্রচেষ্টা চলেছে তাকে চূড়ান্ত প্রত্যাঘাতে স্তব্ধ করতেই হবে। বর্বরতার প্লাবনে নিমজ্জিত হওয়ার আগেই সভ্যতাকে রক্ষা করতেই হবে।

"স্পেনের জনগণের চূড়ান্ত পরীক্ষা ও দুঃখভোগের মুহূর্তে মানবতার বিবেকের কাছে আমি আবেদন করছি।

"স্পেনের গণ-ফ্রন্টের পাশে দাঁড়ান; জনগণের সরকারকে সাহায্য করুন, লক্ষ-কণ্ঠে ধ্বনি তুলুন—'প্রতিক্রিয়া দূর হও।' লাখে লাখে এগিয়ে আসুন গণতন্ত্রের সাহায্যে, সভ্যতা ও সংস্কৃতি রক্ষায়।"[৬০]

[ইংরাজী থেকে অনূদিত]

১৯৩৭-এর অক্টোবরে লণ্ডনে ভারতের ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন উপলক্ষে ইণ্ডিয়ান সিভিল লিবার্টিস ইউনিয়নের সভাপতি রূপে কবি একটি বাণী পাঠান, যা 'ফ্যাসিবাদের বিপদ—ব্রিটেনের প্রতি রবীন্দ্রনাথের কঠোর সতর্কবাণী : নিজের স্বাধীনতাই তামাদি হয়ে যেতে পারে'—শীর্ষক সংবাদ রূপে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।[৬১]

ইতিমধ্যে এশীয় ভূখণ্ডে ঘটে অন্য এক ঘটনা। ২১ শে সেপ্টেম্বর (১৯৩৭) মধ্যরাত্রি থেকে জাপানী বোমারু বিমানগুলি নানকিং ও ক্যাণ্টনের উপরে অবিরাম বোমাবর্ষণ করতে থাকে। জাতীয় কংগ্রেসের আহ্বানে সারা দেশের মানুষ জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং চীনের পক্ষে

নৈতিক সমর্থন ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করে। চীনে জাপ-আক্রমণের সূচনাকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ জাপানকে তীব্রভাবে নিন্দা ও ভৎর্সনা করে আসছিলেন। বলাবাহুল্য, এই সময়ে কবিও সক্রিয় হয়ে ওঠেন।

কিছুদিনের মধ্যেই টোকিও থেকে প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী রাসবিহারী বসু সমগ্র ভারত জুড়ে নেহরু পরিচালিত জাপবিরোধী আন্দোলন বন্ধ করবার অনুরোধ জানিয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে এক তারবার্তা প্রেরণ করেন। এর জবাবে ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথ রাসবিহারীকে এক পত্রে কঠোর ভাষায় জাপানের ঘৃণ্য সাম্রাজ্য-লালসার তীব্র সমালোচনা করে পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন যে, ভারতবর্ষের স্বতঃস্ফূর্ত ও ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনে তাঁর পূর্ণ সমর্থন রয়েছে।[৬২]

কবির শরীর তখন সত্যি খুবই অসুস্থ; কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সেসময় তিনি যেন মানসিকভাবে দৃঢ়চিত্ত এক প্রতিবাদী টগবগে তরুণ।

যুদ্ধের কালো ছায়া যখন সমগ্র বিশ্ববাসীকে গ্রাস করতে উদ্যত, চীন-স্পেন ও আবিসিনিয়া যখন ফ্যাসিস্ত শক্তিবর্গের দ্বারা পদানত এবং আক্রান্ত, তখন প্রবল পরাক্রমশালী রাষ্ট্র—ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স এবং আমেরিকা যুদ্ধবাজ ফ্যাসিস্তদের এই সব পৈশাচিক আক্রমণের নীরব দর্শকমাত্র। বৃহৎ রাষ্ট্রশক্তির এই নীরবতা ও ভণ্ডামি কবিকে বেশ অশান্ত ও বিক্ষুব্ধ করে তোলে। ৭ই পৌষ উৎসবের দিন শান্তিনিকেতনে এক প্রভাতী সভায় কবি তাই বৃহৎ শক্তিবর্গকে ধিক্কার জানিয়ে এবং তীব্র সমালোচনা করে বলেন ঃ

> "আজ চীনে কত শিশু নারী, কত নিরপরাধ গ্রামের লোক দুর্গতিগ্রস্ত—যখন তাঁর বর্ণনা পড়ি হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। আজ এই সঙ্গীতমুখর শান্ত প্রভাতে আমরা যখন উৎসবে যোগ দিয়েছি এই মুহূর্তেই চীনে কত লোকের দেহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হচ্ছে—পিতার কাছ থেকে পুত্রকে, মাতার কাছ থেকে সন্তানকে, ভাইয়ের কাছ থেকে ভাইকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে যাচ্ছে, যেন মানুষের কোনো মূল্য নাই—সে কথা চিন্তা করলেও ভয় হয়। অপরদিকে আছে আপন সাম্রাজ্যলোভী ভীরুর দল, তারা এই দানবদের কোনো প্রতিবাদ করতে সাহস করে না। ক্ষীণ এরা, ইতিহাসে এদের স্বাক্ষর লুপ্ত; চীনকে যখন জাপান অপমান করছে সিনেমার ভিতর দিয়ে, সাহিত্যের ভিতর দিয়ে—যেমন অপমান আমাদের দেশেও হয়ে থাকে—তখন এই প্রতাপ-শালীর দল কোনো বাধা দেয়নি বরং চীনকে দবিয়ে দিয়েছে, বলেছে চীনের চঞ্চল হবার কোনো অধিকার নেই।······তবুও একথা বলব, যারা আজ দুঃখ পাচ্ছে, প্রাণ বিসর্জন করছে, সৃষ্টি করছে তারাই।" [৬৩]

৯ই জানুয়ারি, ১৯৩৮ সালে কংগ্রেস সভাপতি জওহরলাল নেহরু 'চীন-দিবস' পালনের জন্য ভারতীয় জনগণের উদ্দেশে যে-বিবৃতি দেন তা কবির নজরে আসে। কবি ৭ই জানুয়ারি শান্তিনেকেতন থেকে চীনকে অবিলম্বে যে-কোনো প্রকারের বৈষয়িক সাহায্য দেবার জন্য জনসাধারণের কাছে আবেদন জানান।[৬৪]

ঐদিনই কবি 'চীন-তহবিলে' ব্যক্তিগত ভাবে ৫০০ টাকা দান করার কথাও ঘোষণা করেন। রবীন্দ্রনাথ ও জওহরলালের আবেদনে সারা দেশে ব্যাপক সাড়া জাগে।[৬৫]

এছাড়াও জাপ-ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত চীনের মহান জনসাধারণের উদ্দেশে প্রদত্ত কবির আরো দুটি মূল্যবান বাণীর উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে। শান্তিনেকেতনের চীনা ভাষার অধ্যাপক তান য়ুন-শানের চীন যাত্রার সময়ে তাঁর মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ চীনের উদ্দেশে এক বাণী পাঠান।[৬৬] দ্বিতীয় বাণীটি তিনি প্রেরণ করেন ১৯৩৮-এর ১লা সেপ্টেম্বর, যেদিন মধ্যরাতে বোম্বাই বন্দর থেকে ডাঃ মদনমোহন অটলের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের 'ভারতীয় মেডিকেল মিশন' চীন যাত্রা করেন। ঐ দিন যাত্রার পূর্বে মিশনের সদস্যরা শুভেচ্ছা চেয়ে কবির কাছে যে তারবার্তা পাঠান—তার জবাবে জাহাজেই মেডিকেল মিশনের সদস্যরা কবির বাণীটি পান। ইউনাইটেড প্রেস মারফৎ প্রচারিত এই শুভেচ্ছা বাণীতে কবি বলেন :

"চীনের প্রয়োজনের সময় একটি মেডিকেল মিশন পাঠিয়ে চীনকে সাহায্য করা হচ্ছে সেজন্য তিনি আনন্দিত। এইভাবে সাহায্য করাটা ভারতের পক্ষে ঠিক কাজই হয়েছে এবং মানুষের মন থেকে রক্তঝরা মানবতার স্মৃতি মুছে যাবার বহু পরেও এই কাজ প্রাচ্যের জনগণকে সৌভ্রাতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ করে চলবে।"[৬৭]

এইভাবে চীনের বিরুদ্ধে জাপ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কবি সর্বদা তাঁর অমোঘ লেখনী ও বাণীকে শাণিত অস্ত্রের মতো উদ্যত রেখেছিলেন। এর ফলে তিনি জাপানী কবি ইয়োনে নোগুচির (ইনি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ ঘনিষ্ঠও বটে) বিরূপ সমালোচনার শিকার পর্যন্ত হয়েছিলেন। জাপ আগ্রাসনবাদের সমর্থক এই বিপথগামী কবি নোগুচি তাঁর খোলা চিঠির মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথকেও বিপথগামী করার প্রচেষ্টা চালান।[৬৮] কিন্তু তাঁর অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়। সত্যের পথ থেকে ভারতীয় মহাকবিকে নোগুচি বিন্দুমাত্র ভ্রষ্ট করতে পারেন নি। চীনে জাপানের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও পৈশাচিক তাণ্ডবলীলার পক্ষে নোগুচির নির্লজ্জ ওকালতির তীব্র সমালোচনা করে রবীন্দ্রনাথ জবাব দেন ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮ সালে লিখিত একটি খোলা পত্রে। কবি লেখেন :

"ফ্যাসিস্ত ইতালি কর্তৃক ইথিওপিয়ার ধ্বংসের নিন্দা আমার ন্যায় আপনিও করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়, কিন্তু চীনের উপর আক্রমণ সম্বন্ধে আপনি ভিন্ন দিক হইতে বিচার করিতে চাহিয়াছেন। নীতির উপরই বিচারের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত, পাশ্চাত্য হইতে শিক্ষালাভ করিয়া মারাত্মক প্রণালীতে চীনের মানবতার উপর সংগ্রামে জাপান সভ্যতার প্রত্যেক নৈতিক আদর্শ যে লঙ্ঘন করিতেছে, এই সত্য যুক্তি-তর্ক প্রয়োগ দ্বারা পরিবর্তিত হইতে পারে না।"[৬৯] [ইংরাজি থেকে অনূদিত]

ইতিমধ্যে চীন-জাপান যুদ্ধে চীনাদের নিদারুণ বিপর্যয় ঘটতে শুরু করে। ইউরোপে 'মিউনিক চুক্তির' সুযোগ নিয়ে জাপানীরা দ্রুতবেগে জয়লাভের উদ্দেশ্যে বিপুল সেনাবাহিনী ও অস্ত্রসম্ভার সহ চীনের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই ভয়াবহ আক্রমণের মুখে চীনাদের নিদারুণ ভাগ্যবিপর্যয় ঘটতে থাকে। ২১শে অক্টোবর, '৩৮-এর বেলা দ্বিপ্রহরে দক্ষিণ চীনের রাজধানী ক্যাণ্টনের পতন হয়।

রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে ছিলেন। কবির নিকট এটা ছিল এক বিরাট দুঃসংবাদ। আবিসিনিয়া, স্পেন, চেকোশ্লোভাকিয়া ও চীনের মরণান্তিক দুঃখে কবির হৃদয় ছিল অত্যন্ত ভারাক্রান্ত। কিন্তু মনুষ্যত্বের উপর তিনি কখনো আশা ও আস্থা হারান নি। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল—পশুশক্তির পতন ঘটবেই।

তথাপি ক্যাণ্টনের পতন ও চীনের এই বিপর্যয়ের সংবাদে কবি যখন খুবই বিষণ্ণ ও মর্মাহত ঠিক সেই সময় জাপান-প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী রাসবিহারী বসু কবিকে জাপান পরিদর্শনের আমন্ত্রণ জানিয়ে একটি পত্র দেন। রাসবিহারী কবিকে এই পত্রে কিঞ্চিৎ অর্থের প্রলোভন দেখাবারও চেষ্টা করেন।[৭০] বস্তুতই এটা ছিল কবিকে স্বপক্ষে আনয়নের জন্য জাপ-ফ্যাসিস্ত কর্তৃপক্ষের একটি সুপরিকল্পিত ফাঁদ—যার জন্য তারা জাপানী কবি নোগুচি ও জাপ-আশ্রিত প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী রাসবিহারী বসুকে নিন্দনীয় ভাবে কাজে লাগিয়েছিল।[৭১] রাসবিহারী বসু সম্ভবত নোগুচির চাপেই এই পত্র লিখেছিলেন। যাইহোক, কবি অত্যন্ত ঘৃণাভরে জাপান ভ্রমণের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন, ২৪শে অক্টোবর, ১৯৩৮-এ লিখিত একটি পত্রে।[৭২]

রাসবিহারী বসুকে জবাব লিখবার পরেই জাপানী কবি নোগুচির নিকট থেকে আর একখানি খোলাচিঠি কবির উদ্দেশে আসে। নোগুচির এই পত্র কবির পূর্ব পত্রের জবাব। এবারও নোগুচি সমস্ত শালীনতা বিসর্জন দিয়ে বাঙলা দেশের 'আনন্দবাজার', 'অমৃতবাজার' প্রভৃতি পত্রিকায় এই খোলাচিঠি প্রকাশের অনুরোধ জানিয়ে পত্র দেন।[৭৩] এই পত্রে নোগুচি খোলাখুলি ও নগ্নভাবে জাপানী ফ্যাসিবাদকে সমর্থন করেন। নোগুচির এই দ্বিতীয় পত্রখানি কবির মনে তীব্র ঘৃণা ও ক্রোধের সঞ্চার করে। নোগুচির আগের পত্রের জবাবে তিনি যেভাবে তাঁকে তীব্র ভৎর্সনা করেছিলেন তারই জ্বালায় অস্থির হয়ে নোগুচি ক্রুদ্ধ হয়ে এবার অসংযত ও কদর্য ভাষায় তাঁকে এই আক্রমণ করেছেন, এটুকু বুঝতে কবির অসুবিধা হয়নি। কিন্তু দ্বিতীয় পত্রে নোগুচির আসল চেহারাটি উলঙ্গভাবে উদঘাটিত হয়েছে। চীনের উপর ফ্যাসিস্ত জাপানের রক্তাক্ত দানবিক অভিযানের পক্ষে নোগুচির মতো কবিও যে এতখানি নগ্নভাবে প্রচার-অভিযানে নামবেন কবি তা কল্পনাও করতে পারেন নি। কয়েকদিনের মধ্যেই কবি খুবই ভদ্র ও সংযত ভাষায় নোগুচির বক্তব্যের যুক্তি খণ্ডন করে একটি দীর্ঘ খোলা চিঠি[৭৪] লেখেন, যা ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলন ও প্রগতিশীল সংগ্রামের ইতিহাসে এক অনন্যসাধারণ স্মরণীয় দলিল হয়ে আছে।

এ প্রসঙ্গে ড. নেপাল মজুমদার দুঃখপ্রকাশ করে যা বলেছেন তা অনেকাংশেই সত্য। 'বিস্ময়ের কথা, রবীন্দ্রনাথের এই মহান ভূমিকার তারিফ করে ইউরোপের যুদ্ধ ও ফ্যাসি-বিরোধী বুদ্ধিজীবী সমাজের নেতৃস্থানীয়দের কা'কেও কোনো প্রশংসাবাক্য কিংবা মন্তব্য করতে দেখি না ;—এমনকি স্বয়ং রোলাঁকেও না।'[৭৫]

৫. ফ্যাসিবাদ-বিরোধিতায় আমৃত্যু সোচ্চার কবিকণ্ঠ :

এই সময় বিশ্বের বিশাল রঙ্গমঞ্চে ফ্যাসিবাদী শক্তির আগ্রাসী রূপ আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। আমরা দেখলাম, ১৯৩৮ সালের ১২ই মার্চ হিটলার আচমকা অস্ট্রিয়া দখল করে জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত করে নিল। স্বভাবতই এর ফলে চেকোস্লোভাকিয়া খুবই আতঙ্কিত ও সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। অস্ট্রিয়ার পতনের পর এখন তার তিনদিকে নাৎসী জার্মানীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলো। ১২ই সেপ্টেম্বর হিটলার ন্যুরেমবুর্গে তার সেই ঐতিহাসিক কুখ্যাত ভাষণে চেক সরকারের উদ্দেশে প্রচণ্ড রণহুঙ্কার ছাড়বার পরই সারা বিশ্বে দেখা দেয় আতঙ্ক।

ইঙ্গ-ফরাসী শক্তি কর্তৃক হিটলার-তোষণনীতি এবপরেই নগ্নভাবে আত্মপ্রকাশ করল। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন হঠাৎ বার্লিন ছুটলেন (১৫ই সেপ্টেম্বর) হিটলারকে তুষ্ট করতে। বলাবাহুল্য, হিটলার ইঙ্গ-ফরাসী শক্তির দুর্বলতা সহজেই উপলব্ধি করলেন। এর ফলে চেম্বারলেন চেক-সুদেতেন অঞ্চলের উপর হিটলারের প্রায় অধিকাংশ দাবিই মেনে নিয়ে নির্লজ্জের মতো লণ্ডনে প্রত্যাবর্তন করলেন ১৯৩৮-এর ১৭ই সেপ্টেম্বর।

রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে অবস্থান করছেন। সাতাত্তর বছরের এই বৃদ্ধ শারীরিকভাবে সেসময় অত্যন্ত পীড়িত ছিলেন; তার উপর চেকোস্লোভাকিয়ার এই সঙ্কটকালে ইঙ্গ-ফরাসী শক্তিবর্গের বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়যন্ত্রের সংবাদে তিনি খুবই উদ্বিগ্ন ও মর্মাহত হলেন। ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮, কবি শান্তিনিকেতন থেকে চেক প্রেসিডেন্ট বেনেসের কাছে তাঁর অন্তরের ক্ষোভ মর্মবেদনা ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করে নিম্নলিখিত মর্মে এক তারবার্তা পাঠান :

"বিশ্বাসঘাতকতার চক্রান্তে আপনার দেশ নিঃসঙ্গ ও একক হইয়া পড়িয়াছে। এই শোচনীয় ঘটনায় ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে এবং নিজের পক্ষ হইতে গভীর দুঃখ ও বিক্ষোভ জানাইতেছি। আমি আশা করি, এই আঘাত আপনার জাতির অন্তরে নবজীবনের সঞ্চার করিবে এবং ইহার ফলে সে নৈতিক জয় ও পূর্ণ আত্মোপলব্ধির অবাধ সুযোগ অর্জন করিবে।"[৭৬]

এর জবাবে প্রেসিডেন্ট বেনেস্ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে কবির কাছে যে তারবার্তাটি পাঠান তার মর্মার্থ ছিল এই :

"আপনি আমার নিকট শুভেচ্ছাজ্ঞাপক যে বাণী প্রেরণ করেছেন তজ্জন্য আমি আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিচ্ছি এবং ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে আপনি যে সহানুভূতি জানিয়েছেন তার জন্য আমার দেশ কৃতজ্ঞ।"[৭৭]

কিন্তু চেকজাতির পক্ষে স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভব হলো না। কারণ, ভীত-সন্ত্রস্ত স্বার্থবাদী ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদ্বয় হিটলার ও মুসোলিনীর কাছে আত্ম-সমর্পণ করল। ২৯শে সেপ্টেম্বর মধ্যরাত্রে জার্মানী-ইতালি-ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স—এই চতুর্শক্তির মধ্যে 'মিউনিক চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নকে এই কূটনৈতিক আলোচনা থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ রাখা হয়েছিল, কারণ তারা ছিল চেকজাতির স্বাধীনতা ও অখণ্ডতা রক্ষার পক্ষে। কুখ্যাত 'মিউনিক চুক্তি'তে চেকোস্লোভাকিয়া সম্পর্কে হিটলারের প্রায় সমস্ত দাবিই মেনে নেওয়া হলো। নামটুকু ছাড়া চেকোস্লোভাকিয়ার আর কিছুই রইল না।

রবীন্দ্রনাথ 'মিউনিক চুক্তি' এবং ইঙ্গ-ফরাসী শক্তির বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদে ক্ষোভে ফেটে পড়েন। স্বার্থোদ্ধত অবিচারের সম্মুখে চেকোস্লোভাকিয়ার এই বলিদান এবং সেই সঙ্গে অসহায় ও বিপন্ন চেকদের এই নিদারুণ অপমান আর লাঞ্ছনার কথা কবি যতই চিন্তা করতে লাগলেন ততই তিনি অস্থির হয়ে উঠতে থাকেন। এইসময় তিনি রচনা করেন তৎকালীন আন্তর্জাতিক রাজনীতির পট-ভূমিতে এক ঐতিহাসিক কবিতা—'প্রায়শ্চিত্ত'। এরপর বিপন্ন চেকদের প্রতি তাঁর মর্মবেদনা ও আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করে কবি চেক-অধ্যাপক ভি. লেসনিকে এক পত্র দেন (১৫ই অক্টোবর, ১৯৩৮)। 'প্রায়শ্চিত্ত' কবিতাটির ইংরাজি তর্জমাটি পাঠিয়ে দিয়ে কবি ঐ পত্রে লেখেন :

> "আপনার দেশের জনগণ যে দুঃখভোগ করছে সে-সম্পর্কে আমার অনুভব এত তীব্র যে মনে হচ্ছে আমি তাদেরই একজন ছিলাম। আপনাদের দেশে আজ যা ঘটছে তা তো শুধুমাত্র স্থানীয় কোনো দুর্ভাগ্য নয় যে তার প্রতি বড়ো জোর আমাদের সহানুভূতির উদ্রেক হতে পারে।
>
> "এই ঘটনায় মর্মান্তিকভাবে প্রকাশ পেল—তিন শতাব্দীকাল ধরে পাশ্চাত্যের জনগণ মানবতার যে-সব নীতির জন্য শহীদ হয়েছে সেগুলো রক্ষার ভার এসে পড়েছে কতিপয় কাপুরুষ রক্ষকের হাতে, যারা নিজেদের চামড়া বাঁচাতে গিয়ে সেগুলো বিকিয়ে দিচ্ছে। যখন এমনকি উৎপীড়করাও একে অপরকে মদৎ দিচ্ছে তখন যদি দেখা যায় যে গণতান্ত্রিক জাতিগুলি একে অপরের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে, তখন আশাভরসা করার কিছু থাকে না।...
>
> "আপনার নিজের দেশের বেলায় আমি কেবল এই আশাই পোষণ করতে পারি যে, যদিও আজ পরিত্যক্ত ও লুণ্ঠিত তবুও সে তার দেশজ অখণ্ডতা রক্ষা করতে পারবে এবং নিজস্ব অবিসম্বাদিত সম্পদের উপর নির্ভর করে আগের চেয়েও সমৃদ্ধতর জাতীয় জীবন নতুন করে সৃষ্টি করবে।"[৭৮]
>
> [ইংরাজী থেকে অনূদিত]

ইতিহাসের সাক্ষ্য থেকে বলা যায়, কবির ফ্যাসিবাদ-বিরোধিতা গান্ধীজীর মতো নেতিবাচক (**Negative**) ছিল না। ফ্যাসিস্ত-শক্তি ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ ও আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধকেও গান্ধীজী অন্যায় বলে মনে করতেন, কারণ তা

তাঁর অহিংস সত্যাগ্রহ নীতির বিরোধী ছিল। রবীন্দ্রনাথ এদিক থেকে ছিলেন গান্ধী অপেক্ষা অনেক বেশি বাস্তববাদী, রাজনীতি সচেতন ও ইতিবাচক (positive) দৃষ্টির অধিকারী। তাই ইঙ্গ-ফরাসী শক্তির হিটলার-তোষণনীতি দেখে গান্ধীজী যখন নীরব দর্শক মাত্র, তখন কবিসার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ কিন্তু ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধচিত্তে প্রতিবাদমুখর। অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত এক পত্র-প্রবন্ধে ১৯৩৯ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর কবির এই মানসিক ভাব প্রকাশ পায়:

"……দেখলুম দূরে বসে ব্যথিত চিত্তে, মহা-সাম্রাজ্যশক্তির রাষ্ট্রমন্ত্রীরা নিষ্ক্রিয় ঔদাসীন্যের সঙ্গে দেখতে লাগল, জাপানের করাল দংষ্ট্রাপংক্তির দ্বারা চীনকে থাবলে থাবলে খাওয়া, অবশেষে সেই জাপানের হাতে এমন কুশ্রী অপমান বারবার স্বীকার করল যা তার প্রাচ্যসমাজের সিংহাসনচ্ছায়ায় কখনও ঘটেনি। দেখলুম ঐ স্পর্ধিত নির্বিকারচিত্ত এবিসীনিয়াকে ইটালির হাঁ-করা মুখের গহ্বরে তলিয়ে যেতে, দেখলুম মৈত্রীর নামে সাহায্য করল জার্মানীর বুটের তলায় গুঁড়িয়ে ফেলতে চেকোস্লোভাকিয়াকে; দেখলুম নন-ইণ্টার-ভেনশনের কুটিল প্রণালীতে স্পেনের রিপাবলিককে দেউলে করে দিতে—দেখলুম ম্যুনিক প্যাক্টে নতশিরে হিটলারের কাছে একটা অর্থহীন সই সংগ্রহ করে অপরিমিত আনন্দ প্রকাশ করতে। নিজের সম্মান খুইয়ে এবং ইমান রক্ষা করতে উপেক্ষা করে মুনাফা তো কিছু হলো না—পদে পদে শত্রুর হস্তকে বলিষ্ঠ করে তুলে আজ নামতে হলো দারুণ যুদ্ধে।"[৭৯]

ইতিমধ্যে যুদ্ধ পুরোদমে শুরু হয়ে গেছে। অসুস্থ-বৃদ্ধ মহাকবি বিশ্বের বিপদে ব্যথিত ও বিচলিত। এই সময়কালে লেখা কবির বেশির ভাগ রচনাতেই ফ্যাসিস্ত আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও ধিক্কার সোচ্চারিত। ঐ সময় 'মডার্ন' রিভ্যু'তে লেখা এক প্রবন্ধে তিনি বলেন:

"জার্মানীর বর্তমান শাসকের উদ্ধত দুর্বৃত্ততার সর্বশেষ প্রকাশে বিশ্বের বিবেক প্রচণ্ড ঘা খেয়েছে। দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে দুর্বলদের ওপরে পর্যায়ক্রমিক ভীতি প্রদর্শন—রাইখ রাষ্ট্রে ইহুদী নির্যাতন থেকে শুরু করে বীর ও প্রকৃত অর্থেই উদার চেকোশ্লোভাকিয়ার বিনাশ পর্যন্ত—তারই অনিবার্য পরিণতি এই ঘটনা। এই যে অমানবিকতা, যা একজন ব্যক্তি ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গদের অসার আত্মশ্লাঘাপূর্ণ খামখেয়াল চরিতার্থ করার জন্য বিশ্বকে ঠেলে দিয়েছে ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের মধ্যে, তাকে ধিক্কার জানিয়ে আমার দেশের কণ্ঠ ইতিমধ্যেই মহাত্মা গান্ধীর মুখ দিয়ে উচ্চারিত।…

"আমি শুধু এইটুকুই আশা করি মানবতা জয়ী হবে এবং এই ভয়ঙ্কর রক্তস্নানের মধ্য দিয়ে পরিশুদ্ধ বিশ্বে চিরকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত হবে নির্যাতিত জনগণের জীবন ও স্বাধীনতার সৌষ্ঠব।"[৮০]

প্রকৃতপক্ষে, এই ভারতীয় মহাকবি আমৃত্যু ছিলেন ফ্যাসিস্ত-বিরোধী সংগ্রামে অক্লান্ত যোদ্ধা। যদিও রাজনীতি তাঁর পেশা ছিল না, তবু বিশ্বমানবতার

বিপর্যয়ের দিনে তিনি কদাচ উদাসীন হয়ে কাব্যের গজদন্তমিনারে বসবাস করেননি কিংবা নিরপেক্ষতার ভান করে মানবতার শত্রু যুদ্ধ-উন্মত্ত দানবদের স্বার্থসিদ্ধিও করেননি। তিনি সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করেছিলেন মানবতা ও বিশ্বসভ্যতার শত্রুদের এবং তাদের পতনের জন্যও সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। তাঁর অমূল্য লেখনীকে পরিণত করেছিলেন ফ্যাসিবিরোধিতার দুর্জয় আয়ুধে। এরজন্য তাঁর মনে বিন্দুমাত্র অনুতাপ বা দ্বিধা ছিল না। বস্তুত, ১৯৩৬ থেকে ১৯৪১, জীবনের এই শেষ পাঁচটি বছর কবি-সাহিত্যিক-দার্শনিক ও শিক্ষক রবীন্দ্রনাথকে আমরা দেখি পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠতম মানবতাবাদী রূপে, বিশ্বমানবতাকে নৃশংস ঘাতকদের ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য যিনি ছিলেন উৎসর্গিতচিত্ত। অবশ্য এই সময়কালে কবি এমন কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে তাঁর সহকারী, সহচর ও সুহৃদ রূপে লাভ করেছিলেন, যাঁরা ছিলেন কবির ফ্যাসিস্ত-বিরোধী সংগ্রামের প্রধানতম সহযোগী ও সেনানী। এঁরা হলেন—অমিয় চক্রবর্তী, অমল হোম, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ, কালিদাস নাগ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বাঙলার সর্বজন পরিচিত বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব।

যাহোক, ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯-এ হিটলার-বাহিনীর পোল্যাণ্ড আক্রমণের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা ঘটে। ৩রা সেপ্টেম্বর ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ফলে, পুরোদমে শুরু হয়ে যায় যুদ্ধ। এই সময় কলকাতায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, ডাঃ নীলরতন, রামানন্দ, শ্যামাপ্রসাদ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ বাঙলাদেশের প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবীরা 'যুদ্ধ ও ভারতের কর্তব্য' সম্পর্কে এক বিবৃতি প্রচারে উদ্যোগী হন। সম্ভবত শ্যামাপ্রসাদই ছিলেন এর প্রধান উদ্যোক্তা। বিবৃতি-টিতে জার্মানীর পোল্যাণ্ড আক্রমণের তীব্র নিন্দা করে এই যুদ্ধে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের বিজয় কামনা করা হয় এবং যুদ্ধে মিত্রশক্তিকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে ভারতীয়দের স্বাধীনতা দাবি করা হয়।[৮১] বলাবাহুল্য, রবীন্দ্রনাথও আগ্রহভরে এই বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন।

এই সময়েই, ৯ই সেপ্টেম্বর, পোল্যাণ্ডের বিপদের দিনে কলকাতায় 'ইণ্ডো-পোলিশ এ্যাসোসিয়েশন' গঠিত হয় ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ড. নীহাররঞ্জন রায়, ড. অমিয় চক্রবর্তী, অমল হোম প্রমুখ বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের উদ্যোগে। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই কমিটির সভাপতি হতে রাজী হন।[৮২] বিপন্ন পোলদের সাহায্যের জন্য বাঙলা দেশে যে-সাহায্য কমিটি গঠিত হয় কবি নিজে সেই কমিটির পক্ষে সাহায্যের জন্য আবেদনের খসড়াটি রচনা করে দেন (৪ঠা ডিসেম্বর)। এ সম্পর্কে 'এ্যাসোসিয়েটেড প্রেসে'র সংবাদদাতা লিখেছেন :

> "সম্প্রতি বঙ্গদেশে পোলিশ সাহায্য কমিটির একটি শাখা গঠিত হইয়াছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং উক্ত কমিটির পক্ষে সাহায্যের আবেদনের খসড়া প্রস্তুত করিয়াছেন।…
>
> "উক্ত আবেদনের মর্ম এই :
>
> "পোলিশ যুদ্ধে বিপন্ন ও নিরাশ্রয়দিগের—বিশেষত গৃহহীন, অবলম্বনহীনদের এবং

দুঃখ ও অনশনক্লিষ্ট বালকবালিকা ও রমণীগণের দুর্দশা বর্ণনাতীত। জার্মান আক্রমণের ফলে যাহারা নিঃসহায় ও বিপন্ন হইয়াছে, বঙ্গদেশ তাহাদের জন্য আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছে এবং ন্যায়ের প্রতি বঙ্গদেশ তাহার নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছে। পোলিশ সাহায্য কমিটির জন্য আমরা জনসাধারণকে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতে অনুরোধ করিতেছি।"[৮৩]

অনুরূপভাবেই কবি ঐ সময়কালে সংবাদপত্রে মাদাম সান ইয়াৎ-সেন এবং অসুস্থতার কারণে চীন থেকে স্বদেশে সদ্য-প্রত্যাবর্তনকারী ডাঃ দেবেশ মুখার্জি'র যৌথ আবেদনে বিচলিত হয়ে শান্তিনিকেতন থেকে 'চীন-সাহায্য তহবিলে' অর্থ প্রেরণের জন্য দেশবাসীর উদ্দেশে এক আবেদন প্রচার করেন।[৮৪]

ওই সময় (৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯) ওয়ার্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক শুরু হয়। এই মিটিংয়েই কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদকে নিন্দা করে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। ওয়ার্কিং কমিটির এই সভা সম্পর্কে কবির আগ্রহ ও উৎকণ্ঠা ছিল প্রবল। কিন্তু ফ্যাসিবাদ ও যুদ্ধ-সংক্রান্ত পরিস্থিতি সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণের জন্য রবীন্দ্রনাথ কোনো প্রতিষ্ঠানের মুখাপেক্ষী ছিলেন না। তাই ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব গ্রহণের পূর্বেই মংপু রওনা হবার পূর্বে কবি এক বিবৃতি-বাণীতে এ সম্পর্কে বললেন:

"জার্মানীর বর্তমান শাসনকর্তা তাঁহার ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও অন্যায় আচরণের যে শেষ পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে সমস্ত জগৎ স্তম্ভিত ও বিহ্বল হইয়াছে। দুর্বল ও অসহায়কে দীর্ঘকাল ধরিয়া পর্যায়ক্রমে (রাইখে ইহুদি নির্যাতন হইতে আরম্ভ করিয়া বীর চেকোশ্লোভাকদের স্বাধীনতা হরণ পর্যন্ত) রক্তচক্ষু প্রদর্শনের ইহাই চরম পরিণতি।

"ব্যক্তি বিশেষের নিজের ও তাঁহার সঙ্গীদের অসার খেয়ালের মোহ চরিতার্থ করার জন্য বিশ্বব্যাপী যে নরমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়াছে—মহাত্মা গান্ধী ইতিপূর্বে তীব্র কণ্ঠে তাহার নিন্দা করিয়াছেন। তাঁহার বাণীতে দেশবাসীর মনোভাব এবং অভিমত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। আমাদের বাণী হয়তো জার্মানীর সেই শক্তিমান নায়কের নিকট পৌঁছিবে না—উড়ন্ত গোলার পক্ষপুটে এই বাণী বহন করিয়া লইয়া যাইতে সমর্থ হইবে না। তবে আমার আশা এই যে, এই নরমেধ যজ্ঞের রক্তগঙ্গায় অবগাহন করিয়া ধরণী পুনরায় শুচিস্নাতা হইবে—ধরণীর বুকে নির্যাতিত ও নিপীড়িত জাতিসমূহের স্বাধীনতা ও সংস্কৃতির অক্ষয় ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হইবে এবং মানবতার জয় ঘোষিত হইবে"।[৮৫]

১৯৪০ সালের মে-জুন মাসে যুদ্ধের পরিস্থিতি গুরুতর আকার ধারণ করে। জার্মানীর প্রচণ্ড 'ব্লিৎসক্রীগ' আক্রমণের সম্মুখে মিত্রশক্তিবর্গের সেনাবাহিনী টিকতে পারে না। ফ্যাসিস্ত ও নাৎসী সেনাদের বুটের তলায় একের পর এক পতন ঘটতে থাকে হল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম-এর সেরা নগরগুলির। আক্রান্ত হয় ফ্রান্স। কিন্তু ফরাসীদের সব প্রতিরোধ-প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়। ১৪ই জুন (১৯৪০), ঐতিহাসিক

প্যারিস নগরীর পতন হয়। পরদিন সমস্ত পত্র-পত্রিকায় ফলাও করে ছাপা হয় এই দারুণ দুঃসংবাদ।

রবীন্দ্রনাথ তখন কালিম্পঙে। প্যারিসের এই পতনের সংবাদে কবি অত্যন্ত মর্মাহত ও বিচলিত হন। সংবাদপত্রে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের নিকট ফরাসী প্রধানমন্ত্রী মঃ রেনোর আকুল আবেদন পাঠ করেও কবি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে ওঠেন। কবি ঐদিনই (কালিম্পঙ, ১৫ জুন, ১৯৪০) মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের কাছে একটি জরুরী তারবার্তা প্রেরণ করেন। ভারতবাসীর নিদারুণ অসহায় অবস্থার কথা উল্লেখ করে তিনি বিশ্বব্যাপী এই মহাবিধ্বংসী মারণযজ্ঞের অবসান ঘটানোর জন্য আমেরিকাকে সক্রিয় হবার (অর্থাৎ, যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে হিটলারের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ফ্রন্ট খুলবার) আহ্বান জানান।[৮৬]

রুজভেল্ট অবশ্য কবির এই তারবার্তার জবাব দেবার মতো সামান্যতম সৌজন্য-বোধেরও পরিচয় দেননি। সে যাইহোক, কবির পক্ষেএই তারবার্তা-প্রেরণ ছিল এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। সমকালীন বিশ্বের আর কোনো মনীষী, আর কোনো শিল্পী-সাহিত্যিককে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের মতো মানবিক ভূমিকা গ্রহণ করতে সত্যিই দেখা যায়নি। কারও অনুরোধ-উপরোধে নয়, সম্পূর্ণ নিজের বিবেকের প্রেরণাতেই কবি রুজভেল্টের কাছে এই অনুরোধ জানিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এখানে নিছক শান্তিবাদী বা **Pacifist**-দের মতো বলেননি—'আমি সমস্ত রকম যুদ্ধের বিরুদ্ধে', কিংবা গান্ধীজীর মতো বলেননি, 'আমি সমস্ত রকম হিংস্র সশস্ত্র প্রতিরোধযুদ্ধের বিরোধী।' স্মরণ রাখা প্রয়োজন, মহাযুদ্ধের শুরুতেই কবি নানা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও ইঙ্গ-ফরাসী শক্তির প্রতিরোধযুদ্ধের প্রতি নৈতিক সমর্থন জানিয়ে তাদের জয় কামনা করেছিলেন, এই একটি মাত্র প্রধান কারণে যে, এর দ্বারা ফ্যাসিস্ত বর্বরতার হয়তো অবসান ঘটবে। কবি সেদিন এক পত্রপ্রবন্ধে (২০শে সেপ্টেম্বর, '৩৯) বলেছিলেন :

"...এই যুদ্ধে ইংল্যাণ্ড-ফ্রান্স জয়ী হোক একান্ত মনে এই কামনা করি। কেননা মানব-ইতিহাসে ফ্যাসিজমের নাৎসিজমের কলঙ্ক প্রলেপ আর সহ্য হয় না।"[৮৭]

১৯৪১ সালটি ছিল ইংল্যাণ্ডের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন ও বেদনাদায়ক সময়। জার্মান বোমারু বিমানের আক্রমণে সমগ্র ইংল্যাণ্ড তখন বিধ্বস্ত। মৃত্যু আর ধ্বংসের মুখোমুখি সমগ্র ইংরাজ-জাতি। এই পরিস্থিতিতে হতাশা ও আতঙ্কগ্রস্ত মিস ইলিনর র‍্যাথবোন নাম্নী ব্রিটিশ পার্লমেন্টের জনৈক মহিলা সদস্য ভারতবাসীর উদ্দেশে এক দীর্ঘ খোলা চিঠি প্রকাশ করেন। মিস্ র‍্যাথবোন এই 'খোলা চিঠি'তে অত্যন্ত অশালীন ও তীব্রভাষায় সত্যাগ্রহ আন্দোলনরত কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে আক্রমণ করেন এবং জওহরলাল ও কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত 'ব্রিটিশের যুদ্ধ ও ভারত-সংক্রান্ত নীতির' প্রতিবাদ করে উপদেশ দেন, 'যুদ্ধের এই জটিল সময়ে অকৃতজ্ঞ ভারতবাসীর স্বাধীনতার দাবি ত্যাগ করা উচিত।' চিঠিখানির মর্মার্থ যথারীতি বিভিন্ন সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হয়।[৮৮]

রোগশয্যায় শায়িত কবি এই পত্রখানি পাঠ করে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও রুষ্ট হন। তিনি অসুস্থ অবস্থায় মুখে মুখে বলে এর একটি জবাব দেন, যা লিপিবদ্ধ করেন কৃষ্ণ কৃপালনী। এরপর এই মুসাবিদাটি কবি কর্তৃক পরিমার্জিত হয়ে প্রকাশিত হয় ১৯৪১ সালের ৫ই জুন।[৮৭] আরো অনেক বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক নেতাও মিস্ র‍্যাথবোনের এই অশালীন প্রগলভ্তার জবাব দিয়েছিলেন কিন্তু কবি যেভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নগ্নরূপ, ভারতবাসীর পরাধীনতার বেদনা তুলে ধরে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য ভারতবাসীর পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করেন—এমনটি আর কেউই করেননি।

আমাদের মনে রাখা দরকার যে, তখনো পর্যন্ত সোভিয়েট রাশিয়া আক্রান্ত হয়নি এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চরিত্রও সঠিক অর্থে সর্বাত্মক ফ্যাসিবাদ-বিরোধী রূপ পরিগ্রহ করেনি। ফ্যাসিস্তবাই যে মানবতার প্রধানতম শত্রু এবং তাদের পরাস্ত ও চূড়ান্ত উৎসাদনের জন্য জগতের সমস্ত দেশ, রাষ্ট্র এবং মানুষের যে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করা দরকার, এই বোধ ও চেতনা তখনও তেমনভাবে জাগ্রত হয়নি। এই যুদ্ধে মিত্রপক্ষের, বিশেষত ইংরেজের ভূমিকা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে কবির মনে বিস্তর সন্দেহ ও অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল এবং তিনি স্পষ্টভাবে তা জ্ঞাপন করতেন, এসব সত্ত্বেও ফ্যাসিস্তদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মিত্রপক্ষকে তিনি প্রকাশ্যে নৈতিক সমর্থন জানাতে ও তাদের জয়কামনা করতে দ্বিধা করেন নি। কিন্তু মিস্ র‍্যাথবোনের উদ্ধত সাম্রাজ্যিক মেজাজের এবং অশালীন ভাষায় লেখা পত্রকে তিনি ক্ষমা করতে পারেন নি। এটাই ছিল কবির এক উল্লেখযোগ্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

১৯৪১ সালের ২২শে জুন, রবিবারটি ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিন। ঐদিন ভোরে আধুনিকতম সমরাস্ত্রে সজ্জিত বিপুলসংখ্যক নাৎসী-সেনা অর্তকিতে ও বিনা প্ররোচনায় ফিনল্যাণ্ড থেকে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত সোভিয়েত রাশিয়ার ১৫০০ মাইলব্যাপী বিস্তীর্ণ সীমান্ত ভেদ করে প্রচণ্ড আক্রমণ (অপারেশন বার্বারোসা) শুরু করে। ফলে, যুদ্ধের চরিত্রেরও বদল ঘটে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ পরিণত হয় ফ্যাসিবিরোধী বিশ্ব-জনযুদ্ধে। ১২ ই জুলাই সম্পাদিত হয় সোভিয়েত-ব্রিটিশ মৈত্রীচুক্তি। কট্টর কমিউনিজম্ ও সোভিয়েত বিরোধী ব্রিটিশ নেতা প্রধান-মন্ত্রী চার্চিল রাশিয়াকে সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন।

একথা সত্যি, কবি লিখিতভাবে রাশিয়ায় নাৎসী অভিযানের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ জানাতে পারেননি। বস্তুত, জুন মাসের মাঝামাঝি নাগাদ কবির ব্যাধির উপসর্গাদি ক্রমেই মারাত্মক ও জটিল আকার ধারণ করতে থাকে। চিকিৎসকদের নির্দেশে কবিকে সমস্ত রকম উত্তেজনাকর সংবাদাদি শোনানো এবং সাক্ষাৎকার, লেখালেখি, বিবৃতি ও বাণীদান ইত্যাদি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। তবে হিটলারের রাশিয়া আক্রমণের পর কবির মানসিক প্রতিক্রিয়ার বিবরণ মেলে তাঁর রোগশয্যার পাশে উপস্থিত একান্ত আপনজন এবং সুহৃদদের স্মৃতিকথা বা লিখিত বর্ণনা থেকে।

রোগশয্যায় শায়িত থেকেও রুশ-জার্মান যুদ্ধের খবরাখবরের জন্য কবি যে

প্রত্যহ সংবাদপত্রের জন্যে কতখানি উন্মুখ হয়ে থাকতেন, শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবীশ 'বাইশে শ্রাবণ' গ্রন্থে তার একটি জীবন্ত আলেখ্য তুলে ধরেছেন। ৩ই জুলাই তারিখে শয্যাশায়ী কবির শারীরিক ও মানসিক অবস্থার বিবরণ প্রসঙ্গে শ্রীমতী মহলানবীশ লিখেছেন :

"খবরের কাগজ এলে, এনে দিলাম। দেখি একমাত্র ইনটারেস্ট যুদ্ধের খবরে, অর্থাৎ জার্মানরা কেবলই এগোচ্ছে, না রাশিয়ানরা কোথাও ওদের ঠেকাতে পারছে। যেদিন দেখেন, জার্মানদের অগ্রগতিতে একটু বাধা পড়েছে, সেদিন মুখের কাছে কাগজখানা ধরে প্রথম লাইন থেকে শেষ লাইন পর্যন্ত খুঁটিয়ে পড়েন। আর যেদিন বড়ো বড়ো হেডলাইনে লেখা থাকে, জার্মান সৈন্য আজ এত মাইল সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে গেছে, সেদিন কাগজখানা হাতে নিয়ে ঐ হেডলাইনটা পড়া হলেই ছুঁড়ে মাটিতে ফেলে দেন—'হয়ে গেছে নিয়ে যাও।' সেদিন অনেকক্ষণ মুখখানা ভার থাকে।"[৯০]

৩০শে জুলাই (১৯৪১) ছিল কবির দেহে অস্ত্রোপচার করার সেই কালান্তক দিন। প্রশান্তচন্দ্র ও নির্মলকুমারী মহলানবীশ তাই সকালে গিয়েছিলেন কবিকে দেখতে। কবি প্রথমেই খোঁজ নিলেন রুশ রণাঙ্গনের অবস্থা সম্পর্কে। এ প্রসঙ্গে প্রশান্তবাবু লিখেছেন :

"যেদিন অপারেশন করা হয় সেদিন সকালবেলা অপারেশনের আধঘণ্টা আগে আমার সঙ্গে তাঁর এই শেষ কথা : 'রাশিয়ার খবর বলো।' বললুম, 'একটু ভালো মনে হচ্ছে, হয়তো একটু ঠেকিয়েছে।' মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, 'হবে না? ওদেরই তো হবে। পারবে ওরাই পারবে।'

"তাঁর সঙ্গে আমার এই শেষ কথা। আমি ধন্য, সেদিন তাঁর মুখের জ্যোতিতে আমি দেখেছি বিশ্বমানবের বন্দনা।"[৯১]

এই অপারেশনের কয়েকদিন পরেই ৭ই আগস্ট, (১৯৪১) কবিসার্বভৌম রবীন্দ্রনাথের জীবনাবসান হয়।

৬. রবীন্দ্র-সাহিত্যে ফ্যাসিবাদ-বিরোধিতা :

বিশ্বমানবতাবাদের মহান প্রবক্তা আন্তর্জাতিকতাবাদী রবীন্দ্রনাথের ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের প্রসঙ্গই এতক্ষণ আলোচিত হলো। কিন্তু এই বহিরঙ্গের বাইরে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত পরিচয় যেখানে—অর্থাৎ সৃজনশীল সাহিত্যিক ও কবিসার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ রূপে তাঁর ফ্যাসিবাদ-বিরোধিতা, সেই বিষয়টিও গুরুত্বসহকারে আলোচিত হওয়া প্রয়োজন।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে ফ্যাসিস্ত-বিরোধিতার অসংখ্য উদাহরণ নানা রচনায় ছড়িয়ে রয়েছে। কখনো প্রবন্ধ, কখনো পত্রসাহিত্য, কখনও বা অতুলনীয় এবং অনন্য কিছু কবিতায় কবির ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তীব্র রোষ-ক্ষোভ ও ক্রোধ প্রতিভাত। সেই সঙ্গে উদ্ভাসিত হয়েছে বিশ্বমানবের লাঞ্ছনা-অপমান ও নির্যাতনে

বিচলিত কবির অন্তরের ব্যথা ও বেদনা। অবশ্য এসবের অধিকাংশই হলো কবির শেষ বয়সের (স্পষ্টত বলা যায়, শেষ দশ বছরের) ফসল।

১৯৩৩ সালে কবির দৌহিত্র সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইউরোপ থেকে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে একটি পত্রে লিখলেন, কবি নাকি সচেতনভাবে হিটলার-শাসনাধীন নাৎসী জার্মানীকে সমর্থন করছেন।[৯২] এই পত্রের উপলক্ষ ছিল শান্তিনিকেতনে 'বিশ্বভারতী'র একটি আলোচনা সভায় (সেমিনার) নাৎসী জার্মানীর ভারতস্থ দূতাবাসের এক উচ্চপদস্থ কর্মচারীর নাৎসীশাসনের সমর্থনে বক্তৃতা। রবীন্দ্রনাথ ওই সেমিনারে নাৎসীশাসন বা জার্মানী সম্পর্কে একটি কথাও উচ্চারণ করেননি। আর উক্ত সেমিনারটি ছিল একান্তভাবেই শিক্ষা-সংক্রান্ত (**Academic**) বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সে যাইহোক, সৌম্যেন্দ্রনাথ কবি সম্পর্কে ঐ অসত্য অভিযোগটি করতে সাহস পেতেন না যদি তাঁর পড়া থাকত কয়েক মাস পূর্বেই লিখিত কবির 'কালান্তর' প্রবন্ধটি। ১৯৩৩-এর জুলাই মাসে লিখিত উক্ত প্রবন্ধটিতে কবি লিখেছেন:

"...পোলিটিকাল মতভেদের জন্যে ইটালি যে দ্বীপান্তরবাসের বিধান করেছে, সে কিরকম দুঃসহ নরকবাস সে কথা সকলেরই জানা আছে। য়ুরোপীয় সভ্যতার আলোক যেসব দেশ উজ্জ্বলতম করে জ্বালিয়েছে, তাদের মধ্যে প্রধান স্থান নিতে পারে জর্মনি। কিন্তু আজ সেখানে সভ্যতার সকল আদর্শ টুকরো টুকরো করে দিয়ে এমন অকস্মাৎ এত সহজে উন্মত্ত দানবিকতা সমস্ত দেশকে অধিকার করে নিলে, এও তো অসম্ভব হলো না। যুদ্ধপরবর্তীকালীন য়ুরোপের বর্বর নির্দয়তা যখন আজ এমন নির্লজ্জভাবে চারদিকে উদ্‌ঘাটিত হতে থাকল তখন এই কথাই বার বার মনে আসে, কোথায় রইল মানুষের সেই দরবার যেখানে মানুষের শেষ আপীল পৌছবে আজ।"[৯৩]

চীনে জাপ-আক্রমণের সূচনাকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ জাপানকে তীব্র নিন্দা ও ভৎর্সনা করে আসছিলেন। তিনি নিদারুণ উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার সঙ্গে সংবাদপত্রে নিয়মিত চীন-জাপান যুদ্ধের সংবাদ পাঠ করছিলেন। জাপানীদের অমানুষিক বর্বরতার সংবাদে তিনি খুবই অশান্ত ও বিচলিত হন। এই সময় একদিন একটি ছোট সংবাদ তাঁর নজরে আসে—জাপানে একদল সৈনিক যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রার পূর্বে জয়-কামনা করে বুদ্ধমন্দিরে ভগবান বুদ্ধের মূর্তির সামনে প্রার্থনা করছে। সংবাদটি পাঠ করার পর জাপানীদের নির্লজ্জ দস্যুবৃত্তি ও ভণ্ডামিকে তীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে বিদ্ধ করে তিনি 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি' কবিতাটি রচনা করেন।[৯৪] পরে কবিতাটি 'পত্রপুট' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়। কবিতাটির প্রথম ছত্রগুলি এরকম:

"যুদ্ধের দামামা উঠল বেজে।
ওদের ঘাড় হল বাঁকা, চোখ হল রাঙা,
কিড়মিড় করতে লাগল দাঁত।
মানুষের কাঁচা মাংসে যমের ভোজ ভরতি করতে

বেরোল দলে দলে।
সবার আগে চলল দয়াময় বুদ্ধের মন্দিরে
তাঁর পবিত্র আশীর্বাদের আশায়।
বেজে উঠল তুরী ভেরি গরগর শব্দে
কেঁপে উঠল পৃথিবী।"

এর পরের বছরই আমরা দেখছি, কবি অনুরূপ আর একটি কবিতা রচনা করেছেন, যার নাম 'বুদ্ধভক্তি' (৭ই জানুয়ারি, ১৯৩৮)। কবিতাটি 'নবজাতক' কাব্য সংকলনে সংকলিত হয়েছে। কবিতা দুটির মর্মার্থ একই। কবি শুধু এই কবিতাটির পূর্বে মন্তব্য করেছেন :

"জাপানের কোনো কাগজে পড়েছি জাপানি সৈনিক যুদ্ধের সাফল্য কামনা করে বুদ্ধমন্দিরে পূজা দিতে গিয়েছিল। ওরা শক্তির বাণ মারছে চীনকে, ভক্তির বাণ বুদ্ধকে।"[৯৫]

১লা বৈশাখ (১৩৪৫) নববর্ষের দিন এক পত্র-প্রবন্ধে কবি তাঁর প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রণার কথা ব্যক্ত করে অমিয় চক্রবর্তীকে লেখেন :

"আমাদের জীবনের শেষ পর্বে মানুষের ইতিহাসে এ কী মহামারীর বিভীষিকা দেখতে দেখতে প্রবল দ্রুতগতিতে সংক্রমিত হয়ে চলেছে—দেখে মন বীভৎসতায় অভিভূত হোলো। এক দিকে কী অমানুষিক স্পর্ধা, আর একদিকে কী অমানুষিক কাপুরুষতা! মনুষ্যত্বের দোহাই দেবার কোনো বড়ো আদালত কোথাও দেখতে পাইনে।...

"এই বিশ্বব্যাপী আশঙ্কার মধ্যে আমরা আছি ক্লীব নিষ্ক্রিয়ভাবে দৈবের দিকে তাকিয়ে—এমন অপমান আর কিছু হতে পারে না—মনুষ্যত্বের এই দারুণ ধিক্কারের মধ্যে আমি পড়লুম আজ ৭৮ বছরের জন্মবৎসরে।"[৯৬]

রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনেকেতনে ছিলেন। এই সময় মিউনিক চুক্তি ও নাৎসী জার্মানীর বিজয়োল্লাসের সংবাদে তিনি ক্ষুব্ধ ও অত্যন্ত বিচলিত হয়ে ওঠেন। বৃহৎ চতুঃশক্তির পদপেষণে দলিত-নিষ্পিষ্ট চেকোস্লোভাকিয়ার উদ্দেশে এই সময়ই কবি রচনা করেন 'প্রায়শ্চিত্ত' কবিতাটি (৪ঠা অক্টোবর, ১৯৩৮)। এর কয়েকটি পঙ্‌ক্তি নিম্নরূপ :

"প্রতাপের ভোজে আপনারে যারা বলি করেছিল দান
সে দুর্বলের দলিত পিষ্ট প্রাণ
নরমাংসাশী করিতেছে কাড়াকাড়ি,
ছিন্ন করিছে নাড়ী।

* * *

"ঐ দলে দলে ধার্মিক ভীরু
কারা চলে গির্জায়
চাটুবাণী দিয়ে ভুলাইতে দেবতায়।"[৯৭]

ভারতবর্ষে সমকালীন কোনো কবি চেকোস্লোভাকিয়ার উপর ফ্যাসিস্ত-আক্রমণ বা মিউনিক চুক্তিকে উপলক্ষ করে কবিতা লিখেছেন বলে জানা যায় না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেই কাজটি করেছিলেন।

'প্রান্তিক' কাব্যসংকলনে অন্তর্ভুক্ত সমকালে রচিত (২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৩৭) আর একটি কবিতাও এ-প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

"রাষ্ট্রপতি যত আছে
প্রৌঢ় প্রতাপের, মন্ত্রসভাতলে আদেশ-নির্দেশ
রেখেছে নিষ্পিষ্ট করি রুদ্ধ ওষ্ঠ-অধরের চাপে
সংশয়ে সংকোচে। এ দিকে দানবপক্ষী ক্ষুব্ধ শূন্যে
উড়ে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে বৈতরণীনদীপার হতে
যন্ত্রপক্ষ হুংকারিয়া নরমাংসক্ষুধিত শকুনি,
আকাশেরে করিল অশুচি। মহাকালসিংহাসনে-
সমাসীন বিচারক, শক্তি দাও, শক্তি দাও মোরে,
কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী, শিশুঘাতী নারীঘাতী
কুৎসিত বীভৎসা 'পরে ধিক্কার হানিতে পারি যেন "[৯৮]

সমসাময়িককালে কবির মানসিক অভিব্যক্তির প্রকাশ সুন্দরভাবে আর একটি কবিতায় ফুটে উঠেছে। ফ্যাসিবাদী অগ্রাসনের বিরুদ্ধে তরুণ সমাজকে আহ্বান জানিয়ে তিনি 'আহ্বান' কবিতায় বলেছেন (১০ই এপ্রিল, ১৯৩৯) :

"বিশ্বজুড়ে ক্ষুব্ধ ইতিহাসে
অন্ধবেগে ঝঞ্ঝাবায়ু হুংকারিয়া আসে
ধ্বংস করে সভ্যতার চূড়া।
ধর্ম আজি সংশয়েতে নত,
যুগযুগের তাপসদের সাধনধন যত
দানব পদদলনে হল গুঁড়া
তোমরা এসো তরুণ জাতি সবে
মুক্তিরণ-ঘোষণাবাণী জাগাও বীররবে।"[৯৯]

কবির আশাবাদের সুর এই কবিতাতেও স্পষ্টই উচ্চারিত।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যখন পুরোদমে শুরু হয়ে গিয়েছে কবি তখন ছিলেন কালিম্পঙে। মহাযুদ্ধের নিদারুণ বীভৎসতায় কবির মানসিক প্রতিক্রিয়া সেসময় কি রূপ পরিগ্রহ করেছিল, তা কালিম্পঙে থাকাকালে রচিত কয়েকটি কবিতা ও চিঠিপত্রে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। কবি প্রত্যাশা করতেন, মহাবিধ্বংসের চিতাভস্ম থেকে মানুষ মহাসৃষ্টিরই অঙ্গীকার গ্রহণ করবে। 'অভিশাপ' কবিতায় (প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩৪৭) এই সুরই ধ্বনিত :

"রক্তমাখা দন্তপঙ্‌ক্তি হিংস্র সংগ্রামের
শত শত নগরগ্রামের

অন্ন আজ ছিন্ন ছিন্ন করে;
ছুটে চলে বিভীষিকা মূর্ছাতুর দিকে দিগন্তরে।

* * *

এ কুৎসিত লীলা যবে হবে অবসান,
বীভৎস তাণ্ডবে
এ পাপযুগের অন্ত হবে,
মানব তপস্বীবেশে
চিতাভস্মশয্যাতলে এসে
নবসৃষ্টি-ধ্যানের আসনে
স্থান লবে নিরাসক্তমনে—
আজি সেই সৃষ্টির আহবান
ঘোষিছে কামান।”[১০০]

যুদ্ধের বিরুদ্ধে এতখানি তীব্র ঘৃণা, এত প্রচণ্ড ক্রোধ ও আক্রোশ সমকালীন বাংলা-কাব্যে আর কারো কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে কিনা সন্দেহ। কয়েকদিন পরে, যেদিন বুলোন নগরীর (Boulogne) পতন হয় সেই দিনই কবি অমিয়বাবুকে এক পত্রে তাঁর এই কবিতা রচনা সম্পর্কে লিখেছেন (কালিম্পঙ, ২৪ মে, ১৯৪০):

“……তুমি জানো আমার অনেক কবিতা দুর্যোগের ফসল। দুর্দিনের প্রতি স্পর্ধা প্রকাশ আমার কলমের স্বভাব—সে চেম্বারলেনের ছাতার বাঁটে তৈরী নয়। লক্ষ্মীর চেলারা দুঃসময়ের কাছে ভেবড়ে যায় কিন্তু সরস্বতীর চেলা তাকে ডিঙিয়ে যায় কিম্বা তার ফুটোয় ফুটোয় বাঁশির আওয়াজ তুলে উদ্বিগ্ন হাওয়ার দীর্ঘশ্বাস ডুবিয়ে দিতে থাকে।” [১০১]

এই রচনার সপ্তাহখানেক পরেই কবি রচনা করেন একটি তিমিরবিনাশী কবিতা (৩১ মে, ১৯৪০), যা পরবর্তীকালে তাঁর ‘জন্মদিনে’ নামক কাব্যসংকলনে সংকলিত হয়:

“দামামা ঐ বাজে
দিন-বদলের পালা এলো
ঝোড়ো যুগের মাঝে।
শুরু হবে নির্মম এক নূতন অধ্যায়,
নইলে কেন এত অপব্যয়—
আসছে নেমে নিষ্ঠুর অন্যায়,
অন্যায়েরে টেনে আনে অন্যায়েরই ভূত
ভবিষ্যতের দূত।

* * *

“শেষ পরীক্ষা ঘটাবে দুর্দৈবে—
জীর্ণ যুগের সঞ্চয়েতে কী যাবে, কী রইবে।

পালিশ-করা জীর্ণতাকে চিনতে হবে আজি
দামামা তাই ঐ উঠেছে বাজি।"[১০২]

জার্মান বোমারু বিমানগুলি যখন ইংল্যাণ্ডে প্রচণ্ডভাবে বোমাবর্ষণ করছে, যখন ফ্রান্স হিটলারের পদানত, যখন ইউরোপ জুড়ে চলছে পৈশাচিক বর্বরতা এবং নরহত্যা—তখন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা আর ক্রোধ প্রকাশ করে রবীন্দ্রনাথ অমিয় চক্রবর্তীকে লিখলেন আর একটি বিখ্যাত পত্র-প্রবন্ধ (২০শে জুন, ১৯৪০)।[১০৩]

এইভাবে শুধু কবিতা বা প্রবন্ধ-সাহিত্যের মাধ্যমেই নয়, ফ্যাসিবাদকে প্রত্যক্ষ-ভাবে আক্রমণ করে কবিসার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে রচনা করেছিলেন ফ্যাসিস্ত দেশ ও নেতাদের ব্যঙ্গবিদ্রূপে বিদ্ধ করে কয়েকটি অসাধারণ ছড়া। যেমন :

"ঐ শোনা যায় রেডিওতে বোঁচা গোঁফের হুম্‌কি
দেশ বিদেশে সহরে গ্রামে গলাকাটার ধূম কি!
গোঁ গোঁ করে রেডিওটা কে জানে কার জিত,
মেশিন গানে গুঁড়িয়ে দিল সভ্য বিধির ভিত।"

কিংবা,

"মনে রেখো দৈনিক,/চা খাইবে চৈনিক
গায়ে যদি বল পাও/হবে তবে সৈনিক
জাপানীরা যদি আসে/চিঁড়ে নিক দৈ নিক
আধুনিক কবিদের/যত পারে বই নিক।"

অথবা, "জাপানী ও জাপানী,
তোমার হাড়েতে লাগিবে কাঁপানি
এখন যতই কর লাফানি ঝাঁপানি।"

এগুলো যে নিছক 'ছেলে-ভুলানো ছড়া' নয়, এটা বলাই বাহুল্য। 'রক্তমাখা অস্ত্রহাতে যত রক্ত আঁখি/শিশুপাঠ্য কাহিনীতে থাকে মুখ ঢাকি'—হিটলার-মুসোলিনীদের সম্পর্কেও কবির এটাই শেষ কথা। প্রকৃতপক্ষে, এর প্রায় দুই-তিন বছর পরে 'ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ' এবং 'গণনাট্য সংঘ-'র কবি-সদস্যেরা যেসব ফ্যাসিবিরোধী কবিতা ও গান রচনা করেন সেই পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের এই সব কবিতা-প্রবন্ধ ও ছড়াগুলিকে বিচার করলে তা কি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয় না?[১০৪]

কবি যে শুধুমাত্র শান্তিবাদী ছিলেন না, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ-যুদ্ধই যে ছিল তার প্রতিবাদী জীবনের আদর্শ, তা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। 'প্রান্তিক' কাব্যসংকলনের কবিতাগুলিএর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ১৯৩৭ সালে স্পেনে ও চীনে ফ্যাসিস্ত আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তাই তিনি লেখেন :

"নাগিনীরা চারি দিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস,
শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস—

বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।"[১০৫]

কবি তাঁর শেষ প্রবন্ধ 'সভ্যতার সংকট' রচনা করেছিলেন তাঁর জীবনাবসানের মাত্র মাস কয়েক পূর্বে। মানবতাবাদী কবি মনুষ্যত্বের উপর তাঁর দৃঢ় আস্থা এই প্রবন্ধেও উচ্চারণ করেছেন। আশাবাদ এই রচনাতেও স্পষ্টভাবে উচ্চারিত :

"আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি—পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম, কী রেখে এলুম, ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ! কিন্তু মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর-এক দিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।"[১০৬]

বাঙলার ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলনে রবীন্দ্র-সাহিত্য এইভাবে এক নব অনুপ্রেরণা ও উন্মাদনা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল, একথা শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্মরণীয়।

তৃতীয় অধ্যায়

বাঙলায় ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনের সুচনা : প্রাক-জনযুদ্ধ পর্যায়

অবিভক্ত বাঙলায় ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত ত্রিশের দশক থেকেই। এই সময় জাতীয় স্তরে জওহরলাল নেহরু সহ আরও বেশ কিছু নেতা ও বুদ্ধিজীবী ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেও, বাঙলা ব্যতীত অন্য কোনো প্রদেশে অন্তত ত্রিশের দশকে তেমন ব্যাপক আকারে, সংগঠিতভাবে কোনো ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলন গড়ে ওঠেনি। যদিও সর্বভারতীয় স্তরে, অর্থাৎ অন্যান্য প্রদেশেও ত্রিশের দশক থেকেই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী রাজনৈতিক সচেতনতা প্রসারিত হচ্ছিল, তথাপি বাঙলার মতো তা মতাদর্শের দিক থেকে সংহত এবং সংগঠিতভাবে এতখানি তীব্র হয়ে উঠতে পারেনি।

বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকে বাঙলা ছিল সত্যিই এক ঐতিহাসিক যুগ-সন্ধিক্ষণের মুখোমুখি। জাতীয় কংগ্রেস তথা গান্ধীজীর নেতৃত্বে ক্রমবর্ধমান আইন-অমান্য আন্দোলন যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি কাঁপিয়ে তুলেছে, তখন চৌরি-চৌরার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে হঠাৎ এই বিরাট গণ-আন্দোলনেব অবসান ঘটিয়ে 'বারদৌলি পশ্চাদাপসরণ' জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরস্থ দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠীর পালের হাওয়া বহুলাংশে কেড়ে নিল। নেহরু, সুভাষ বসু প্রমুখ বামপন্থী নেতারা গান্ধীজীর আপস-নীতির বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে ঘটল বামপন্থী শক্তির এক নতুন অভ্যুত্থান। অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাঙলা প্রদেশেই এই বামপন্থার বীজ রোপিত হলো অনেক বেশি পরিমাণে।

একদিকে, আইনঅমান্য আন্দোলনের ব্যর্থতাজনিত গ্লানি ধুয়েমুছে সাফ করার জন্য 'গান্ধী-আরউইন চুক্তি মানি না'—এই ধ্বনি তুলে শতশত ক্ষুব্ধ ও বিপ্লবী যুবক ঝাঁপিয়ে পড়লেন সশস্ত্র বিপ্লববাদী আন্দোলনে। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, কলকাতা-মেদিনীপুর-কুমিল্লা প্রভৃতি জেলায় ব্রিটিশ শাসকদের উপর সশস্ত্র আক্রমণ, এরই জ্বলন্ত বহিঃপ্রকাশ। অন্যদিকে, সদ্যগঠিত কমিউনিস্ট পার্টির 'কলকাতা কমিটি-'র নেতৃত্বে চলতে থাকল শ্রমিকশ্রেণীকে সংগঠিত করার কাজ, ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আদর্শ ছড়িয়ে দেওয়ার সংগঠিত উদ্যোগ। প্রসঙ্গত, ১৯২৯ সালে মীরাট-ষড়যন্ত্র মামলায় বন্দী কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগে সাম্যবাদী মতাদর্শ প্রচারের জন্য আদালতকে ব্যবহারের কথাও স্মরণযোগ্য। এই সব কিছুর মিশ্র প্রতিক্রিয়ায় বাঙলা প্রদেশ তখন যেমন বামপন্থী আন্দোলনে অগ্রণীর ভূমিকায়, তেমনি সমাজতান্ত্রিক ও মার্কসবাদী চিন্তাধারা

প্রসারের মধ্য দিয়ে এক নতুন পথের সন্ধানেও ব্যাপৃত। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র থেকে উৎসারিত সমস্ত রাজনৈতিক প্রসঙ্গই তাই এই সময় বাঙলাকে সকলের আগে আলোড়িত করতে থাকে। সুতরাং ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনে বাঙলা যে সবার পুরোভাগে থাকবে তা সহজেই অনুমেয়।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও এটা সত্যিই এক আশ্চর্যের বিষয় যে, সেইসময় বাঙলায় এমন কয়েকজন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ছিলেন যাঁরা অত্যন্ত সচেতনভাবেই ফ্যাসিবাদ ও ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার সমর্থনে প্রচার চালাতে থাকেন। এঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতালীয় ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক প্রমথনাথ রায়, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতির অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার এবং বিশ্ব-বিশ্রুত ভাষাতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তিরা।[১] নিঃসন্দেহে এটা বলা যায় যে, একধরনের সাময়িক বিভ্রান্তিরই শিকার হয়েছিলেন এঁরা, কারণ পরবর্তীকালে এঁদের অনেককেই দেখা গিয়েছিল ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনে সামিল হতে।

এ-প্রসঙ্গে বাঙলার তৎকালীন কিছু নামী-দামী সংবাদপত্র ও সাময়িক সাহিত্য-পত্রিকার ফ্যাসিস্ত-তোষণনীতির কথাও স্মরণযোগ্য। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দের রচনায় সমৃদ্ধ 'ক্যালকাটা রিভ্যু' পত্রিকাটি ছিল এই বিষয়ে সব চেয়ে অগ্রণী। অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার ছিলেন এই পত্রিকার প্রাণপুরুষ। ড. নেপাল মজুমদার 'ক্যালকাটা রিভ্যু'-র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও অধ্যাপকদের একাংশের মধ্যে 'ফ্যাসিস্ত লবি'-র কথা উল্লেখ করেছেন।[২] যদিও 'লবি' শব্দটির ব্যবহার এক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য নয়, তবু সেই সময়ে (১৯৩০-৩৪) মুসোলিনী, হিটলার ও তাঁদের প্রচারিত ফ্যাসিবাদ কিংবা নাৎসীবাদের প্রতি একধরনের বিশেষ মোহ যে কলকাতার বুদ্ধিজীবী মহলের একাংশের মধ্যে বিরাজিত ছিল, তা কলঙ্ক-জনক হলেও ঐতিহাসিক সত্য। **'Calcutta Review'** এবং **'Modern Review'** পত্রিকায় প্রকাশিত ফ্যাসিবাদের সমর্থনে রচিত প্রবন্ধগুলি পাঠ করলেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়।[৩]

এটা লক্ষণীয় যে, ১৯২৭ সাল থেকেই কংগ্রেসের কিছু জঙ্গী ও জাতীয়তাবাদী নেতা এবং সংবাদপত্র ফ্যাসিজমের সপক্ষে প্রচারকার্য শুরু করেন। ১৯২৭ সালেই সাংবাদিক তারকনাথ রায় মুসোলিনীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে তার একটি জীবন-চরিত রচনা করেন। ১২ই জুন (১৯২৭) রবিবারের 'অমৃতবাজার পত্রিকা' উক্ত বইটির সমালোচনা-প্রসঙ্গে মুসোলিনীর দারুণ প্রশংসা করে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদও ধ্বনিত হয়। প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা মুজফ্‌ফর আহমদ 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র এই ঘৃণ্য ফ্যাসিস্তস্তাবকতার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ করে তখনকার 'গণবাণী'তে (১৬ই জুন, ১৯২৭) 'ভদ্রশ্রেণীর মানবিকতা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।[৪] প্রবন্ধটিতে বলা হয়:

"...তারকনাথ বাবুর পুস্তকের বিজ্ঞাপন পড়ে বোঝা যাচ্ছে যে এর ভূমিকা-

লেখক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়েরও নাকি মত ঠিক তাই, অর্থাৎ দেশপ্রাণতার অবতার বলে তিনিও মুসোলিনিকে সার্টিফিকেট দিয়েছেন। দেশের জনগণের উপর অকথ্য অত্যাচার করা, জনগণের নেতৃগণকে কেবলমাত্র জনগণের নেতা হওয়ার অপরাধেই হত্যা করা ও কারাগারে নিক্ষিপ্ত করাই কি দেশপ্রাণতার পরিচয়? দেশপ্রাণতার এই আদর্শ নিয়েই কি উপেন্দ্রনাথ বারো বছর ঘানি ঘুরিয়ে এসেছেন?"[৫]...

'আনন্দবাজার পত্রিকা' এবং 'দেশ'-এর মতো প্রতিষ্ঠিত দৈনিক আর সাপ্তাহিক পত্রিকায় যেভাবে তখন হিটলার ও নাৎসী-উত্থানকে স্বাগত জানানো হয়েছিল তা ভাবলে আজ আশ্চর্য হতে হয়। 'হের হিটলার ও নব্য জার্মানী'—এই শিরোনামে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছিল:

"যে শক্তিমান বীর নূতন পতাকা হস্তে ইউরোপের রাষ্ট্রক্ষেত্রে ভাগ্যবিধাতারূপে পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইলেন তিনি হিটলার—সফলকাম নায়ক মুসোলিনির শিষ্য, ফরাসীর দুঃশ্চিন্তার স্থল এবং ইংরাজের উৎকণ্ঠার কারণ। ...জার্মানীকে হীনতামুক্ত করিতে যদি তিনি কৃতকার্য হন, তাহা হইলে তিনি জার্মানীর রাষ্ট্রক্ষেত্রে এক মহৎকার্য করিয়া ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন সন্দেহ নেই।"[৬]

'দেশ' পত্রিকাও তার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যাতেই হিটলারের উদ্দেশে প্রশস্তি জানিয়ে 'হিটলার ও জার্মানী' শীর্ষক নিবন্ধে লিখেছিল:

"...জার্মান জাতি যখন পরাজয়ের গ্লানি লইয়া অবসাদের অন্ধকারে দুঃসহ ব্যথা ভোগ করিতেছিল, সেই সময় আশা ও শক্তির বাণী লইয়া আবির্ভূত হইলেন হিটলার।...আজ তিনি জার্মানীর সর্বময় প্রভু—সমস্ত জাতির কাছে আজ তিনি ত্রাণকর্তারূপে প্রতিভাত হইতেছেন।

"জার্মানীর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কমিউনিস্টদের পরাজয় এবং হার, হিটলারের এই আকস্মিক অভ্যুদয়—একটি সত্যের প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করিতেছে। এই সত্যটি হইতেছে, যুগে যুগে মানুষের কাছে জন্মভূমির স্বাধীনতার দাবীই সর্বাপেক্ষা বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। যতক্ষণ পর্যন্ত মাতৃভূমি অসম্মানের ধূলিতলে লুটাইতে থাকে ততক্ষণ মানুষ, বিশ্ববিপ্লব, আন্তর্জাতিক মুক্তি ইত্যাদি বড় বড় কথা লইয়া মাথা ঘামাইতে ভালোবাসে না। হিটলারের কণ্ঠে জাতীয়তার বাণী দেশাত্মবোধের মন্ত্র। কমিউনিস্টদের কাছে স্বাজাত্যাভিমান সংকীর্ণতার পরিচয়, তাহাদের কাছে আন্তর্জাতিক প্রশ্নই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। জাতীয়তার বোধকে তাহারা একটু বক্র দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে।... হিটলার জাতির আশু জীবনমরণ সমস্যার সমাধান করিতে অগ্রসর। তাই আজ তিনি জার্মানীর মুকুটহীন রাজা। জার্মানীর ইতিহাস হইতে ভারতবর্ষেরও শিখিবার অনেক কিছু আছে।"[৭]

এইসব প্রবন্ধ-নিবন্ধ থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, উৎকট জাতীয়তাবোধ

এবং উগ্র কমিউনিস্ট বিরোধিতাই ছিল এই জাতীয় বিপজ্জনক রচনার মূল উৎস। আমাদের মনে রাখা দরকার, হিটলারের পৈশাচিক দমননীতির বীভৎসতা তখন দিনের পর দিন 'রয়টার' পরিবেষিত সংবাদে খুব বেশি করে না হলেও অন্তত বেশ কিছু পরিমাণে প্রকাশিত হচ্ছে। হাজার হাজার ইহুদি ও কমিউনিস্টদের রক্তে জার্মানীর পথঘাট যখন রক্তরঞ্জিত, গণতান্ত্রিক ও মৌলিক মানবিক অধিকার সমূহ যখন হিটলার কর্তৃক পদদলিত, তখন তার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর এই সব পত্র-পত্রিকায় উচ্চারিত হলো না।[৮]

একটু অনুসন্ধান করলে এটাও জানা যাবে যে, হিটলার ও মুসোলিনীর তৈলাক্ত প্রশস্তি শুধুমাত্র জাতীয়তাবাদী কয়েকটি পত্রিকাগোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। প্রকৃতপক্ষে, দেশের তৎকালীন বিভ্রান্ত তরুণ ও যুবসমাজের একাংশ, এমন কি বুদ্ধিজীবীদেরও একটা বড় অংশ অন্তরে অন্তরে তখন হিটলার ও মুসোলিনীর মূর্তি পূজা করতে শুরু করেছেন। শুধু তাই নয়, দেশের সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদেরও একটি অংশ, যাঁরা তখনও পর্যন্ত মার্কসবাদ বা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের অনুশীলন বা চর্চা শুরু করেন নি, তাঁরাও মনে মনে ফ্যাসিস্ত এবং নাৎসী-আদর্শ লালন করে চলেছিলেন ; আর কেউ কেউ সেই মনোভাব প্রকাশ্যেই ব্যক্ত করতেন। এমনকি তৎকালে কংগ্রেসনেতা সুভাষচন্দ্র বসুও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। ইউরোপে অবস্থানকালে মুসোলিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পর সুভাষচন্দ্র মুসোলিনীর এবং ফ্যাসিস্ত আদর্শের প্রশংসা করে ভারতবাসীর উদ্দেশে এক বাণী প্রেরণ করেন এবং ভারতীয় যুবকদের 'ফ্যাসিস্ত আদর্শ' গ্রহণের প্রস্তাব দেন। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই 'দেশ' পত্রিকায় অমরেন্দ্র রায় এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন।[৯]

ভারতীয় তরুণ ও যুবসমাজের, বিশেষত বিভিন্ন সংবাদপত্রের এই ধরনের নির্লজ্জ ফ্যাসিস্ত-প্রশস্তি সম্পর্কে রোম্যাঁ রোলাঁকে প্রথম সচেতন করে তোলেন সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।[১০] এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে এক মুহূর্ত বিলম্ব না করেই রোলাঁ তাই ভারতীয় তরুণদের উদ্দেশে এক দীর্ঘ মর্মস্পর্শী আবেদনবাণীতে তাঁদের সতর্ক করে দিয়ে বললেন (২৭শে নভেম্বর, ১৯৩৩):

"ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে আমি আবার তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছি। সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিকার উপর এই ফ্যাসিজম্ তাহার হিংস্র প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, ভারতবর্ষের উপরও করিতে উদ্যত হইয়াছে। ফ্যাসিজমের মার্জার সদৃশ সাধুতায় আপনারা কিছুতেই ভুলিবেন না।

"...'সাবধান হউন'—ইহাই আমার একান্ত আবেদন। সাবধান হউন, মুখোশ-পরা এই ফ্যাসিজমের হাত হইতে, আরও সাবধান হউন ঐ হিটলার-মুসোলিনীর মতন লোকের ভণ্ড স্বাদেশিকতার সংস্পর্শ হইতে। আমি জানি কিভাবে তাহারা অর্থ দ্বারা, সংবাদপত্র দ্বারা, রাষ্ট্রনীতিক কূটচক্রের দ্বারা তাহাদের প্রচারকার্য চালায় এবং কেমন করিয়া তাহারা দেশের যুবশক্তিকে ফ্যাসিজমের তীব্র সুরায় উন্মত্ত করিয়া তোলে এবং অন্ধ জনসাধারণকে

প্রবঞ্চনা করিয়া থাকে। আপনারা ইহা জানেন না, অথবা বুঝিতে পারেন না। আমরা ইউরোপ তাহা জানিয়াছি এবং বুঝিতে পারিয়াছি।

"হে আমার ভারতীয় তরুণগণ! চক্ষু উন্মীলন করিয়া একবার চাহিয়া দেখুন। এবং আজও যাহারা ঘুমাইতেছেন তাঁহাদিগকে জাগাইয়া তুলুন! আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হউন!"[১১]

যাহোক, ১৯৩৫-৩৬ সাল থেকেই ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে এই মোহজাল খুব দ্রুত কাটতে শুরু করে। ইতালির আবিসিনিয়া আক্রমণ এবং গণতন্ত্র নিধনকারী ফ্যাসিস্ত ফ্রাঙ্কোর আমন্ত্রণে স্পেনের উপর সরাসরি হিটলারী আক্রমণে ভারতবর্ষের ফ্যাসিস্ত-মোহে আচ্ছন্ন বুদ্ধিজীবী ও যুবসমাজের একটা বড় অংশের মধ্যে ফ্যাসিবাদ-বিরোধিতার চেতনা জাগ্রত হতে থাকে। অবশ্য কমিউনিস্ট বিরোধিতা, উৎকট স্বাজাত্যবোধ এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সুতীব্র বিদ্বেষ অনেককেই বহুদিন পর্যন্ত হিটলার-ভক্ত করে রেখেছিল। কারণ, তাঁদের একটা হাস্যকর ও ভিত্তিহীন ধারণা ছিল যে, হিটলার ও মুসোলিনী ব্রিটিশদের হাত থেকে ভারতবাসীর মুক্তি এনে দেবে।

এসব সত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য যে, ত্রিশের দশকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই এদেশের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে তীব্র বিরূপতা ও বিরুদ্ধতা দানা বাঁধতে থাকে। ১৯৩৫-৩৬ সালেই আমরা দেখলাম, বাঙলায় এক সচেতন ও সংগঠিত ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠতে শুরু করেছে। নিঃসন্দেহে এই আন্দোলনের একটি সর্বভারতীয় জাতীয় পটভূমিকাও বিদ্যমান ছিল, যা উল্লেখ না করলে এই আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

এই প্রসঙ্গে একটি গ্রন্থের কথা এখানে উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন। সেটির নাম—'**Hitlerism or The Aryan Rule in Germany**'। ইংরাজী-ভাষায় সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক রচিত এই গ্রন্থটিই ভারতবর্ষে প্রকাশিত প্রথম ফ্যাসিস্ত-বিরোধী গ্রন্থরূপে স্বীকৃত ও সমাদৃত। গ্রন্থটি (লেখক কর্তৃক 'গণশক্তি প্রকাশভবন' ৪১, জ্যাকেরিয়া স্ট্রীট, কলকাতা থেকে প্রকাশিত ; প্রকাশকাল : ডিসেম্বর, ১৯৩৩) সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ছিল একটি অতি মূল্যবান প্রকাশনা। এই গ্রন্থের ভূমিকাংশে বলা হয়েছে :

"এই গ্রন্থটি জার্মান ফ্যাসিবাদ বিষয়ক প্রবন্ধ-সংকলন। প্রবন্ধগুলি ১৯৩৩ সালের এপ্রিল থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে রচিত।…কিন্তু প্রবন্ধগুলি লেখার সময়ে আমার প্রধানতম বাসনা ছিল ভারতের তরুণদের হিটলারী সন্ত্রাসমূলক শাসনের ঘটনাবলীর সঙ্গে পরিচিতি ঘটানো, তাদের কাছে জার্মান ফ্যাসিবাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক মতাদর্শ ব্যাখ্যা করা এবং ভারতে ও প্রধানত কলকাতায় নাৎসীদের তোষণকারী একদল ঘৃণ্য ভারতীয় যে ধূর্ত ও অনিষ্টকারী নাৎসী প্রচার চালাচ্ছে তার বিরুদ্ধে তাদের অস্ত্র-সজ্জিত করে তোলা। …বর্বরতম সন্ত্রাসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হিটলারবাদের বিরুদ্ধে যে বীরত্বপূর্ণ

সংগ্রাম চালাচ্ছে জার্মানীর জঙ্গী শ্রমিকশ্রেণী—সেই সংগ্রামকে শুধু আমাদের প্রশংসা নয়, জানাতে হবে সক্রিয় সংহতিও।"[১২] [ইংরাজী থেকে অনূদিত]

যেসব প্রবন্ধ এই গ্রন্থটিতে (**Hitlerism or The Aryan Rule in Germany**) ছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো :

(i) Hitler's National "Socialism", (ii) Anti-semitism in Fascist Germany, (iii) A Few instances of Nazi Terror in Germany, (iv) Hitler's Foreign Politics and India, (v) The Disintegration of German Fascism, (vi) Hitler's Imperialist Policy, (vii) The Reichstag Fire প্রভৃতি।

নিঃসন্দেহে গ্রন্থটি তৎকালে বাঙলা তথা ভারতবর্ষে ফ্যাসিস্ত-বিরোধিতার ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

১. জাতীয় পটভূমিকা : সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বামশক্তির উত্থান

ত্রিশের দশক থেকেই ভারতের জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মনোভাব প্রবল হয়ে ওঠে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর মনে সঞ্চিত ছিল যে-সহজাত ঘৃণা ও ক্রোধ তা স্বাভাবিকভাবেই সাম্রাজ্যবাদের সবচেয়ে নিষ্ঠুর ও নিকৃষ্টতম রূপ—ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদের বিরুদ্ধেও ক্রমশ তীব্র ও প্রবল আকার ধারণ করতে থাকে। এই সময়ে জাতীয় কংগ্রেসের কর্মসূচীতে, জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত বামপন্থী নেতাদের, বিশেষত নেহরুর বক্তব্যের মধ্যে, এই ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সুর খুবই স্পষ্ট ও জোরালো হয়ে উঠেছিল—যদিও গান্ধীজী ব্যক্তিগতভাবে ফ্যাসিবাদ বা নাৎসীবাদের বিরুদ্ধে কোনোদিনই ঐভাবে সোচ্চার হতে পারেননি।

ইতিমধ্যে ১৯৩৫-এ আবিসিনিয়ার উপর ফ্যাসিস্ত ইতালির আক্রমণ, ১৯৩৬-এ স্পেনে হিটলার ও মুসোলিনীর প্রত্যক্ষ মদতে জেনারেল ফ্রাঙ্কো কর্তৃক ফ্যাসিস্ত অভ্যুত্থান এবং ১৯৩৭-এ সমরবাদী জাপানের চীন আক্রমণের বিরুদ্ধে স্বাভাবিকভাবেই কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বামপন্থী অংশ, বিশেষ করে কমিউনিস্টরা, ফ্যাসিবাদ-বিরোধী রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু করে। এ বিষয়ে জওহরলাল নেহরুই ছিলেন তাঁদের প্রধান মুখপাত্র।

বস্তুত, ত্রিশের দশকের সূচনা থেকেই নেহরু সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হন। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে তিনিই ছিলেন প্রধানতম নেতা—যিনি ফ্যাসিবাদের বিপদকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করে তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। কারাগারে বন্দী থাকা কালে কন্যা ইন্দিরাকে লেখা পত্রাবলীতেই ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে তাঁর সুস্পষ্ট ধারণা ও তীব্র বিরোধিতার নিদর্শন মেলে। ইন্দিরাকে লেখা একটি পত্রে জওহরলাল লিখেছেন :

"ফ্যাসিবাদ এখন দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ছে, আর সঙ্গে সঙ্গে এটা স্পষ্ট হয়ে

উঠছে যে ফ্যাসিবাদ ইতালির ঘরোয়া ব্যাপার নয়। যখনই কোনো দেশে কতকগুলো বিশেষ ধরনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা দেখা দেয়, তখনই ফ্যাসিবাদের উদ্ভব হয়। শ্রমিকশ্রেণী যখন শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং ধনবাদী রাষ্ট্রের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তোলে, ধনিকশ্রেণীও তখন স্বাভাবিক-ভাবেই আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। সাধারণত ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকটের সময়েই শ্রমিকশ্রেণীর এ ধরনের জাগরণ দেখা যায়। যদি ক্ষমতাসীন শ্রমিক-শ্রেণী সাধারণ গণতান্ত্রিক উপায়ে পুলিশ ও সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করে শ্রমিক জাগরণকে দমন করতে না পারে, তাহলে তখন তারা ফ্যাসিস্ত পদ্ধতি অবলম্বন করে।...এই আন্দোলনের প্রধান সমর্থন যোগায় নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজ, প্রধানত বেকাররা এবং রাজনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ ও অসংগঠিত শ্রমিক-কৃষকদের অংশ।...ধনবাদী সরকার বহুলাংশে তাদের তোয়াজ করে, কারণ উভয়েরই শত্রু এক—সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী শ্রমজীবী জনতা। ক্ষমতায় এলে ফ্যাসিস্টরা শ্রমিকশ্রেণীর সমস্ত সংগঠনকে ধ্বংস করে এবং সমস্ত বিরোধীদের সন্ত্রস্ত করে।"[১৩] [ইংরাজী থেকে অনূদিত]

১৯৩৬ ও ১৯৩৭ সালে পরপর দু'বছর কংগ্রেস সভাপতি রূপে নির্বাচিত হন জওহরলাল নেহরু। বলাবাহুল্য, সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শে আস্থাশীল জওহরলাল কংগ্রেসের মধ্যেকার বামপন্থী অংশের পূর্ণ সমর্থন নিয়েই ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে এক ধারাবাহিক সংগ্রাম শুরু করতে সমর্থ হন। ইতালির আবিসিনিয়া আক্রমণের প্রতিবাদে ১৯৩৬ সালের ৬ই মে 'আবিসিনিয়া দিবস' পালনের আহ্বান জানিয়ে জওহরলাল একটি বিবৃতি দেন। তাতে তিনি বলেন:

"...সাময়িকভাবে সাম্রাজ্যবাদ বিজয়ী হয়েছে, কিন্তু আবিসিনিয়ার কিংবা অন্য কোনো পরাধীন দেশের মুক্তি-সংগ্রাম থেমে যাবে না, চলবেই—যতদিন পর্যন্ত না সাম্রাজ্যবাদকে নিশ্চিহ্ন করে পৃথিবীর সর্বত্র স্বাধীনতা বিজয়ী হয়।"[১৪]

১৯৩৬-এ লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের 'যুদ্ধ-বিরোধী' প্রস্তাবে বলা হলো:

"বিশ্বযুদ্ধের বিপদ এখন অনেক বেশি বেড়ে গেছে। বিভিন্ন দেশে দেখা দিয়েছে ফ্যাসিস্ট একনায়কত্ব,...ফলে পৃথিবী জুড়ে এক বিরাট ভয়াবহ যুদ্ধের বিপদ দেখা দিচ্ছে।· কংগ্রেস এই বিপদের বিরুদ্ধে দেশকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছে এবং ঘোষণা করছে যে ভারতবর্ষ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে না।"[১৫]

ঐ একই বছর ডিসেম্বরে (১৯৩৬) ফৈজপুরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবে সুস্পষ্টভাবেই বলা হয়:

"...স্পেনে আজ ফ্যাসিবাদ ও গণতান্ত্রিক প্রগতির মধ্যে যে-লড়াই চলছে, তা সমস্ত পৃথিবীর পক্ষেই গুরুত্বপূর্ণ এবং সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতবর্ষকেও তা প্রভাবিত করতে বাধ্য।...ভারতবর্ষের জনসাধারণের হয়ে কংগ্রেস স্পেনের জনসাধারণকে অভিনন্দন জানাচ্ছে এবং স্বাধীনতার জন্য তাদের এই মহান সংগ্রামে স্পেনের জনতার পাশে দাঁড়াবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে।"[১৬]

১৯৩৭-এর অক্টোবর মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রস্তাবে বলা হলো :

"চীনের উপর জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বর্বর আক্রমণ এবং বেসামরিক অধিবাসীদের উপর নিষ্ঠুর বোমাবর্ষণে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি গভীর উদ্বেগ ও ঘৃণা প্রকাশ করছে।...

"চীনের জনগণের সঙ্গে সৌহার্দ্য জানিয়ে জাপানী-পণ্য ব্যবহার সম্পূর্ণ বর্জন করার জন্য কমিটি ভারতের জনগণের কাছে আহ্বান জানাচ্ছে।"[১৭]

১৯৩৮-এর জুলাইতে প্যারিসে যে আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাতে জওহরলাল নেহেরু বলেন :

"...স্পেন এবং চীনের বিপদ আমাদেরও বিপদ, তাঁদের উপর আঘাত এলে আমরাও ক্ষতবিক্ষত হই। ভবিষ্যতে ভালোমন্দ যাই আসুক না কেন, আমরা হাতে হাত ধরেই তার মোকাবিলা করব।"[১৮]

১৯৩৮ সালের ৮ইসেপ্টেম্বর 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান'-এ জওহরলালের একটি পত্র প্রকাশিত হয়। তাতে তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় ভারতবর্ষের মনোভাব বিশ্বের দরবারে তুলে ধরে লেখেন :

"আমাদের সমস্ত সহানুভূতি চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রতি। যদি যুদ্ধ আসে তাহলে তাঁদের ফ্যাসিস্তপ্রেমী সরকার সত্ত্বেও ইংরেজরা অনিবার্যভাবে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বেই। কিন্তু যে ব্রিটিশ সরকার ফ্যাসিস্ত ও নাৎসী রাষ্ট্রের প্রেমে গদগদ, সেই সরকার কেমন করে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার জন্য লড়াই করবে?... সে যাই হোক, ভারতবর্ষে আমরা সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদ উভয়েরই বিরুদ্ধে, কারণ আমরা জানি যে এরা উভয়েই বিশ্বশান্তি ও স্বাধীনতার শত্রু।"[১৯]

বস্তুত, ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত জহরলাল নেহরুর মতো অন্যকোনো জাতীয় নেতাকে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়নি। শুধুমাত্র কংগ্রেস সভাপতিরূপে বা জাতীয় নেতারূপে বক্তৃতা করা কিংবা বিবৃতি প্রদান করাই নয়, নেহরু সেসময় ছুটে যান ফ্যাসিস্ত-আক্রান্ত স্পেনের রণক্ষেত্রে (১৯৩৬)। বার্সিলোনায় গিয়ে তিনি সাক্ষাৎ করেন ফ্যাসিস্তশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামরত 'আন্তর্জাতিক ব্রিগেডের' সঙ্গে[২০] এবং রোমাঁ রোলাঁর নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গেও যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন।[২১] জাপ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত চীনা জাতীয় ফ্রন্টের কাছ থেকে সাহায্য প্রেরণের আবেদন এলে (২৪ ডিসেম্বর, ১৯৩৭) ঐদিনই এলাহাবাদ থেকে জওহরলাল কংগ্রেস সভাপতিরূপে এক প্রেস বিবৃতিতে চীনে অর্থ ও ঔষধপত্রাদি প্রেরণের জন্য দেশবাসীর উদ্দেশে আবেদন জানান। এই উদ্দেশ্যে তিনি ৯ই জানুয়ারি (১৯৩৮) দেশের সর্বত্র 'চীন-দিবস' পালনেরও আহ্বান জানান।[২২]

জওহরলাল নেহরু এ-প্রসঙ্গে তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন :

"যদি বিশ্বে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয় তবে শুধুমাত্র ফ্যাসিবাদ বা নাৎসীবাদই

ধ্বংস হবে না, অবসান ঘটবে সাম্রাজ্যবাদেরও। এই বিশ্বাস শুধু আমার একারই নয়, আরো অসংখ্য ভারতবাসীরও ছিল। তাদেরই উৎসাহ ও উদ্দীপনার ফলেই তাই কংগ্রেস সারাদেশে চীন, আবিসিনিয়া, প্যালেস্টাইন ও স্পেনের সমর্থনে সংগঠিত করেছিল হাজার হাজার সভা ও শোভাযাত্রা। চীন ও স্পেনে প্রেরণ করা হয়েছিল খাদ্য ও চিকিৎসার সাজসরঞ্জাম।"[২৩]

প্রকৃতপক্ষে, ১৯৩৮-এর ১লা সেপ্টেম্বর চীনে ডাঃ মদনমোহন অটলের নেতৃত্বে যে-পাঁচ সদস্যের 'কংগ্রেস মেডিকেল মিশন' (অন্য চারজন সদস্য ছিলেন ডাঃ দ্বারকানাথ কোটনিস, ডাঃ বিজয় বসু, ডাঃ দেবেশচন্দ্র মুখার্জি ও ডাঃ চোলকার) পাঠানো হয় তার উদ্যোক্তা ছিলেন প্রধানত নেহরুই, যদিও সুভাষচন্দ্রও এক্ষেত্রে যথেষ্ট সক্রিয় ছিলেন।[২৪] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এর পূর্বে ১৯৩৬ সালে স্পেনে দুই সদস্যের যে ভারতীয় মেডিকেল মিশন পাঠানো হয়—তারও নেতা ছিলেন ডাঃ অটল, অন্যজন ডাঃ মুলক্‌রাজ আনন্দ।

যাইহোক, নেহরুর এই রকম ফ্যাসিবাদ-বিরোধী তৎপরতা ও সমাজতান্ত্রিক চিন্তাভাবনা গান্ধীজীর মোটেই পছন্দ ছিল না। বিশেষ করে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে সেসময় (১৯৩৪) জয়প্রকাশ নারায়ণ, আচার্য নরেন্দ্র দেও, অশোক মেহতা, রামমনোহর লোহিয়া প্রমুখের নেতৃত্বে 'কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির' উত্থান ও কমিউনিস্টদের প্রতিপত্তিবৃদ্ধি গান্ধীজী এবং দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ যথেষ্ট সন্দেহের চোখে দেখতেন। তাঁদের আশঙ্কা ছিল, ফ্যাসিবিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে সোস্যালিস্ট ও কমিউনিস্টরা কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী অংশের পালের হাওয়া কেড়ে নেবে। সেইসঙ্গে নেহরুর মতো জনপ্রিয় ও প্রতিষ্ঠিত তরুণ নেতাও তাঁদের হাতছাড়া হয়ে যাবেন। বস্তুতই গান্ধীজী, যিনি কখনোই ফ্যাসিবাদ বা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রতিরোধ-আন্দোলনকে সমর্থন জানান নি (তাঁর মতে যে-কোনো হিংসাই নিন্দনীয়, এমনকি আত্মরক্ষার জন্য যে-হিংসা তাও),[২৫] তিনিই নেহরুকে বামপন্থীদের 'কবলমুক্ত' করার চেষ্টা করেন এবং অবশেষে ১৯৩৯-এ জওহারলালকে তাঁর পক্ষে টেনে এনে বামপন্থী সুভাষচন্দ্রকেও কংগ্রেস সভাপতি পদ থেকে উৎখাত ও শেষপর্যন্ত কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত করতেও সক্ষম হন। কিন্তু এটা অবশ্যই উল্লেখ্য যে, ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত নেহরু যতটা সম্ভব গান্ধীজীর ব্যক্তিত্বের অমোঘ প্রভাবমুক্ত হয়েই স্বাধীনভাবে ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বামপন্থী ভূমিকা পালন করেছিলেন। একথা যেমন কমিউনিস্টরাও স্বীকার করেন, তেমনি স্বীকৃত হয়েছে ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগের তথ্যেও। সম্প্রতি প্রকাশিত **'Communism in India : Unpublished Documents'** নামক গ্রন্থে সংকলিত একটি গোপন ব্রিটিশ গোয়েন্দা রিপোর্ট থেকেও জওহরলাল সম্পর্কে আমরা অনুরূপ সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারি :

"Another and very powerful factor is the attitude of Jawaharlal Nehru, who, without perhaps being labelled a practi-

sing communist, may certainly be called a self-inspired communist and an ally of all that mass revolution means....

"An example is the 'League Against Imperialism' which has always had India as its main objective. Recently, the communist inspiration behind the League became so openly recognised that in April of this year it was formally dissolved; it behoved the leopard to camouflage his spots. A new organisation took its place called the 'Colonial Information Bureau,' with the same address in London, and the same communist direction. Its fortnightly bulletin .. ...B. F. Bradley, the Meerut convict responsible for its publication and most of its material obtained from the congress foreign news letters sent by Air Mail from Allahabad. These and other foreign contacts of Nehru use every avilable opportunity to focus the limelight on India "[২৬]

মোটকথা, কমিউনিস্টদের কাছে সেইসময় জওহরলালের রাজনৈতিক অবস্থান ছিল অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য। কমিউনিস্ট নেতা সরোজ মুখার্জি'র ভাষায় :

"...১৯৩৬ সালেই লক্ষ্ণৌতে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে জওহরলাল নেহরু সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে সংগ্রামের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে ভাষণ দেন। সভাপতির অভিভাষণে এই প্রথম সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ঘোষণা করা হয়। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তখন ভারতের সমস্ত বামপন্থী কংগ্রেস কর্মী, কমিউনিস্ট, সোস্যালিস্ট প্রভৃতি সমস্ত প্রগতিশীল শক্তির আশা-ভরসার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ান। কারাগারে বসে আমরা সংবাদপত্রে জওহরলাল নেহরুর ভাষণ পাঠ করে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আপসহীন মুক্তিসংগ্রাম সম্পর্কে খুবই আশান্বিত হয়ে উঠতাম।"[২৭]

আমরা জানি, ১৯৩৪ সালে ব্রিটিশ সরকার ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনী ঘোষণা করে। ফলে, অসংখ্য নেতা ও কর্মীকে কারারুদ্ধ করা হয়। বস্তুত, সারা ভারতবর্ষ জুড়ে এই সময় কমিউনিস্টদের প্রভাব একদিকে যেমন শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ক্রমশ বেড়েই চলেছিল, অন্যদিকে তেমনি দেশের বিভিন্ন অংশে কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে বড বড় শ্রমিক এবং কৃষক-আন্দোলনও সংগঠিত হচ্ছিল। এইসব কারণে আতঙ্কিত হয়েই ব্রিটিশ সরকার কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনী ঘোষণা করে।[২৮] বলাই বাহুল্য, কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী অংশ এতে খুশিই হয়েছিল।

ইতিমধ্যে ১৯৩৫ সালে মস্কোতে অনুষ্ঠিত 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক'-এর সপ্তম অধিবেশনে ডিমিট্রভের বিখ্যাত 'যুক্তফ্রন্ট তত্ত্ব' উপস্থাপিত এবং গৃহীত হয়। দেশে দেশে কমিউনিস্টদের নির্দেশ দেওয়া হয়—ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সমস্ত

দল ও ব্যক্তিকে নিয়ে বৃহত্তর জাতীয় ফ্রন্ট গঠন করার জন্য। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ডিমিট্রভের বক্তব্য ছিল নিম্নরূপ :

"In India the communists have to support, extend and participate in all anti-imperialist mass activities, not excluding those which are under national reformist leadership. While maintaining their political and organizational independence, they must carry on active work inside the organizations which take part in the Indian National Congress, facilitating the process of crystallization of a national revolutionary wing among them, for the purpose of further developing the national liberation movement of the Indian peoples against British Imperialism."[২৯]

এই ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির দুই নেতা রজনী পাম দত্ত এবং বেন ব্রাডলি ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে ভারতীয় কমিউনিস্টদের কোন রণকৌশল গ্রহণ করা উচিত সে সম্পর্কেএকটি নির্দেশপত্র প্রেরণ করেন, যা 'দত্ত-ব্রাডলি থিসিস' (১৯৩৫) নামে সুপরিচিত।[৩০] ভারতীয় কমিউনিস্টরা পূর্ব থেকেই ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বতন্ত্রভাবে সংগ্রামরত ছিলেন, এবার পার্টি বেআইনী ঘোষিত হবার ফলে তাঁরা কমিণ্টানের নির্দেশানুসারে এবং দত্ত-ব্রাডলি থিসিসের প্রস্তাবানুয়ায়ী ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী 'জাতীয় যুক্তফ্রন্ট' গঠনে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। কংগ্রেস-সোস্যালিস্ট পার্টির সদস্যরূপে বেশ সংগঠিতভাবে তাঁরা কংগ্রেসে অনুপ্রবেশ করতে থাকেন। ফলে, কংগ্রেসের মধ্যে নেহরু ও সুভাষ বসুর নেতৃত্বে এক ইতিবাচক বামপন্থী শক্তির সমাবেশ ঘটে, যারা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গ্রহণ করতে সমর্থ হয় আপসহীন সংগ্রামের পথ। ইতিহাসের সাক্ষ্য থেকে নিঃসন্দেহে একথা বলা যায়, এক্ষেত্রে কমিউনিস্টদের ভূমিকা ছিল যথেষ্ট বলিষ্ঠ এবং সমুজ্জ্বল।

এই রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটেই লক্ষ্ণৌ-কংগ্রেসের অধিবেশন মণ্ডপে ১৯৩৬ সালে দুটি উল্লেখযোগ্য সর্বভারতীয় গণসংগঠন ও একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন আত্মপ্রকাশ করে। এই গণসংগঠনগুলির নাম যথাক্রমে 'সারা ভারত কৃষক সভা (**A.I.K.S.**) নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন (**A.I.S.F**) এবং 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ (**A.I.P.W.A**)।

১৯৩৬ সালকে তাই এই কারণেই আধুনিক ভারতীয় ইতিহাসের জলবিভাজিকা রূপে অনায়াসে চিহ্নিত করা চলে। এই সবক'টি গণসংগঠনই গড়ে উঠেছিল বাম-নেতৃত্বে, বিশেষ করে সংখ্যাল্প হলেও কমিউনিস্টদের সক্রিয় উদ্যোগে ও তাঁদের ঐকান্তিক নিষ্ঠায়। সমাজ-প্রগতির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার নীতিই ঘোষিত হয়েছিল এইসব সংগঠনের ঘোষণাপত্রে।

'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ'-র প্রসঙ্গটিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কারণ, প্রধানত এই সংগঠনটিই পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে ফ্যাসিস্ত-বিরোধিতার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এ-প্রসঙ্গে অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন :

"প্রগতি লেখক সংঘকে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার প্রথম প্রয়াস হয়েছিল এদেশে নয়, বিদেশে ; লণ্ডনে এক ঘরে বসে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের কয়েকজন যে আলোচনা ১৯৩২-৩৩-৩৪ সালে করেছিল, তারই পরিণতি ঘটে 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ' প্রতিষ্ঠায়। সে আলোচনায় যারা যোগ দেয়, তারা সবাই যে লেখক তা নয়। ·· মুলক্‌রাজ, আনন্দ, সজ্জাদ জহীর, ভবানী ভট্টচার্য, ইক্‌বাল সিং, রাজা রাও, মুহম্মদ আশরফ্‌ এবং আরও ক'জন মিলে যে আলোচনা চলে তারই জের এদেশে টেনে ১৯৩৫ সালে প্রস্তাবিত প্রগতি লেখক সংঘের ইস্তাহার প্রকাশ হয়। ১৯৩৬ সালে ইস্টারের ছুটিতে লক্ষ্মৌ কংগ্রেসের সময় মুন্সী প্রেমচন্দের সভাপতিত্বে নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের প্রথম প্রকাশ্য অধিবেশন হয়।"[৩১]

'প্রগতি লেখক সংঘে'র ইস্তাহারে সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয় :

"··· · যা কিছু আমাদের নিশ্চেষ্টতা, অকর্মণ্যতা, যুক্তিহীনতার দিকে টানে, তাকে আমরা প্রগতি-বিরোধী বলে প্রত্যাখ্যান করি। যা কিছু আমাদের বিচারবুদ্ধি উদ্বুদ্ধ করে, সমাজব্যবস্থা ও রীতিনীতিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে পরীক্ষা করে, আমাদের কর্মিষ্ঠ, শৃঙ্খলাপটু ও সমাজের রূপান্তরক্ষম করে, তাকে আমরা প্রগতিশীল বলে গ্রহণ করব।"[৩২]

উর্দু ও হিন্দী লেখকদের শিরোমণি প্রেমচন্দ-র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সরোজিনী নাইডু, মওলানা হস্‌রৎ মোহানী (জাতীয় আন্দোলনের প্রবীণ নেতা ও উর্দুভাষার প্রতিষ্ঠিত কবি), যশ্‌পাল, সুমিত্রানন্দন পন্থ, রশীদ জহাঁ, ফয়েজ আহ্‌মদ ফয়েজ, সজ্জাদ জহীর প্রভৃতি উত্তর ভারতের প্রতিষ্ঠিত লেখক ও কবিরা। দক্ষিণ-ভারত থেকে প্রসিদ্ধ তেলুগু কবি আবুরি রামকৃষ্ণরাও যোগ দেন এই সম্মেলনে। বাঙলা থেকে চারজন প্রতিনিধি গিয়েছিলেন। জহরলাল নেহরু এই সম্মেলনে যে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন তাতে ফ্যাসিবাদ-বিরোধিতার সুরই ধ্বনিত হয়।[৩৩] এই সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশই ছিলেন সমাজতান্ত্রিক ও মার্কসবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ প্রতিনিধিস্থানীয় লেখক-শিল্পী ও বুদ্ধিজীবী।

প্রকৃতপক্ষে, প্রগতি লেখক সংঘ প্রতিষ্ঠিত হবার পরেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এর মধ্যে 'কমিউনিস্ট-চক্রান্তের' আভাস পায়। তাদের অনুগত 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকা খোলাখুলিভাবে 'প্রগতি লেখক সংঘে'র বিরুদ্ধে শুরু করে কুৎসা প্রচার।[৩৪]

একথা সত্যি, এই সময় 'প্রগতি লেখক সংঘ' গঠনে কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবীরা সক্রিয় ছিলেন এবং সংঘ পরিচালনার প্রধান উদ্যোগ ও নিয়ন্ত্রণ ছিল এঁদেরই হাতে; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মতো অকমিউনিস্ট বিরোধীদের পূর্ণ সমর্থন এবং সহযোগিতাও তাঁরা লাভ করেছিলেন।[৩৫]

ইতিমধ্যে ১৯৩৬ সালে স্পেনের বুকে অনুষ্ঠিত ফ্যাসিস্ত বর্বরতাকে প্রতিহত করার জন্য মনীষী রোম্যাঁ রোলাঁ বিশ্ববাসীর কাছে এক আকুল আবেদন পেশ করেন। ১৯৩৭ সালের জানুয়ারি মাসে ভারতের বিভিন্ন সংবাদপত্রে তাঁর সেই আবেদন প্রকাশিত হলে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মহলে অভূতপূর্ব এক সাড়া জাগে। এই আবেদনে রোলাঁ আবেগদীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন:

"......মনুষ্যত্ব! মনুষ্যত্ব! আজ তোমার দ্বারে আমি ভিখারি। এস, স্পেনকে সাহায্য কর! আমাদের সাহায্য কর! তোমাদের সাহায্য কর! কেননা তুমি আমি সকলেই আজ বিপন্ন।

"এই সকল নরনারী বালক বালিকা এবং জগতের শিল্প ও ঐশ্বর্যসম্ভার নষ্ট হতে দিও না। আজ যদি তুমি নীরব থাক, কাল তোমার পুত্রকন্যা, তোমার স্ত্রী, তোমার প্রিয়জন, তোমার জীবনের যাহা কিছু প্রিয় ও পবিত্র, তাহাও একে একে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। আজ যদি তোমরা হাসপাতাল, যাদুঘর, শিশুদের ক্রীড়াউদ্যান, ঘন জনপূর্ণ অঞ্চলে বোমাবর্ষণ বন্ধ না কর—তাহা হইলে হে জগতের অধিবাসীবৃন্দ, শীঘ্র হউক, বিলম্বে হউক, তোমাদের ভাগ্যও অনুরূপ হইবে। এই সূচনায় তোমরা যদি ইহা নিভাইয়া না-ফেল, তাহা হইলে এই প্রলয়ানলে ধ্বংসের গতি আর কে সংযত করিবে? সমগ্র জগৎ ইহার কবলে পড়িবে।

"সময় নাই। অতি দ্রুত প্রস্তুত হও। উঠ, জাগ, কথা বল, চিৎকার কর, কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও! আমরা যদি যুদ্ধ বন্ধ না-ও করিতে পারি, তথাপি যাহাতে আন্তর্জাতিক বিধিব্যবস্থা সকলে সম্মান করিতে বাধ্য হয়, সে ব্যবস্থা করিতে তো পারি। এস আমরা নির্দোষ ও নিরুপায়কে রক্ষা করি।"[৩৬]

এই আবেদন প্রেরণের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ ও ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনকে ব্যাপকতর করে তোলার জন্য 'লীগ এগেইনস্ট ফ্যাসিজম্ এ্যাণ্ড ওয়ার'-এর পক্ষ থেকে রোলাঁ ও পল ল্যাঁজভা উভয়েই জাতীয় কংগ্রেসের কাছে এক আবেদন পেশ করেছিলেন। যাহোক, লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের ঠিক আগে, কলকাতায় বাঙলাদেশের কমিউনিস্ট, সোস্যালিস্ট ও প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা যুদ্ধ ও ফ্যাসিস্ত-বিরোধী সঙ্ঘের একটি সাংগঠনিক কমিটি গঠন করেন। বিশ্বশান্তি-কংগ্রেস এবং আবিসিনিয়া, প্যালেস্টাইন ও স্পেনের ব্যাপারে তাঁরাই গ্রহণ করেন নেতৃত্বের ভূমিকা।

অল্পকাল পরে এঁদেরই উদ্যোগে 'লীগ এগেইনস্ট ফ্যাসিজম্ এ্যাণ্ড ওয়ার'-এর সর্বভারতীয় কমিটি গঠিত হয় (১৯৩৭-এর মার্চ)।[৩৭] রবীন্দ্রনাথ হন এর সর্বভারতীয় সভাপতি। কার্যকরী সভাপতি (চেয়ারম্যান) ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন যথাক্রমে কে. টি. শাহ্ ও সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই সংগঠনের অন্যান্য সদস্যরা হলেন: আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, সরোজিনী নাইডু, এস. ব্রেলভি (সম্পাদক, বম্বে ক্রনিকল), কে. শান্তনম (সম্পাদক, মাদ্রাজ ডেলি এক্সপ্রেস), আর. এস. রুইকর (সহ-সভাপতি, সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস), তুষারকান্তি ঘোষ (সম্পাদক,

অমৃতবাজার পত্রিকা), ডঃ ধীরেন সেন (সম্পাদক, এ্যাডভ্যান্স), অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী (সম্পাদক, বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘ), সজ্জাদ জহীর (সাধারণ সম্পাদক, নিঃ ভারত প্রগতি লেখক সংঘ), স্বামী সহজানন্দ (সম্পাদক, নিঃ ভারত কিষাণ সভা), ইন্দুলাল যাজ্ঞিক, এন. জি. রঙ্গ, এস. এ. ডাঙ্গে, পি. ওয়াই. দেশপাণ্ডে, ডাঃ সুমন্ত মেহতা, মিঞা ইফ্‌তিকারউদ্দিন, জয়প্রকাশ নারায়ণ, কমলা দেবী, দেবেন সেন, নবকৃষ্ণ চৌধুরী, ডাঃ সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সমাজ-জীবনের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।[৩৮]

এই কমিটির পক্ষ থেকে স্পেনে ফ্যাশিস্ত-বিরোধী সংগ্রামে পূর্ণ সহানুভূতি জ্ঞাপন করে এবং অর্থ ও অন্যান্য উপকরণ দিয়ে সাহায্য করার আবেদন জানিয়ে বারবুঁস, রোলাঁ ও রবীন্দ্রনাথের ছবি ও আবেদনসহ 'স্পেন' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়।

'প্রগতি লেখক সংঘে'-র মতোই 'নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন' নামে আর একটি সর্বভারতীয় সংগঠনেরও জন্ম হয় ১৯৩৬ সালে লক্ষ্ণৌ শহরে। ১২-১৩-ই আগস্ট ভারতবর্ষের সর্বস্তরের ছাত্ররা ভাষা-জাতি ও ধর্মের ব্যবধান ভুলে 'শান্তি প্রগতি ও স্বাধীনতা'-র বাণী মুখে নিয়ে যে সংগঠিত ছাত্র আন্দোলনের সূত্রপাত করেন তা ভারতবর্ষের সাম্রাজ্যবাদ ও পরবর্তীকালে ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলনে নতুন এক জোয়ার সৃষ্টি করে। নিঃসন্দেহে এর মূল ভিত্তি ছিল বামপন্থার উপরই প্রতিষ্ঠিত। মুসলিম লীগ প্রভাবিত ছাত্র-ছাত্রীরাও এই সম্মেলনে যোগদান করেন। সম্মেলনের সভাপতির আসন থেকে, আশ্চর্য হলেও একথা সত্যি যে, মহম্মদ আলি জিন্না সাম্প্রদায়িকতা ও ভেদাভেদের উর্ধ্বে উঠে ছাত্রসমাজকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। যদিও ছাত্রদের প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যুক্ত হওয়ায় তাঁর কিছুটা আপত্তি ছিল। এই ছাত্র সম্মেলনে জওহরলাল নেহরু উদ্বোধনী ভাষণে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ছাত্রদের ঐক্যবদ্ধ হতে বলেন। উক্ত ছাত্র সম্মেলন উপলক্ষে গঠিত অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির পদ গ্রহণ করেছিলেন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. অমরনাথ ঝা এবং প্রেমনারয়ণ ভার্গব হয়েছিলেন এর সম্পাদক।[৩৯]

বস্তুত, একদিকে 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ,' অপরদিকে 'নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন'—এই দুটি সংগঠন গঠনের মধ্য দিয়েই কমিউনিস্ট পার্টি এবং কংগ্রেসের বামপন্থী অংশ সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলনে ভারতবর্ষের সচেতন ও শিক্ষিত সমাজকে সক্রিয় করে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। নিঃসন্দেহে এই পরিকল্পনা দ্রুত সার্থক হয়ে ওঠে এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে এই দুটি সমিতির প্রাদেশিক কমিটিও গড়ে ওঠে; বিশেষ করে বাঙলায় এর প্রতিক্রিয়া-সঞ্জাত প্রভাব ছিল সবথেকে বেশি। এছাড়াও ১৯৩৬ সালে গড়ে ওঠা 'সারা ভারত কিষাণ সভা' এবং বামপন্থী নেতৃত্বে পরিচালিত 'নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস' (A. I. T. U. C)-ও সমগ্র ভারতের সাধারণ শ্রমজীবী

জনসাধারণের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ক্রোধ ও ঘৃণাকে সচেতন ও সংগঠিত ভাবে ছড়িয়ে দিতে যথেষ্ট পরিমাণে সফল হয়েছিল।

২. বাঙলায় ফ্যাসিবাদ-বিরোধী বিভিন্ন শ্রেণীর গণসমাবেশ ঃ

এক সুতীব্র সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চেতনার আন্তর্জাতিক ও জাতীয় প্রেক্ষাপটেই ১৯৩৫ সাল থেকেই বাঙলাদেশে ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলন দ্রুত গড়ে উঠতে শুরু করে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই সময়কালের দুটি স্মরণীয় ঘটনা হলো—'লীগ এগেইনস্ট ফ্যাসিজম্ এ্যাণ্ড ওয়ার'-এর প্রতিষ্ঠা এবং 'ব্রাসেলস্ আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলনের' প্রস্তুতি। উল্লেখযোগ্য যে, এই শান্তি সম্মেলনকে অভিনন্দন জানিয়ে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে নেহরু একটি শুভেচ্ছা-বার্তা পাঠান এবং তার জবাবে ফ্রান্সিস গ্যরদাঁ বিশ্বশান্তি কমিটির পক্ষ থেকে নেহরুকে ধন্যবাদ জানিয়ে এক পত্রও প্রেরণ করেন।[৪০]

ভারতে তখন প্রত্যক্ষভাবে ফ্যাসিবাদ-বিরোধিতার নামে কোনো সংগঠন গড়ে না উঠলেও বিভিন্ন সংগঠন ও প্লাটফর্মের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই পুরোদমে ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে গেছে। বলাবাহুল্য, অবিভক্ত বাঙলাদেশ ছিল এই আন্দোলনের প্রধান উদ্যোক্তা ও পুরোধা।

যাহোক, ইতালি কর্তৃক আবিসিনিয়া আক্রমণের বিরুদ্ধে বাঙলার বুদ্ধিজীবীরা ও শ্রমিকনেতারা ইতিপূর্বেই সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। ১৯৩৫-এর ২৬শে জুলাই কলকাতার 'অ্যালবার্ট হল'-এ (বর্তমান কফিহাউস) ফ্যাসিস্ত ইতালির আবিসিনিয়া আক্রমণের প্রতিবাদে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রী জে. সি. গুপ্ত সেই সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং বক্তৃতা দেন ড. রামমনোহর লোহিয়া ও সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। ইতালির আক্রমণকে নিন্দা করে এবং ইতালির সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য-সম্পর্ক বন্ধ করার আহ্বান জানিয়ে সভায় একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।[৪১]

উপরোক্ত প্রতিবেদন থেকে স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে যে, কংগ্রেস-সমাজতান্ত্রিক-দের উদ্যোগেই এই সভা সংগঠিত হয়েছিল। এছাড়া এর কয়েকদিন পরেই ১লা আগস্ট (১৯৩৫), 'অ্যালবার্ট হল'-এ সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে ছাত্রদেরও একটি প্রতিবাদ সভা (ফ্যাসিস্ত ইতালির বিরুদ্ধে) অনুষ্ঠিত হয়েছিল।[৪২]

১৯৩৫-এর ২৭ শে অক্টোবর, রবিবার, কংগ্রেস-সমাজতন্ত্রী দলের বাঙলা শাখার দপ্তরে ৬০টি রাজনৈতিক ও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের প্রতিনিধিত্বমূলক একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস-সোশ্যালিস্ট পার্টি, বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, 'গণবাণী' গোষ্ঠী, মুসলিম যুব পরিষদ, বঙ্গীয় সমাজতন্ত্রী দল, বেঙ্গল লেবার পার্টি, বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে শ্রমিক সংঘ, কলকাতার ট্রাম শ্রমিক ইউনিয়ন প্রভৃতি সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। উক্ত সভা থেকে সর্বসম্মতিক্রমে 'ইতালি-আবিসিনিয়া যুদ্ধ-বিরোধী সংঘ' নামে একটি সংগঠন

গড়ে তোলা হয়। আবিসিনিয়ার উপর ফ্যাসিস্ত ইতালির আক্রমণের নিন্দা করে ও আবিসিনীয়দের বীরত্বপূর্ণ স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সৌহার্দ্য জানিয়ে সভায় একটি প্রস্তাবও গৃহীত হয়। ঐ সভায় বক্তৃতা করেন—কংগ্রেস-সমাজতন্ত্রী নেতা অতুলকৃষ্ণ বসু, ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রতিনিধি শান্তিরাম মণ্ডল এবং ট্রাম শ্রমিক নেতা মহম্মদ ইসমাইল প্রমুখ।[৪৩]

বস্তুতপক্ষে, এই সভা ছিল একান্তভাবে একটি শ্রমিক-সভা। নিছক অর্থনৈতিক দাবীদাওয়া আদায় কিংবা জাতীয় আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানাবার জন্য নয়—আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ফ্যাসিবাদের আগ্রাসী ভূমিকার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য এই উদ্যোগ ছিল নিঃসন্দেহে সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এই শ্রমিক সম্মেলন থেকে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী যে-সংঘ গড়ে ওঠে তাতে পরবর্তীকালে পাঁচজনকে অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষমতা প্রদান করে যে-প্রস্তুতি কমিটি তৈরি হয় তার সদস্য ছিলেন যথাক্রমে—অতুলকৃষ্ণ বসু (আহ্বায়ক), আশু দাস, সুধীন প্রামাণিক, ফণী দত্ত, মহঃ ইসমাইল, ধরমবীর সিংহ, প্রভাত সেন, অমৃত নাগ, অঘোর সেন, হীরেন চৌধুরী, এ. আর. ওসমান, নেপাল ভট্টাচার্য, শিবনাথ পাঠক, বীর সিং ও মণি দাশ।[৪৪]

আনন্দবাজার পত্রিকার আর একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে যে, বাঙলার চিকিৎসকদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশও ১৯৩৫ সালে এই ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলনে সামিল হন। আবিসিনিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সমর্থন জানিয়ে ও ফ্যাসিস্ত ইতালির আগ্রাসী ভূমিকার নিন্দা করে 'ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এ্যাসোসিয়েশন'-এর কেন্দ্রীয় পরিষদ তাঁদের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য একটি বিবৃতি দেন। বিবৃতিটিতে চিকিৎসক নেতৃবৃন্দ জানান যে, আবিসিনিয়ায় আহত স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের চিকিৎসা ও সেবা করার জন্য একদল ভারতীয় চিকিৎসককে স্বেচ্ছাসেবক রূপে পাঠানো হবে। এই কারণে প্রয়োজন আড়াই লক্ষ টাকা। সেই জন্য আই.এম.এ. জনসাধারণের কাছে অর্থ ও ওষুধপত্র সাহায্য রূপে প্রদান করার আবেদন জানাচ্ছে। দান বা সাহায্য প্রেরণের ঠিকানা ৬৭, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলকাতা। এই বিবৃতিতে ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠিত ডাক্তাররা স্বাক্ষর করেন। বাঙলার স্বাক্ষরকারী চিকিৎসকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন: ডাঃ নীলরতন সরকার, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায়, ডাঃ এ. সি. সেন, ডাঃ চারুচন্দ্র বসু প্রমুখ।[৪৫]

লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের কিছুকাল পূর্বেই ২রা এপ্রিল (১৯৩৬) কলকাতার অ্যালবার্ট হলে বেঙল লেবার পার্টি, কংগ্রেস-সোস্যালিস্ট পার্টি, ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার লীগ, গণশক্তি পাবলিশিং হাউস, বেঙ্গল লেবার এ্যাসোসিয়েশন প্রভৃতি মার্কসবাদী দল, গোষ্ঠী এবং ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের নিয়ে 'লীগ এগেইনস্ট ফ্যাসিজম্ এ্যাণ্ড ওয়ার'-এর বাঙলা শাখা গঠনের উদ্দেশ্যে এক বৈঠক হয়। এই বৈঠকে একটি নিখিল বঙ্গ সম্মেলনের মাধ্যমে 'যুদ্ধ ও ফ্যাসিবিরোধী সংঘ' আনুষ্ঠানিকভাবে গঠনের পরি-

কল্পনা করা হয়।[৪৬] কিন্তু এই পরিকল্পনাকে তখনই কার্যকর করা সম্ভবপর হয় নি। অবশ্য এর কয়েক মাস পরেই এই সংঘের বিশ্বকমিটির নির্দেশে ১লা আগস্ট (১৯৩৬) কলকাতার বিভিন্নস্থানে বাঙলা কমিটির উদ্যোগে 'যুদ্ধ-বিরোধী দিবস' উদ্‌যাপিত হয়। এর পর থেকেই এই সংঘ যুদ্ধ ও ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনে বাঙলা দেশে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে।[৪৭]

তরুণ ইংরাজ লেখক এবং সাহিত্য-সমালোচক র‍্যালফ ফক্স স্পেনে ফ্যাসিস্ত আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে যান আন্তর্জাতিক ব্রিগেডের সদস্য রূপে। স্পেনের রণক্ষেত্রেই তিনি নিহত হন (১৯৩৬)। ৩০ শে জানুয়ারি, ১৯৩৭ সালে কলকাতার 'মহৎ আশ্রম'-এ বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘের উদ্যোগে এই মহান ফ্যাসিস্ত-বিরোধী তরুণ লেখকের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করার জন্য এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রখ্যাত সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, অধ্যাপক হীরেন মুখোপাধ্যায়, কবি অরুণ মিত্র, সাহিত্যিক প্রবোধ সান্যাল প্রমুখ বিভিন্ন বক্তা তাঁর মহান আত্মদান ও সাহিত্যকৃতি সম্পর্কে সভায় আলোচনা করেন।[৪৮] এই সভাটি ছিল মুখ্যত একটি ফ্যাসিস্ত-বিরোধী সভা।

এর কয়েক মাস পরেই ১১ই মার্চ (১৯৩৭) যুদ্ধ ও ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সংঘের উদ্যোগে কলকাতার অ্যালবার্ট হল-এ স্পেনের গণতান্ত্রিক সরকারকে সাহায্যের আবেদন জানিয়ে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অধ্যাপক সুরেন্দ্র গোস্বামী, হীরেন মুখার্জি, গুণদা মজুমদার, ড. রামমনোহর লোহিয়া প্রমুখ সংঘের কর্মকর্তারা স্পেনের ফ্যাসিস্ত-বিরোধী সংগ্রামের তাৎপর্যটি ব্যাখ্যা করে স্পেন-সাহায্য-তহবিলে দেশবাসীকে অকাতরে সাহায্য করার জন্য আবেদন জানান। সভানেত্রীর ভাষণে সরোজিনী নাইডু বলেন :

> "...সমবেত হইয়াছি এই জন্য নয় যে, স্পেন আমাদের সাহায্যের জন্য আবেদন জানাইয়াছে। পরিশেষে স্পেনের ভাগ্যে যাহাই থাকুক না কেন সেই ভাগ্যের সহিত আমাদের ভাগ্যও জড়িত আছে বলিয়াই আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি।[৪৯]

এছাড়াও স্পেনের সংগ্রামরত জনগণের জন্য সাহায্য সংগ্রহ এবং এই সংগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য ও শিক্ষা জনসাধারণের মধ্যে ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে বাঙলা কমিটি (স্পেন-সাহায্য কমিটি) কলকাতায় এক সপ্তাহব্যাপী সভা-সমিতি ও মিছিলের কর্মসূচী গ্রহণ করেন। ১২ই এপ্রিল (১৯৩৭) বঙ্গীয় স্পেন-সাহায্য কমিটির উদ্যোগে কলেজ স্কোয়ারে 'স্পেন-সপ্তাহে'র প্রথম দিবস উপলক্ষে এক বিরাট জনসভা হয়। বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘের সম্পাদক সুরেন গোস্বামী সভায় সভাপতিত্ব করেন। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গুণদা মজুমদার প্রমুখ কমিটির নেতৃস্থানীয় কয়েকজন এখানে বক্তৃতা করেন। ছাত্র-যুবক ও শ্রমিকদের ব্যাপক সমাবেশ ঘটে এই সভায়।[৫০]

কলকাতায় আরো একটি উল্লেখযোগ্য ফ্যাসিস্ত-বিরোধী গণসমাবেশ ঘটে ৯ই

জানুয়ারি (১৯৩৮), 'চীন-দিবস' উপলক্ষে। ১৯৩৭-এর ২৪শে ডিসেম্বর চীন থেকে জাতীয় কংগ্রেসের কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন এসে পৌঁছায়। এই আবেদনে সাড়া দিয়ে ৯ জানুয়ারি (১৯৩৮) 'চীন-দিবস' প্রতিপালনের জন্য জওহরলাল দেশবাসীর কাছে আবেদন জানান। রবীন্দ্রনাথও ব্যক্তিগতভাবে আর একটি আবেদন-সূচক বিবৃতি প্রচার করেন এবং 'চীন-তহবিলে' স্বয়ং ৫০০ টাকা দান করেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও কংগ্রেস সভাপতি জওহরলালের এই আবেদনে সারাদেশে ব্যাপক সাড়া জাগে। দেশের অধিকাংশ জাতীয়তাবাদী পত্রপত্রিকা জাপানের সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের তীব্র নিন্দা ও সমালোচনা করে সম্পাদকীয় নিবন্ধাদি প্রকাশ করতে থাকে। ইতিমধ্যেই বাঙলায় বামপন্থী কর্মী ও বুদ্ধিজীবীরা 'চীন-তহবিলে' অর্থ সংগ্রহ করতে শুরু করে দিয়েছেন। ঐদিন (৯ই জানুয়ারি,' ৩৮) কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে এক বিরাট জনসভার মধ্য দিয়ে 'চীন-দিবস' উদ্‌যাপিত হয়। সভার পূর্বে শ্রমিক-ছাত্র-যুবদের এক বিরাট মিছিল শহরের নানা রাস্তা ঘুরে জাপানের বিরোধিতায় ও চীনের সমর্থনে ধ্বনি তোলে। ডাঃ সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে যে প্রস্তাবটি গৃহীত হয় তা নিম্নরূপ :

"সাম্রাজ্যবাদী জাপান ফ্যাসিস্ত নীতি অনুসরণ করে চীনের বিরুদ্ধে যে অভিযান করেছে—তাতে এই সভা আতঙ্কিত।

"রাষ্ট্রসংঘ চীনকে সাহায্য করিতে অস্বীকার করায় এই সভা তাহার নিন্দা করিতেছে। চীনের ব্যাপারে বৃটেন ও ফ্রান্সের অসহযোগিতার নীতির দ্বারা প্রকারান্তরে জাপানকেই সাহায্য করা হইতেছে।···

"এই সভা বাংলার শ্রমিক, কৃষক ও জনসাধারণকে জাপানী পণ্য বর্জন করিবার জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে এই আন্দোলনের ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছে।"[৫১]

প্রসঙ্গত বলা যায়, ১লা সেপ্টেম্বর (১৯৩৮) চীনে পাঁচ-সদস্যের যে 'মেডিক্যাল মিশন' কংগ্রেস প্রেরণ করে তার মধ্যে বাঙলা থেকে ছিলেন দুই সদস্য—ডাঃ দেবেশ চন্দ্র মুখার্জি ও ডাঃ বিজয় বসু (ইনি ডাঃ রণেন সেন-এর পরিবর্তে যান। কারণ, ডাঃ সেনকে কট্টর কমিউনিস্ট রূপে চিহ্নিত করে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে পাসপোর্ট দেন না)।[৫২]

৩. বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘের উদ্যোগ :

ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলনে অবিভক্ত বাঙলায় 'প্রগতি লেখক সংঘ' ছিল সত্যিই এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। বস্তুত, ভারতবর্ষে সংগঠিত প্রগতিশীল লেখকদের এই সংঘটিকে আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলনেরই অন্যতম এক প্রধান অংশীদাররূপে চিহ্নিত করা যায়।

বাঙলাদেশে অবশ্য ইতিপূর্বেই 'প্রগতি-সাহিত্য', 'গণ-সাহিত্য' ইত্যাদি নিয়ে

বিক্ষিপ্ত আলোচনা শুরু হয়েছিল। কিন্তু তা একান্তভাবেই ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠী-কেন্দ্রিক আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কারণ, সংঘবদ্ধ ও সংগঠিত কোনো আন্দোলন তখনও পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি। তাছাড়া 'প্রগতি সাহিত্যে'র আদর্শ ও লক্ষ্য সম্পর্কেও তাঁদের সুস্পষ্ট কোনো ধারণা ছিল না। লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের সময়-কালেই সর্বপ্রথম সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রগতিশীল সাহিত্যিক ও সাহিত্যগোষ্ঠীকে সংঘবদ্ধ করার এক প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়, যার পরিণতি ঘটে 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ' প্রতিষ্ঠার মধ্যে। সমস্ত মধ্যযুগীয় কুসংস্কার ও প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা এবং দেশে প্রগতিশীল চিন্তা-ভাবনার প্রসার ঘটানোই ছিল এই সংগঠনের মূল লক্ষ্য।[৫৩] সুতরাং খুব স্বাভাবিকভাবেই এই সংগঠনটি যে ফ্যাসিবাদ-বিরোধিতায় সোচ্চার হবে তা সহজেই অনুমেয়।

লক্ষ্ণৌ সম্মেলনের পর থেকেই অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী এবং প্রগতিশীল লেখকেরা বাঙলাদেশে প্রগতি লেখক সংঘের একটি শাখা স্থাপনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে-ছিলেন। ঠিক এই সময়েই বিশ্ববিখ্যাত কথাসাহিত্যিক ম্যাক্সিম গোর্কির মৃত্যু-সংবাদ (১৮ই জুন, ১৯৩৬) এসে এদেশে পৌঁছায়। বাঙলার প্রগতি লেখক সংঘের সাংগঠনিক কমিটি গোর্কির জীবনাবসানে কলকাতার অ্যালবার্ট হলের কমিটি রুমে একটি শোকসভার আয়োজন করেন (১১ ই জুলাই, ১৯৩৬)। এই শোকসভার আহ্বায়ক ছিলেন 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র তৎকালীন সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার (যিনি বাঙলার ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম প্রাণপুরুষ ছিলেন), কাজী নজরুল ইসলাম, হীরেন্দ্রনাথ মুখার্জি, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, খগেন্দ্রনাথ সেন ও ড. ধীরেন্দ্রনাথ সেন (সম্পাদক, এ্যাডভান্স)।

ঐ সভার ঘোষিত সভাপতি সাহিত্যিক নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত অনুপস্থিত থাকায় সভায় সভাপতিত্ব করেন সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার (সম্পাদক, আনন্দবাজার পত্রিকা)। এই শোকসভা থেকেই আনুষ্ঠানিকভাবে ড. নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তকে সভাপতি ও অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীকে সম্পাদক করে 'বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘ' গঠনের কথা ঘোষণা করা হয়।[৫৪]

এরপর ১৬ই আগস্ট (১৯৩৬) কলকাতার আশুতোষ কলেজে বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘের উদ্যোগে 'গোর্কি-দিবস' উদ্‌যাপিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ড. নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। উল্লেখ্য যে, এই উপলক্ষেই রবীন্দ্রনাথ গোর্কির স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানিয়ে একটি বাণী পাঠিয়েছিলেন। অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী সভায় তা পাঠ করেন। এছাড়াও গোর্কির মহান ভূমিকার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তাঁর ফ্যাসিস্ত-বিরোধিতার কথাও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। আশুতোষ কলেজ হলের এই সভায় উপস্থিত ছিলেন লেবার পার্টির নেতা নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, ট্রেড ইউনিয়ন ও কমিউনিস্ট নেতা বঙ্কিম মুখার্জি, হীরেন্দ্রনাথ মুখার্জি, কবি জসীমুদ্দিন প্রমুখ সমাজের সর্বস্তরের মানুষ।[৫৫]

সূচনাপর্ব থেকেই 'প্রগতি লেখক সংঘ' আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রোমঁ্যা রোলঁা-গ্যরদ্যা পরিচালিত 'ওয়ার্ল্ড' কংগ্রেস ফর দি ডিফেন্স অফ পীস' এবং 'লীগ এগেইনস্ট ফ্যাসিজম এ্যাণ্ড ওয়ার'-এর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছিল। জাতীয় ক্ষেত্রেও এই সংঘ রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রেমচন্দ, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, প্রমথ চৌধুরী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, নন্দলাল বসু, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, জওহরলাল নেহরু, সরোজিনী নাইডু প্রমুখ মনস্বীদের সমর্থন, সহযোগিতা ও আশীর্বাদ বারংবার প্রার্থনা করেছে এবং তার সুফলও লাভ করেছে।

তথাপি 'প্রগতি লেখক সংঘ' গঠিত হবার অব্যবহিত পরেই এর বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের তল্পিবাহকদের প্ররোচনায় শুরু হয় ব্যাপক কুৎসা প্রচার। এই কুৎসা প্রচারের প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে তৎকালীন 'দি স্টেটসম্যান' পত্রিকা এবং এর পশ্চাতে মূল পাণ্ডা রূপে ছিল ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগ। তৎকালীন স্বরাষ্ট্র সচিব এম. জি. হ্যালেট প্রচারিত 'সার্কুলার'টিই ছিল এই কুৎসা প্রচারের প্রধানতম উৎস। এই গোপন সার্কুলারটি প্রকাশের পূর্বেই অবশ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থবাহক 'দি স্টেটসম্যান' পত্রিকার সিমলাস্থিত বিশেষ প্রতিনিধি তার দু'কলমব্যাপী 'Communist Propaganda : Moscow Changes Tactics' শীর্ষক প্রতিবেদনে সদ্যগঠিত-'প্রগতি লেখক সংঘে'র বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার শুরু করে। তাদের প্রধান বক্তব্য ছিল : 'প্রগতি লেখক সংঘে'-র উদ্ভব একটি কমিউনিস্ট রণ-কৌশল ও ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয় এবং এর নেতৃত্ব দিচ্ছে কিছু তৎপর ও দক্ষ কমিউনিস্ট।[৫৬]

এই প্রসঙ্গে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র তৎকালীন প্রখ্যাত সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার-এর এক গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে পারি। 'স্টেটস্‌ম্যান-এর বিশেষ সংবাদদাতার এই হীন ও মিথ্যা অপপ্রচার এবং সেই সঙ্গে ব্রিটিশ দমননীতি ও সেন্সর বিভাগের চরম কাণ্ডজ্ঞানহীনতার তীব্র সমালোচনা করে পরদিনই তিনি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় তীব্র ভাষায় একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখে এর জবাব দেন। উক্ত সম্পাদকীয় প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত মজুমদার বলেন :

> "সম্প্রতি 'স্টেটসম্যান' পত্রিকা এবিষয়ে গভর্ণমেণ্টকে যথেষ্ট উস্কানি দিতেছেন। মায়ের চেয়ে যেমন মাসীর দরদ বেশী তেমনই 'স্টেটসম্যান' নিরন্তর সাম্যবাদ সম্পর্কে ভারতবাসীকে সজাগ করিয়া সরকারী দমননীতিকে উগ্রতর করিবার প্ররোচনা দিতেছেন। মস্কো-ফেরৎ কমিউনিস্টদের লাল আতঙ্ক বিস্তারের কোনো প্রমাণসিদ্ধ সন্ধান না-পাইলেও এই পত্রিকার 'বিশেষ-অজ্ঞ' সংবাদ-দাতাগণ প্রায়শই জুজুর ভয়ে আঁৎকাইয়া উঠিতেছেন। গত ৭ই জুলাই তারিখে কাগজে তাঁহারা পুনরায় 'কমিউনিস্ট প্রোপাগ্যাণ্ডা' শীর্ষক দীর্ঘ দুই কলমব্যাপী সংবাদ রচনা করিয়া এই দেশের অজ্ঞ জনসাধারণকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, 'Progressive Writers' Association' নামে গত বৎসর ইংলণ্ডে ভারতীয় ও ব্রিটিশ লেখকদের যে সমিতি গঠিত হইয়াছিল এবং বিগত লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে

যাঁহাদের ভারতীয় শাখার প্রথম বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল, তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ভারতবর্ষকে রসাতলে লইয়া যাওয়া।…'কুকুরকে বদনাম দিয়া ফাঁসিতে' লটকাইবার মতো ইহা এক হীন চক্রান্ত মাত্র। দেড়শত বৎসরের ইংরাজ-শাসনে যে দেশ ও জাতি মনুষ্যত্বের মৌলিক অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছে,…তাহাদের পক্ষে নিশ্চয়ই এমন কোনো সাহিত্যের প্রয়োজন নাই, যে সাহিত্য তাহাদিগকে জীবনের বাস্তবতা হইতে দূরে রাখিয়া দাসত্বের সুখ-নিদ্রায় ঘুম পাড়াইয়া রাখিবে। প্রকৃতপক্ষে যাহাতে আমরা সাহিত্যের বিলাসিতা লইয়া মুগ্ধ থাকি এবং জাতীয় দৈন্য, অপমান ও বুভুক্ষার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করিয়া প্রচলিত রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক শোষণকেই একমাত্র বরণীয় বলিয়া গ্রহণ করি, এই দেশের ধনিক রাষ্ট্র ও সমাজকর্তাগণের ইহাই হইতেছে সর্বপ্রধান লক্ষ্য।"[৩৭]

সরকারী ও বেসরকারী কুৎসা প্রচার সত্ত্বেও লক্ষ্ণৌতে নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সম্মেলনের অল্পকাল পরেই কলকাতা, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, আলিগড়, দিল্লী, লাহোর, বোম্বাই, পুনা, দেরাদুন, ওয়াল্টেয়ার প্রভৃতি দেশের প্রধান প্রধান শহরে প্রগতি লেখক সংঘের সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয়। যাহোক, 'স্টেটসম্যান'-এ ঐ সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার দিন তিনেক পরেই এলাহাবাদ থেকে নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের সাধারণ সম্পাদক সজ্জাদ জহীর এর তীব্র প্রতিবাদ ও সমালোচনা করে এক প্রেস-বিবৃতি দেন। তার মর্মার্থ ছিল নিম্নরূপ :

"…ভারতবর্ষে আন্তর্জাতিক প্রগতি লেখক সংঘের দ্রুত বিস্তৃতি দেখিয়া (ছয় মাসের মধ্যে সংঘের এগারোটি শাখা স্থাপিত হইয়াছে) ভারত গভর্ণমেণ্ট যে আমাদের ক্রিয়াকলাপের পশ্চাতে মস্কোর অদৃশ্য হস্ত আবিষ্কারের চেষ্টা করিবেন তাহা বিস্ময়ের বিষয় নহে।…আপাতত হেতু দাঁড়াইয়াছে সোশ্যালিজম্ ও কমিউনিজম্।

"গত এপ্রিল মাসে লক্ষ্ণৌতে নিঃ ভাঃ প্রগতি লেখক সঙ্ঘের প্রথম অধিবেশনে গৃহীত সংঘের ইস্তাহারেই ইহার উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে।… প্রগতি লেখক সংঘ কোনো গুপ্ত প্রতিষ্ঠান নহে; সুতরাং যে কেহ ইচ্ছা করিলে নিজেই প্রমাণ করিতে পারিবেন যে, 'স্টেটসম্যান'-এর প্রবন্ধে আমাদের সম্পর্কে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই ডাহা মিথ্যা। আমাদের সংঘের অধিকাংশ সদস্যই বিশিষ্ট ভারতীয় লেখক;…আমাদের ইস্তাহারে বর্ণিত উদ্দেশ্য যাঁহারা সমর্থন করেন, তাঁহারাই আমাদের সঙ্ঘের সদস্য হইতে পারেন। প্রগতিবাদী সমস্ত ভারতীয় মনীষীদিগকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া সংস্কৃতিকে প্রতিক্রিয়া হইতে রক্ষা করাই আমাদের উদ্দেশ্য।…

"স্টেটসম্যান ও তার গভর্ণমেণ্ট এই ব্যাপারে যতটুকু বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আমি তাহা অপেক্ষা বেশী বুদ্ধি আশা করি না; কিন্তু ভারতের শিক্ষিত সমাজ প্রগতি লেখক সংঘের উদ্দেশ্য প্রণিধান করিয়া

সংঘেক সমর্থন করিবেন, তাহা আমি নিশ্চয়ই প্রত্যাশা করি।"[৫৮]

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই যে, 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকা পুরোপুরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থরক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান রূপেই কাজ করেছিল। 'স্টেটস্‌ম্যান'-এ প্রকাশিত প্রতিবেদনটির সঙ্গে সরকারী 'হ্যালেট সার্কুলার'-এর সাদৃশ্য দেখে মনে হয় সরকারীভাবেই রিপোর্টটি প্রকাশ করার জন্য সংবাদপত্রটিকে দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য একটাই, 'প্রগতি লেখক সংঘে'র বিরুদ্ধে প্রচার সংগঠিত করা। আলোচ্য সরকারী সার্কুলারটি ছিল নিম্নরূপ :

HALLET CIRCULAR

File No. 7/9/36—Home/Political 1936

Sub : Warning conveyed to Local Governments regarding the Indian Progiessive Writers' Association.

From : The Secretary to the Govt. of India, Home Dept,

To : The All Local Governments.

"..... The Association has already attracted interest and some support from persons of an intellectual type who are unlikely to have any sympathy with communism or other revolutionary theories. The Association is, however, a typical example of the method, now being persued by communist in all countries—in accordance with the current policy of the Communist International.

"This method is for a few convinced and trained communists to establish contacts with all sorts of organisations and societies having interest in intellectual, cultural and social subjects with the object of spreading Communistic ideas and gaining converts."[৫৯]

এর থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, 'প্রগতি লেখক সংঘ'-র প্রতিষ্ঠা ও কার্যসূচী ব্রিটিশ সাম্রাজাবাদকে কতখানি বিব্রত ও আতঙ্কিত করে তুলেছিল। মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিকগণ প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতেন একথা সত্যি, কিন্তু কখনোই ঐ সংগঠনটি কোনো সঙ্কীর্ণ দলীয় স্বার্থে পরিচালিত হয়নি। বরঞ্চ, বাঙলাদেশের বিভিন্ন মতের ও পথের বুদ্ধিজীবীদের একই মঞ্চে সমবেত করার চেষ্টাই ঐ সংগঠনটির মধ্যে আমরা সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করেছি।

'প্রগতি লেখক সংঘে'র সূচনাপর্বে অর্থাৎ ১৯৩৭ সালেই সংঘের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয় দুটি উল্লেখযোগ্য সংকলনগ্রন্থ। এর একটি **'Towards Progressive Literature'** (ইংরাজী) এবং অপরটি সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও হীরেন্দ্রনাথ মুখার্জি সম্পাদিত 'প্রগতি' সংকলন (বাংলা)।

'প্রগতি' সংকলনে প্রথম থেকেই বিভিন্ন মতামতের লেখককে সংগঠিত করার প্রচেষ্টা হয়। 'প্রগতি'র মুখবন্ধেই বলা হয় যে, মোটের উপর যাঁরা বিশ্বাস করেন —'সামাজিক চৈতন্য সাহিত্য সৃষ্টির পরিপন্থী' নয় এবং রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে পরস্পর মতভেদ থাকা সত্ত্বেও যাঁরা 'ফ্যাসিজমের বিরোধী', প্রগতি লেখক সংঘে এবং 'প্রগতি' সংকলনে তাঁদের সকলের সাদর আমন্ত্রণ।

'প্রগতি' সংকলনের লেখকদের নামের তালিকায় দৃষ্টিপাত করলেই বোঝা যাবে যে সাহিত্যক্ষেত্রে ঐক্য গড়ার একটা আন্তরিক প্রচেষ্টা সেইসময় শুরু হয়েছিল। এই সংকলনের মুখবন্ধে সম্পাদকদ্বয় লিখেছেন :

> "যাঁদের লেখা এতে আছে তাঁরা প্রায় সকলেই সংঘের সদস্য ; কয়েকজন সভ্য না হলেও সংঘের উদ্দেশ্যের সঙ্গে একমত। আমরা শুধু বলতে পারি যে যাঁরা এতে লিখেছেন তাঁরা বিশ্বাস করেন না যে, সামাজিক চৈতন্য সাহিত্য সৃষ্টির পরিপন্থী, তাঁরা মনে করেন যে কোনো লেখকই সমাজ-সমস্যা সম্পর্কে নির্বিকার থাকতে পারেন না। রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে তাঁদের পরস্পর মতভেদ আছে বটে, কিন্তু তাঁরা সকলেই ফ্যাসিজমের বিরোধী—ফ্যাসিজম্ সংস্কৃতিকে ধ্বংস করছে, প্রগতির পথ রুদ্ধ করছে, গণশক্তিকে খর্ব করছে বলে।"৬০

এই 'প্রগতি' সংকলনটিতে স্থান পেয়েছিল ধূর্জটিপ্রসাদ মুখার্জি, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, হীরেন্দ্রনাথ মুখার্জি, ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, বিজয়লাল চ্যাটার্জি, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নীরেন্দ্রনাথ রায়, বিষ্ণু দে, অরুণ মিত্র, সজনীকান্ত দাস, সমর সেন, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্যাল, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক ভট্টাচার্য প্রমুখের গল্প কবিতা ও প্রবন্ধ। এছাড়াও ম্যাক্সিম গোর্কি, র‍্যালফ ফক্স, আঁদ্রে জিঁদ, ই. এম. ফর্স্টার, কার্ল মার্কস প্রমুখের রচনাও অনূদিত হয়েছিল।

যদিও 'প্রগতি' সংকলনটিতে সজনীকান্ত দাস-এর রচনা প্রকাশিত হয়েছিল, তথাপি ১৯৩৮ সালের পর থেকে 'শনিবারের চিঠি'-র সম্পাদক রূপে তিনি 'প্রগতি লেখক সংঘে'-র তীব্র বিরোধিতা করে বলেন, 'দল বেঁধে সাহিত্যচর্চা হয় না।' অথচ পরবর্তীকালে 'কংগ্রেস সাহিত্য সংঘে'-র প্রতিষ্ঠা (১৯৪৪) সজনীকান্ত-র উদ্যোগেই ঘটেছিল। 'প্রগতি লেখক সংঘে'-র বিরোধী ছিলেন বনফুল বা বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ও।

সজনীকান্ত দাসের কথারই প্রতিধ্বনি শোনা গিয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও সাহিত্য-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারের কণ্ঠেও। 'প্রগতি' সংকলনগ্রন্থ মোহিতলালের মতো প্রাজ্ঞ অথচ রক্ষণশীল মানুষকেও ক্ষিপ্ত করে তোলে। এছাড়া প্রগতি লেখক সংঘের আন্দোলন ঢাকার তরুণ মনে যে-সাড়া তুলেছিল তাঁর রক্ষণশীল মন তাও গ্রহণ করতে পারেনি। আমরা জানি, তৎকালীন সাংস্কৃতিক কর্মী রণেশ দাশগুপ্ত, নৃপেন্দ্র গোস্বামী, সত্যেন সেন, অচ্যুত গোস্বামী, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত এবং প্রায়-কিশোর সোমেন চন্দ-র প্রচেষ্টাতে

ঢাকায় স্থাপিত হয়েছিল। 'প্রগতি লেখক সংঘে'-র শাখা। মনে হয়, মোহিতলালের প্রতিক্রিয়াটি তাঁদের কর্মকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতেই ঘটেছিল।[৬১]

'গোষ্ঠীবদ্ধ সাহিত্য-আন্দোলন'কে প্রমথ চৌধুরী এবং শরৎচন্দ্র তেমন পছন্দ না করলেও তাঁরা অন্তত সজনীকান্ত ও মোহিতলালের মতো প্রত্যক্ষ বিরোধিতায় অবতীর্ণ হননি। বরঞ্চ দেখা যায়, পরবর্তীকালে শরৎচন্দ্রের মনোভাবও পরিবর্তিত হয়েছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো কথাসাহিত্যিকও অন্তত বেশ কিছু-কালের জন্যে 'প্রগতি লেখক সংঘে'র নেতৃত্বে ছিলেন। তবে এটা ঐতিহাসিক সত্য যে, সংখ্যায় অল্প হলেও বাঙলার একশ্রেণীর নামী সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী 'প্রগতি লেখক সংঘে'র গঠন ও তার অনুসৃত কার্যাবলীকে খুব একটা পছন্দ করতেন না, বরং তাঁদের কেউ কেউ এর তীব্র বিরুদ্ধাচরণও করেছেন। এই বিরোধিতার কারণরূপে চিহ্নিত করা যেতে পারে ওই সব প্রথিতযশা লেখকদের 'কমিউনিজম'-বিরোধী মনোভাব। প্রগতি সাহিত্য-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সুধী প্রধান[৬২] এবং ধনঞ্জয় দাশ[৬৩] প্রমুখ গবেষকগণ এটাই মনে করেন। বিশেষ করে 'প্রগতি লেখক সংঘে'র বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের তল্পিবাহকেরা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচার চালিয়ে এবং সংঘের সংগঠকদের কমিউনিস্ট আখ্যা দিয়ে কিছু লেখকের মনে সাময়িক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতেও সক্ষম হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সুধী প্রধান। 'প্রগতি' সংকলনের শেষে 'বিশ্বশান্তি কংগ্রেসে ভারতীয় মনীষীদের বাণী' নামে যে ইস্তাহারটি ব্রাসেলসে 'বিশ্বশান্তি কংগ্রেস' ও 'প্যারিস সংস্কৃতি রক্ষা সম্মেলনে' প্রেরিত হয়েছিল তা মুদ্রিত হয়। এতে স্বাক্ষর করেছিলেন—রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রেমচন্দ, প্রমথ চৌধুরী, নন্দলাল, রামানন্দ, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, জওহরলাল নেহরু প্রমুখ। এই ইস্তাহারের শেষের অনুচ্ছেদে বলা হয়:

> …"আমরা যুদ্ধকে ঘৃণা করি এবং যুদ্ধ পরিহার করিতে চাই, যুদ্ধে আমাদের কোনো স্বার্থ নাই। কোনো সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে ভারতবর্ষের যোগদানে আমরা ঘোর বিরোধী, কারণ আমরা জানি যে আগামী যুদ্ধে সভ্যতা ধ্বংস হইবে। **সোভিয়েত ইউনিয়নই হউক বা নাৎসী জার্মানীই হউক যেখানেই সংস্কৃতি বিপন্ন হইবে,** সেখানে উহার রক্ষার জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব এবং আমাদের মহৎ উত্তরাধিকার রক্ষার জন্য আমরা যথাশক্তি সংগ্রাম করিব।"[৬৪] [বড় হরফ আমার]

সুধী প্রধান যথার্থভাবেই প্রশ্ন করেছেন, বাঙালি প্রগতি লেখকদের উদ্যোগে রচিত এই বিবৃতিতে কিভাবে "সোভিয়েত ইউনিয়নই হউক বা নাৎসী জার্মানীই হউক যেখানেই সংস্কৃতি বিপন্ন হইবে"—কথাগুলি উত্থাপিত হলো? সাম্যবাদী সোভিয়েত ইউনিয়ন ও নাৎসী জার্মানীকে একই পংক্তিতে বসানো হলো কেন? বাস্তবিক পক্ষেই ঐ বিবৃতির অন্তর্ভুক্ত শেষ কয়েকটি লাইন দেখলে মনে হয় যে স্বাক্ষরকারীদের কারো কারো দাবীতেই একাজ হয়েছে। স্পষ্টতই এর থেকে

বোঝা যাচ্ছে, তৎকালীন মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীরা এ-প্রসঙ্গে অত্যন্ত নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন ফ্যাসিবাদ-বিরোধী ব্যাপক মঞ্চ গড়ার জন্য।[৬৫]

যাহোক, যদিচ 'প্রগতি' সংকলনের ঐ লেখকেরা কোনো না কোনোভাবে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং হীরেন মুখার্জি প্রমুখ নেতৃবৃন্দ কমিউনিস্টদের পক্ষ থেকেই ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলনে তাঁদের সামিল করার চেষ্টা করেছিলেন, তথাপি সুধী প্রধানের নীচের মন্তব্যকে নিশ্চয়ই অস্বীকার করা যাবে না:

> " 'প্রগতি' সংকলনের মুখবন্ধে হীরেনবাবুরা বলেছেন যে উক্ত সংকলনে যাঁরা লিখেছেন তাঁরা সকলেই ফ্যাসিজম্ বিরোধী। কিন্তু এই সংকলনে ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে কোনো বিশেষ প্রবন্ধ নেই। এই সংকলনের সাধারণ চরিত্র কেবল ফ্যাসিবিরোধী, যুদ্ধবিরোধী বা শান্তির পক্ষে নয়। এই সংকলনের উদ্দেশ্য ছিল প্রগতি সাহিত্যের সংকলন হিসাবে কাজ করা।"[৬৬]

৪. কলকাতায় প্রগতি লেখক সংঘের দ্বিতীয় সম্মেলন (১৯৩৮):

১৯৩৬ থেকে ১৯৩৮ সালের মধ্যেই বাঙলায় বামপন্থী ও প্রগতিশীল লেখক ও বুদ্ধিজীবীরা উল্লেখযোগ্যভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। মাত্র দু'বছরের মধ্যেই বিভিন্ন জেলা-শহরগুলিতে প্রগতি লেখক সংঘের অনেকগুলি শাখা সংগঠন গঠিত হয়। প্রধানত সাহিত্যের উদ্দেশ্য, গতি-প্রকৃতি, বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক নিয়ে আলোচনা এবং তর্ক-বিতর্ক ছাড়াও[৬৭] এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত লেখক ও বুদ্ধিজীবীরা সংগঠিতভাবে ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেও তাঁদের সংগ্রাম অব্যাহত রাখেন। কমিউনিস্ট পার্টি নির্দেশিত 'যুক্তফ্রন্ট', 'জাতীয়ফ্রন্ট' তথা সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদ-বিরোধী ব্যাপক মঞ্চ গঠনের আহ্বানের পরিপ্রেক্ষিতেই বাঙলায় মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীগণ (যার মধ্যে অগ্রণী ছিলেন অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার এবং অধ্যাপক সুশোভন সরকারের মতো ব্যক্তিত্ব) বিভিন্ন মত ও পথের লেখক, সংস্কৃতিকর্মী ও বুদ্ধিজীবীদের এক মঞ্চে সমবেত করার প্রচেষ্টাই চালিয়ে যান।

ইতিমধ্যেই বাঙলাদেশের রাজনৈতিক জগতে বামপন্থী চেতনার বিকাশ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হতে থাকে। কমিউনিস্ট পার্টি তার 'ন্যাশনাল ফ্রন্টের' তত্ত্বানুযায়ী, বেআইনী থাকা সত্ত্বেও, কংগ্রেস-সোস্যালিস্ট পার্টি ও জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে কাজ শুরু করে দেয়। শ্রমিক-কৃষক আর ছাত্র ফ্রন্টকেও সংগঠিত করার জন্য প্রবল উদ্যোগও তারা গ্রহণ করে। ১৯৩৮ সালে হরিপুরা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র জাতীয় কংগ্রেস-এর সভাপতি পদে নির্বাচিত হলে বাঙলাদেশে কংগ্রেসী মহলে কমিউনিস্টরা আরো তৎপর হয়ে ওঠেন। কমিউনিস্ট নেতা বঙ্কিম মুখার্জি, পাঁচুগোপাল ভাদুড়ি, আবদুল হালিম, সোমনাথ লাহিড়ী প্রমুখ অনেকেই সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সহযোগীরূপে কংগ্রেসকে বামমুখী করার কাজে সে সময় সত্যিই অত্যন্ত তৎপরতার

সঙ্গে এক কঠিন দায়িত্ব পালন করেন। অপরদিকে, বিশ্বনাথ মুখার্জির নেতৃত্বে ছাত্র-ফেডারেশন হয়ে ওঠে তৎকালীন বে-আইনী কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচী প্রচারের প্রধান প্রবক্তা।

এই পরিস্থিতিতেই ১৯৩৮ সালের ২৪শে ও ২৫শে ডিসেম্বর কলকাতার আশুতোষ কলেজ হলে অনুষ্ঠিত হয় 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘে'র দ্বিতীয় সম্মেলন। সম্মেলনের মূল সংগঠক ছিলেন অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, হীরেন্দ্রনাথ মুখার্জি সহ তাঁদের সহযাত্রীরা। সারা ভারত থেকেই এই সম্মেলনে যোগ দিতে এসেছিলেন মার্কসবাদী, অমার্কসবাদী বহু খ্যাতিমান সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী। সম্মেলন পরিচালনার জন্য যে-সভাপতিমণ্ডলী গঠিত হয় তার মধ্যে ছিলেন মুলকরাজ আনন্দ, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু ও পণ্ডিত সুদর্শন। অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ছিলেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। এছাড়া যে সকল উল্লেখ যোগ্য বাঙালী সাহিত্যিক এই সম্মেলনের বিভিন্ন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন তাঁদের অন্যতম ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রবোধকুমার সান্যাল, হিরণকুমার সান্যাল, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রমুখ।[৬৮]

রবীন্দ্রনাথ এই সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে একটি বাণী প্রেরণ করেন। আশ্চর্যের ব্যাপার যে, সেই বাণীতে কবি শিল্প-সাহিত্য সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে আলোচনা না করে তুলে ধরেন এশিয়ার নবজাগরণ, বিশেষত মুস্তাফা কামাল পাশার নেতৃত্বে নতুন তুর্কির অগ্রগতির কথা। এই ঘটনাটি ছিল অত্যন্ত তাৎপর্য-পূর্ণ। হয়তো রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের সংজ্ঞা, প্রকৃতি, আঙ্গিকগত প্রশ্ন ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে (অর্থাৎ, সাহিত্যে আবার প্রগতি বা প্রতিক্রিয়া কি ?) সম্মেলনের সংগঠক-দের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করতেন এবং সেই কারণেই কোনো বিতর্ক তুলে অপ্রস্তুত অবস্থা সৃষ্টি করতে চাননি। অথবা, এটাও বলা যেতে পারে, সেই সময়কার পরিস্থিতি রবীন্দ্রনাথকে পর্যন্ত কতখানি আন্তর্জাতিক রাজনীতি-সচেতন করে তুলেছিল, উক্ত বাণীটি ছিল তারই উজ্জ্বল এক দৃষ্টান্ত।

যাহোক, সামগ্রিক দৃষ্টিতে বিচার করলে দেখা যাবে যে, 'প্রগতি লেখক সংঘে'র এই দ্বিতীয় সম্মেলন ছিল ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগঠিত একটি প্রচার মঞ্চ। এই সম্মেলনে সমাগত প্রতিনিধি ও অতিথিবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ড. নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত তাঁর ভাষণে ফ্যাসিবাদকে তীব্র আক্রমণ করে বলেন :

> "সমগ্র বিশ্ব আজ দাঁতে দাঁত চেপে অস্ত্রে সজ্জিত হচ্ছে। বিপদকে রুখে দেবার এর চেয়ে ভালো কোন উপায় তাদের জানা নেই। কিন্তু শুধু অস্ত্রশস্ত্রই সমস্ত মানবিক গুণগুলিকে চিরকাল রক্ষা করতে পারবে না ; বরং পৃথিবীর সমস্ত নৈতিক শক্তিকে সুসংহত করাই হবে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কাজ।
>
> "বিশ্ব ফ্যাসিবাদের যুদ্ধাস্ত্র ভয়ানক। কিন্তু ফ্যাসিবাদের যে মতাদর্শ সমস্ত নৈতিকতাকে এবং ন্যায়বিচারকে বিদ্রূপ করে এবং শুধুমাত্র শক্তিদম্ভের জয়-

গান করে তাকে প্রতিহত করা আরও কঠিন। এর কারণ এই মতাদর্শ নিরন্তর অপরাধ সংগঠন ও নৈতিক অধঃপতনের প্রতিরূপ মাত্র। ফ্যাসিস্ট শক্তির প্রতিটি সাফল্যের অর্থ নৈতিকতার অধঃপতন। এই ক্রমবর্ধমান অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিরোধও তখন দুর্বলতর হয়ে পড়ে।······

"অস্ত্রের সাফল্য নৈতিক বিজয়ের সম্মানলাভ করলে তা অধিকতর ক্ষতিকর। কারণ, এর ফলশ্রুতিতে বিজিতের মনে অক্ষমতাবোধ ও স্বেচ্ছায় নতিস্বীকারের মানসিকতা জন্মে। ফ্যাসিবাদ যদি বিশ্বব্যাপী প্রাধান্য বিস্তার করে তবে তা হবে ভয়ঙ্কর; মানুষের নৈতিক মেরুদণ্ড চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে। মনুষ্যত্ববোধ প্রগতি ও প্রকৃত সভ্যতার পথ থেকে দীর্ঘদিনের জন্য বিপথগামী হবে। কেবলমাত্র মানসিক শক্তিতে বলীয়ান হয়েই এই অনিবার্য পরিণতির গতিপথ থেকে মানবতাকে উদ্ধার করা যেতে পারে। এটাই হবে পৃথিবীর প্রগতিধর্মী লেখকদের বিশেষ আহ্বান।"[৬৯]

'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘে'র দ্বিতীয় সম্মেলন (১৯৩৮) যেসব সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয় তার মধ্যে অন্যতম সিদ্ধান্তটি ছিল ফ্যাসিবাদ-বিরোধী প্রস্তাব। এই প্রস্তাবে বলা হয়:

"এই সম্মেলন পৃথিবীর সেই সব লেখক ও শিল্পী—যাঁরা প্রতিক্রিয়া, ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন—তাঁদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করছে এবং একই কারণে বিশেষ করে জার্মানী, স্পেন ও চীনদেশের যেসব ব্যক্তি বা সংগঠন দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছেন—তাঁদের অভিনন্দন জানাচ্ছে। সাহিত্য ও শিল্পকলা সমগ্র মানবজাতিরই ঐতিহ্য এবং বর্ণগত, জাতিগত বা ভৌগোলিক সীমার মধ্যে বিভাজ্য নয়—সম্মেলন এই অভিমতই পোষণ করে। এই সম্মেলন ঘোষণা করছে যে ভারতবর্ষের প্রগতিশীল লেখকরা সেইসব মানুষের পাশে দাঁড়াবে যাঁরা সাম্য, স্বাধীনতা ও শান্তির বনিয়াদে প্রতিষ্ঠিত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে সমস্তরকম প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে এবং তারাও সংস্কৃতিবিরোধী ফ্যাসিবাদী ও সমরবাদী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করবে। ভারতীয় লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের এই সম্মেলন আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠা ও জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার প্রয়াসে সংগ্রামশীল মানুষদের সাহায্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে।"[৭০]

প্রস্তাবটি স্পষ্টতই বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, ১৯৩৮ সালে অনুষ্ঠিত প্রগতি লেখক সংঘের এই দ্বিতীয় সম্মেলনটি ছিল ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনের একটি সুদৃঢ় ও বলিষ্ঠ মঞ্চ। শুধুমাত্র সাহিত্য বা সংস্কৃতির বিচারই এই সম্মেলনে মুখ্যস্থান লাভ করেনি, ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলন ও সংগ্রাম সম্পর্কেও এই সম্মেলন যথেষ্ট চিন্তাচেতনার পরিচয় দেয়। অন্য কোনো প্রদেশে উক্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলে ফ্যাসিস্ত-বিরোধিতার প্রসঙ্গটি এত প্রত্যক্ষভাবে হয়তো আসতে পারত না।

সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে উত্থাপিত হয়েছিল 'সংস্কৃতির সংকট' শীর্ষক

আলোচনা। আলোচনার সূত্রপাত করেন অধ্যাপক হীরেন মুখোপাধ্যায়। তিনি তাঁর বক্তব্যে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে, 'সংস্কৃতি ফ্যাসিবাদ দ্বারা আক্রান্ত'। তিনি নাৎসী-নাট্যকার জোলস্টের বক্তব্য উদ্ধৃত করে তীব্র সমালোচনা করেন। জোলস্টের বক্তব্য ছিল, 'যখনই সংস্কৃতি শব্দটা আমার কানে আসে তখনই আমি রিভলবারে গুলি ভরি।' হীরেনবাবু 'শিল্পকলাকে সংগ্রামের শাণিত হাতিয়ারে' পরিণত করার আহ্বান জানান।[৭১]

'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘে'র দ্বিতীয় সম্মেলন সমাপ্ত হবার কয়েক মাস পরেই স্বাক্ষরিত হয় 'নাৎসী-সোভিয়েত অনাক্রমণ চুক্তি' (আগস্ট, ১৯৩৯)। কোন্ পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নকে এই কূটনৈতিক চুক্তি স্বাক্ষর করতে হয়েছিল এবং তার জন্য ইঙ্গ-ফরাসী পশ্চিমী শক্তিজোটের অপরিণামদর্শিতা যে কতখানি দায়ী, তা আজ সকলেরই জানা। কিন্তু সাময়িকভাবে হলেও এই চুক্তি নিঃসন্দেহে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত মার্কসবাদী ও কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবীদের এক কঠিন দ্বন্দ্বের মধ্যে ঠেলে দেয়। ত্রিপুরী কংগ্রেসে সভাপতি নির্বাচিত হবার পরেও গান্ধীজীসহ কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতাদের অসহযোগিতা ও চাপে সুভাষ-চন্দ্র কংগ্রেস ছেড়ে ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করেন। এর ফলে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বামপন্থী ভারসাম্য নিদারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এইসময় কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের ব্রিটিশ সরকার ব্যাপকভাবে গ্রেপ্তার করতে শুরু করে। ফলে, অনেকেই আত্মগোপন করতে বাধ্য হন। ইতিমধ্যে ১লা সেপ্টেম্বর (১৯৩৯) শুরু হয়ে যায় হিটলারের পোল্যাণ্ড আক্রমণের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

এই সব কিছুর মিশ্র প্রতিক্রিয়ায় সেই সময় 'প্রগতি লেখক সংঘের কার্যকলাপ বা ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলন সাময়িকভাবে শ্লথগতি হয়ে পড়ে। ক্রমশই প্রগতি লেখক সংঘের সক্রিয়তা কমে যায়। জেলা শাখার সঙ্গে প্রাদেশিক কমিটির এবং ঐ কমিটির সঙ্গে কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক যোগাযোগ ক্ষীণ হয়ে আসে। এমন কি সংঘের তরফ থেকে প্রকাশ্য বা কমিটিগত আলোচনার ব্যবস্থাদিও শিথিল হয়ে পড়ে অনেকখানি, এবং শেষে একেবারেই থমকে যায়।[৭২] কিন্তু প্রগতি লেখক সংঘ কার্যত নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়লেও (যদিও বিভিন্ন প্রগতিশীল সাহিত্যিকগোষ্ঠী কর্তৃক প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার প্রকাশ কয়েকটি ক্ষেত্রে অব্যাহত থাকে), সেই সময় মুষ্টিমেয় কিছু বাঙালী বুদ্ধিজীবী এবং তরুণ ছাত্রকর্মীদের সচেতন অংশ ফ্যাসিস্ত-বিরোধী প্রচার আন্দোলন অব্যাহত রাখেন। এঁদের অনেকেই ছিলেন বে-আইনী কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত। ছাত্রকর্মীদের এমনই একটি সংগঠন ছিল ওয়াই. সি. আই।

৫. ইয়ুথ কালচারাল ইনস্টিট্যুট (১৯৪০-৪২):

১৯৩৯-এর শেষাশেষি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল প্রতিভাবান, মেধাবী এবং সমাজমনস্ক ও রাজনীতি-সচেতন ছাত্রছাত্রী জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সমস্যাবলী সম্পর্কে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সৃজনধর্মী এবং গঠনমূলক কোনো কিছু করার

জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন। উন্নত চিন্তা-চেতনার অধিকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ছাত্রছাত্রীরা বাঙলাদেশে ফ্যাসিবাদ-বিরোধী চেতনা সম্প্রসারণে নিঃসন্দেহে ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সব থেকে উল্লেখ্য ভূমিকা পালনে সমর্থ হন। বস্তুত 'প্রগতি লেখক সংঘে'র প্রায়-স্থগিত কর্মসূচীকে এই ছাত্রছাত্রীরাই এক নতুন রূপে বাস্তবায়িত করতে সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। সুধী প্রধান এ-প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন :

"১৯৩৮ সালের ডিসেম্বরে কলকাতায় 'প্রগতি লেখক সংঘে'র সর্বভারতীয় দ্বিতীয় সম্মেলন ঘটে যাওয়ার পর আমরা দেখতে পাই যে, ছাত্ররা কলকাতার আশেপাশের জেলায় পথনাটিকা ও গান করে বেড়াচ্ছেন। বাঙলার অনেকগুলি জেলায় প্রগতি সাহিত্যাদর্শের ভিত্তিতে প্রকাশিত হতে থাকে সাময়িক পত্রপত্রিকা এবং সৃষ্টি হয় গান ও অভিনয়ের দল।"[৭৩] তবে নিঃসন্দেহে বলা যায়, এসব উদ্যোগ ছিল খুবই অসংগঠিত ও স্থানীয় ভিত্তিক। প্রকৃতপক্ষে, ওয়াই. সি. আই, অর্থাৎ ইয়ুথ কালচারাল ইনিস্টিটিউট নামক সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর (১৯৪০-এর মাঝামাঝি কোনো এক তারিখে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়, সঠিক দিনটি কোনোভাবেই জানা যায় নি) থেকেই বাঙলার ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী মহলে (বিশেষ করে তরুণ ও যুবসমাজের মধ্যে) নতুন এক সাংস্কৃতিক চেতনার উন্মেষ দেখা যায়, যার মূল প্রোথিত ছিল সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদ-বিরোধিতার মধ্যে। এই কারণে ওয়াই. সি. আইকে অনেকেই পরবর্তীকালের 'ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' এবং 'গণনাট্য সংঘে'র 'সূতিকাগার' রূপে চিহ্নিত করেছেন।[৭৪]

যাহোক, কমিউনিস্ট-প্রভাবিত 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন' (বি. পি. এস. এফ)-এর নেতৃত্ব প্রথম থেকেই ওয়াই.সি. আই-এর আন্দোলনকে পরিচালিত করার চেষ্টা করেন। জ্যোতি বসু, নিখিল চক্রবর্তী, চিন্মোহন সেহানবীশ, জলিমোহন কাউল, সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল সেন, হরকুমার চতুর্বেদী, সুনীলকান্তি সেনগুপ্ত, রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অম্বিকা ঘোষ, নেভিল ক্যাম্বেল, সমর গুপ্ত, দেবব্রত বসু, দিলীপ রায়, উমা চক্রবর্তী, সুজাতা মুখোপাধ্যায়, রমা গোস্বামী, কমল বসু, মোহিত বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্রা মজুমদার প্রমুখ আরো অনেকের নেতৃত্বে ও কর্মোদ্যোগে সংগঠনটি দ্রুত বিকশিত হয়ে উঠতে থাকে। তবে ওয়াই. সি. আই-এর নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা নিয়ে মতান্তর ও একটা ঠাণ্ডা লড়াইয়ের মনোভাব সম্ভবত ছাত্রফেডারেশন এবং ইনস্টিট্যুট-এর নেতৃত্বের মধ্যে বিরাজিত ছিল; এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে পরবর্তীকালে।[৭৫]

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগেশ্বরী অধ্যাপক শাহেদ সুহ্রাবর্দি ছিলেন এই সংগঠনের সভাপতি। সহঃ সভাপতি হন কলকাতার প্রাক্তন মেয়র এ. কে. এম. জ্যাকেরিয়া এবং অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায়। সম্পাদক নির্বাচিত হন বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতীছাত্র জলিমোহন কাউল নামক কলকাতাবাসী এক কাশ্মীরী যুবক (ইনি পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট পার্টির কলকাতা জেলাকমিটির সম্পাদকও হন)।[৭৬]

পি-৩৩, মিশন রো-তে কেণ্ট হাউসের একটি ঘর ভাড়া নিয়ে ওয়াই.সি.আই-এর কাজকর্ম শুরু হয়ে যায়। বিতর্ক, আলোচনা, সেমিনার, নাট্যাভিনয় ও গণসঙ্গীতচর্চাই ছিল এই সময়ে সংগঠনটির কর্মসূচীর প্রধান অঙ্গ। এসবের মধ্য দিয়েই সংগঠনের সদস্যেরা ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রচার চালাতেন এবং জনমত সংগঠিত করার চেষ্টা করতেন। দেবব্রত বিশ্বাস, দিলীপ রায়, সাধনা বোস (রায়), নিবেদিতা বোস (দাশ), বিনতা বোস (রায়), উমা চক্রবর্তী; নিখিল সেন, দ্বিজেন চৌধুরী প্রমুখ প্রতিভাসম্পন্ন ছাত্রছাত্রীরা ছিলেন এর সক্রিয় সদস্যও কর্মী।[৭৭]

এঁদের উদ্যোগেই সর্বপ্রথম বাঙলা তথা ভারতবর্ষে 'সংঘ সঙ্গীত' বা 'গণসঙ্গীত'-এর ধারার সূচনা ঘটে। এ-প্রসঙ্গে চিন্মোহন সেহানবীশ বলেছেন যে, 'কমিউনিটি সঙ্' বা 'গণসঙ্গীত'-এর পরিকল্পনা ওয়াই. সি. আই সংগঠকদের মাথায় এসেছিল চীনে প্রচারিত জাপ আগ্রাসনবাদ-বিরোধী গণসঙ্গীতের অনুকরণে। বিশেষ করে **Agnes Smedly** রচিত **'Battle hymn of China'** এবং **Epstain** রচিত **'Peoples' War'** গ্রন্থ দুটি থেকে তথ্য সংগ্রহ করেই 'গণসঙ্গীত' বা 'সমবেত সঙ্গীতের মাধ্যমে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবিরোধী প্রচারকে সংগঠিত করার চিন্তা করেছিল ওয়াই. সি. আই।[৭৮]

ওয়াই. সি. আই-র গায়কগোষ্ঠী দেবব্রত বিশ্বাস প্রমুখের নেতৃত্বে সেই সময় পরিবেশন করতেন রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলামের দেশাত্মবোধক সঙ্গীত এবং নানা ধরনের আর বিভিন্ন ভাষার দেশী-বিদেশী বিপ্লবী গণসঙ্গীত। বিখ্যাত দেশাত্মবোধক হিন্দী গান 'ঝাণ্ডা উঁচা রহে হামারা', 'আব কোমরবন্ধ্ তৈয়ার হো লাখ কোটি ভাইয়ো', 'হিন্দুস্তান হামারা হ্যায়'-এর সঙ্গে গীত হতো শ্রমিকশ্রেণীর ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ ফ্যাসিস্ত-বিরোধী সঙ্গীত 'মজদুর মজদুর-মজদুর হ্যায় হাম' (জলি কাউল রচিত ও নিখিল সেন সুরারোপিত)-এর মতো জনপ্রিয় গান। এরপর যখন হিটলার কর্তৃক সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হলো (২২শে জুন, ১৯৪১) তখন ইনস্টিট্যুটের সদস্যেরা গাইতেন 'সোভিয়েট ভূমি বিশ্বশ্রমিক প্রিয়', বা 'কমরেড লেনিনের আহ্বান, চলে মুক্তি সেনাদল'-এর মতো আন্তর্জাতিক সঙ্গীত। এই বিদেশী গানের অনুবাদ করেছিলেন তৎকালীন বিলেত-ফেরং কমিউনিস্ট কর্মী মোহিত বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সময় বিনয় রায়-এর নেতৃত্বে সংস্থার গানের দলটিও অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে ওঠে।

১৯৪১ সালের ফেব্রুয়ারিতে ওয়াই. সি. আই-এর সম্মেলনে প্রাধান্য পায় 'সংস্কৃতির সংকট' প্রসঙ্গটি। এই সময় একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো—'ফ্যাসিস্ত-বিরোধী পোস্টার এগজিবিশন্'। গোর্কি-রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে এলিয়ট, এজরা পাউণ্ড, আন্দ্রে জিঁদ, বার্নার্ড'শ প্রমুখ বিশ্বখ্যাত বুদ্ধিজীবী ও লেখকদের রচনার উদ্ধৃতি সেখানে স্থান পায়। সম্ভবত কলকাতায় এটিই ছিল সর্বপ্রথম 'কোটেশন্ এগ্জিবিশন' বা উদ্ধৃতিমূলক পোস্টার-প্রদর্শনী। অসংখ্য দর্শক, এমন কি স্কুল-

কলেজের ছাত্র ও শিক্ষকরাও এই প্রদর্শনী দেখতে আসেন। তবে 'দর্শকের খাতায়' বেশিরভাগেরই অভিযোগ ছিল—ওয়াই. সি. আই-এর প্রদর্শনীতে ভারতীয় সংস্কৃতির তেমন উপস্থিতি নেই এবং চরিত্রগতভাবে তা 'এলিটিস্ট' বা 'অভিজাত কেন্দ্রিক'।[৭৮] এ নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেও পরবর্তীকালে বিতর্ক হয়।

নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রেও ওয়াই. সি. আই-এর ভূমিকা ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সংগঠনের সূচনাপর্ব থেকেই তারা স্থির করেন যে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের ও বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক সমস্যাগুলিকে জনপ্রিয় মাধ্যমের (অর্থাৎ নাটকের) মারফৎ মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই ওয়াই. সি.আই-র সদস্যবৃন্দ পরপর কয়েকটি নাটক অভিনয় করেন, যার বেশির ভাগই ছিল ইংরাজী ভাষায় রচিত। এই নাটকগুলি হলো 'পলিটিসিয়ানস্ টেক টু রোয়িং (জলিমোহন কাউল রচিত)', 'বয় গ্রোজ আপ' (এটিরও রচয়িতা জলিমোহন কাউল); দেবব্রত বসু লেখেন দুটি নাটিকা—'ইন দ্য হার্ট অফ চায়না' ও 'দি শপকীপার্স'। জলিমোহন কাউল-এর লেখা 'পলিটিসিয়ানস টেক টু রোয়িং' নাটকটিতে ভারতবর্ষ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পূর্ব ইউরোপের দেউলিয়া রাজনীতির বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা প্রকট, 'বয় গ্রোজ আপ' নাটিকাটিও ছিল একটি ফ্যাসিস্ত-বিরোধী নাটক। 'ইন দ্য হার্ট অফ চায়না' নাটিকাটিতে চীনে জাপ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং 'দি শপকীপার্স' নাটিকাটিতে নাৎসী হিটলার-শাসিত জার্মানীর দুরবস্থার কথাই বর্ণিত হয়েছিল।

এছাড়া ইনস্টিট্যুট-এর সদস্যেরা কয়লাখনি শ্রমিকদের জীবন নিয়ে অভিনয় করেন 'অঞ্জনগড়' (সুবোধ ঘোষের 'ফসিল' গল্পের সুনীল চ্যাটার্জী-কৃত নাট্যরূপ), এবং সুনীল চ্যাটার্জী লিখিত নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের ট্রাজেডি নিয়ে রচিত 'কেরাণী' নাটক। প্রথমটি অভিনীত হয় 'ওভারটুন হলে' ১৯৪০ এর শেষে, দ্বিতীয়টি অভিনীত হয় 'মুসলিম ইনস্টিট্যুটে, সম্ভবত ১৯৪১-এ।[৮০] নিঃসন্দেহে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের পূর্বসূরীরূপে এই সময় ওয়াই.সি. আই তার দায়িত্ব যথাযথভাবেই পালন করেছিল।

যাহোক, ওয়াই.সি.আই-এর শেষ উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ছিল নাৎসী জার্মানী কর্তৃক সোভিয়েত ভূমি আক্রমণের প্রতিবাদে সোভিয়েত সংস্কৃতির উপর একটি 'সিম্পোজিয়াম' বা আলোচনাচক্র এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা। অবশ্য এর পূর্বে এদেরই উদ্যোগে স্পেনের ফ্যাসিস্ত-বিরোধী সংগ্রাম ও চীনদেশে জাপ ফ্যাসিস্তদের আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগঠিত প্রতিরোধ-আন্দোলন-সংক্রান্ত দুটি প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করা হয়।[৮১]

১৯৪১-এর ৪ঠা আগস্ট অনুষ্ঠিত সোভিয়েত সংস্কৃতির উপর পূর্বোক্ত আলোচনা সভায় বক্তা রূপে উপস্থিত ছিলেন বুদ্ধদেব বসু ('সোভিয়েত শিক্ষা ও সংস্কৃতি') হীরেন মুখার্জি ('সোভিয়েত সংস্কৃতির ভিত্তি') এবং সরোজ দত্ত ('সংখ্যালঘু সমস্যা প্রসঙ্গে')। এছাড়াও আক্রান্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি সহমর্মিতা জানিয়ে আয়োজন করা হয় ফ্যাসিস্ত-বিরোধী ও পার্টিজান গণসঙ্গীতেরও।[৮২]

ইতিমধ্যেই ওয়াই. সি. আই-এর অফিস 'কেন্ট হাউস' থেকে চলে এসেছে ৪৬, ধর্মতলা স্ট্রীটে (পরবর্তীকালে যেটা ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের অফিস হয়)। 'সোভিয়েত সিম্পোজিয়াম' উপলক্ষে ওয়াই.সি.আই থেকে যে 'পুস্তিকা' প্রকাশ করা হয় তাতে দেখা যাচ্ছে যে সংস্থার অফিসের ঠিকানা পরিবর্তনের সংবাদ প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে বাঙলার যুবসমাজকে এই সংস্থার সদস্য হওয়ার জন্য আবেদনও জানানো হয়েছে।[৮৩]

কিন্তু, এরপর ওয়াই. সি. আই. আর বেশিদিন সক্রিয় ছিল না। অচিরেই এর সাংগঠনিক বিলুপ্তি ঘটে। এই প্রসঙ্গে ওয়াই. সি. আই-এর অন্যতম সংগঠক সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করছেন :

"...আমাদের সংগঠনের অনেকেই বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েন। আর তারই সঙ্গে সঙ্গে ওয়াই.সি. আই-ও শেষ হয়ে গেল। একটা উদ্দেশ্য সফল হলো না। একটা যুবআন্দোলন গড়ে তোলার কাজে আমরা ব্যর্থ হলাম। তার সবচেয়ে বড় কারণ আমাদেব সঙ্কীর্ণ মনোভাব। আমরা লোককে দলে টেনে নেবার চেষ্টা করিনি। আমরা সংগঠনের প্রসারের দিকে জোর দিইনি। আমরা নিজেরাই সবকিছু করেছি। তাই আন্দোলন হয়নি। একটি ছোট সংগঠন আমরা গড়েছিলাম আর একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলনের গোড়ার দিকের কাজটুকু করতে সক্ষম হয়েছিলাম। ছাত্র আন্দোলন থেকে ব্যাপকতর রাজনৈতিক সংগ্রামের দিকে পা বাড়াবার পথে ওয়াই. সি. আই আমাদের একটা স্বল্পকালের আশ্রয়স্থল হয়েছিল মাত্র।"[৮৪]

বস্তুত, সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই আত্মসমালোচনা বহুলাংশে সঠিক ও সত্য। এছাড়াও এই সংস্থার বিলোপের রাজনৈতিক একটি কারণের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন প্রগতি-সংস্কৃতি আন্দোলনেব প্রবীণ সংগঠক ও খ্যাতিমান গবেষক ধনঞ্জয় দাশ :

"অচিরেই আমরা দেখলাম, পার্টির ছাত্র-ফ্রন্টের নেতৃত্বের সঙ্গে ওয়াই.সি.আই পরিচালকবর্গের দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য এবং তজ্জনিত সংঘর্ষ ঘনিয়ে উঠেছে। বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়-এর নেতৃত্বে পরিচালিত ছাত্রনেতৃত্ব তখন মনে করতেন ওয়াই. সি. আই-এর সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ সমাজের উচ্চকোটি মানুষের সন্তানদের বিলাসী খেয়াল পরিতৃপ্তিব মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং পার্টির পক্ষে এটা শ্বেতহস্তী পোষার সামিল।"[৮৫]

অর্থাৎ, এই বিশ্লেষণ থেকে এটা সুস্পষ্ট যে পার্টিরই একাংশ তখন ওয়াই. সি. আই-এর বিলোপ ঘটিয়ে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী বৃহত্তর গণসংগঠন গড়ে তোলার বিষয়ে বেশি উৎসাহী ছিলেন।

৬. ফ্যাসিস্ত-বিরোধিতায় বিভিন্ন সাহিত্যিকগোষ্ঠী :

'বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘ' গঠনের (১৯৩৬) বেশ কিছু পূর্বেই বাঙলাদেশে বিভিন্ন সাহিত্যিকগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটেছিল। নানা ধরনের সাহিত্য-পত্রকে কেন্দ্র করেই

বিশের দশক থেকেই এই সাহিত্যিকগোষ্ঠী সক্রিয় ছিলেন। স্পষ্টতই এঁদের মধ্যে দুটি ধারা বিদ্যমান ছিল। নজরুল ইসলাম, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্রলাল বসু, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, নারায়ণ ভট্টাচার্য, জগদীশ গুপ্ত, শিবরাম চক্রবর্তী, হেমন্ত কুমার সরকার, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ নতুন যুগের লেখকেরা 'নবযুগ' (সান্ধ্য দৈনিক), 'সংহতি', 'আত্মশক্তি' 'বিজলী', 'কল্লোল', 'কালিকলম', 'লাঙ্গল', 'গণবাণী', 'নব-শক্তি', 'বঙ্গবাণী' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় তাঁদের সৃজনশীল রচনার মাধ্যমে প্রকাশ করছিলেন নিপীড়িত অন্ত্যজ মানুষের জীবনযন্ত্রণা আর সংগ্রামের কথা এবং পাশাপাশি রুশ-সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সদর্থক ভূমিকার বিষয়টি। নিঃসন্দেহে, এই ধারাটি ছিল বহুলাংশে বামপন্থী ধারা, যদিও তখনও সচেতনভাবে সাহিত্যের ক্ষেত্রে মার্কসবাদ প্রয়োগের কোনো প্রচেষ্টাই শুরু হয় নি।

অপর একটি সাহিত্যধারাও বিদ্যমান ছিল। সেই ধারাকে বলা যেতে পারে বিশুদ্ধ সাহিত্য সৃষ্টির ধারা। এই ধারার প্রবক্তারা মূলত ছিলেন রবীন্দ্রনাথের বিরোধী এবং পাশ্চাত্য বুর্জোয়া সাহিত্যের অনুসারী। 'কল্লোল' ও 'শনিবারের চিঠি'র তরুণ সাহিত্যিকগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে এই সময়পর্বেই। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, সজনীকান্ত দাস প্রমুখেরা ছিলেন এই দলের প্রধান নেতা। 'উদ্ধত যৌবনের ফেনিল উদ্দামতা' নিয়ে এঁরা বাংলা সাহিত্যের স্থবির বদ্ধ জলাশয়ে 'ভাবনৈতিক সন্ত্রাসের' আলোড়ন আনতে চেয়েছিলেন। অন্য একটি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন পণ্ডিচেরীর নলীনীকান্ত গুপ্ত, অনিলবরণ রায়, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক 'বাণী-মন্দির'-প্রণেতা শশাঙ্কমোহন সেন প্রমুখ বেশ কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি। এঁরা সেই সময় 'রুশ-বিপ্লব' এবং 'বলশেভিক-বাদ'কে হেয় প্রতিপন্ন করতেই সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন।[৮৬]

এই প্রারম্ভিক পটভূমিকা রচনার মধ্য দিয়ে আমি এটাই দেখাতে চাইছি যে, বিশ ও ত্রিশের দশকে উপরোক্ত পত্র-পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত সাহিত্যিকদের অনেকেই যথেষ্ট সক্রিয় থাকা সত্ত্বেও তাঁরা কিন্তু প্রায় কেউই ফ্যাসিবাদের মতন অমানবিক আর শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিনষ্টকারী পাশবশক্তির বিরুদ্ধে অন্তত মতাদর্শগত-ভাবেও সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন নি।

বস্তুতপক্ষে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, ঐ সময়পর্বে বাঙলায় সেই সব বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা ছিল মুষ্টিমেয়, যাঁরা সচেতনভাবে সাহিত্যে মার্কসবাদের সূত্রাবলী অনুসরণ করতেন কিংবা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ঘটনাবলীর তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারঙ্গম ছিলেন। এসব সত্ত্বেও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও সংগ্রাম শুরু করার প্রারম্ভিক পর্যায়ে অন্তত তিনটি পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত সাহিত্যিক-গোষ্ঠীর ভূমিকার কথা অবশ্যই উল্লেখ করতে হয়। অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এঁরাই সর্বপ্রথম বাঙলাদেশে ফ্যাসিস্ত-বিরোধিতায় সক্রিয় হয়েছিলেন। আমরা এই সাহিত্যিকগোষ্ঠীত্রয়কে ১) 'পরিচয়'-গোষ্ঠী; ২) 'অগ্রণী'-গোষ্ঠী এবং ৩) আনন্দ-বাজার পত্রিকায় কর্মরত 'অনামীচক্র'রূপে অভিহিত করতে পারি।

১) 'পরিচয়'-সাহিত্যিকগোষ্ঠী :

১৯৩১ সাল থেকেই সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-সম্পাদিত 'পরিচয়' পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই সর্বপ্রথম মার্কসীয় যুক্তিবিজ্ঞানে বিশ্বাসী কয়েকজন বুদ্ধিজীবীর আবির্ভাব ঘটে। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত নিজে মার্কসবাদী ছিলেন না। 'পরিচয়গোষ্ঠী'-র আদিযুগের লেখক, যাঁরা পরবর্তীকালে প্রগতি সাহিত্য এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য অথবা অনুরাগী সহযাত্রী রূপে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন, তাঁরাও ছিলেন নানা মানসিকতা ও ভাবগঙ্গায় সঞ্চরণশীল।[৮৭]

তথাপি তিরিশের দশকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সাহিত্য-সংস্কৃতির বিচার-বিশ্লেষণে 'পরিচয়গোষ্ঠী' যথেষ্ট সচেতনতার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। 'পরিচয়' প্রথমে ছিল ত্রৈমাসিক পত্রিকা। এর ব্যয়ভার প্রধানত বহন করতেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-ই। কিন্তু পরবর্তীকালে তা যখন দুঃসাধ্য হয়ে উঠল তখন 'পরিচয়'-কে জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে মাসিক সাহিত্যপত্ররূপে তার প্রকাশ ঘটতে থাকে।[৮৮]

যাহোক, 'পরিচয়' পত্রিকা প্রকাশের সূচনাপর্বে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন নীরেন্দ্রনাথ রায়, গিরিজাপতি ভট্টাচার্য, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, হিরণকুমার সান্যাল, হারীতকৃষ্ণ দেব প্রমুখ সুধীবৃন্দ। আর, লেখক রূপে 'পরিচয়গোষ্ঠী'-ভুক্ত হয়েছিলেন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখার্জি, সুশোভন সরকার, বিষ্ণু দে, শাহেদ সুরাওয়ার্দি, ডাঃ সুবোধ মুখোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র দত্ত প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। পরবর্তীকালে এই গোষ্ঠীতে যোগ দেন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৯৩৬)। এছাড়াও 'পরিচয়-এর সাপ্তাহিক আড্ডায় প্রায়শই এসে যোগ দিতেন আবু সয়ীদ আইয়ুব, জ্যোতির্ময় রায়, অপূর্ব চন্দ, যামিনী রায়, শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ, এমনকি শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু এবং 'স্টেটসম্যান' পত্রিকার এমার্সন ও অধ্যাপক হামফ্রি হাউস এর মতন সুপরিচিত গুণীজনেরা।

একথা অনস্বীকার্য যে, 'পরিচয়গোষ্ঠী'র লেখকদের (যাঁরা অধিকাংশই সাহিত্য-সংস্কৃতির সমালোচক রূপেই খ্যাতিসম্পন্ন) অনেকেরই মাটির সঙ্গে যোগ তেমন নিবিড় ছিল না, তাঁরা ছিলেন প্রধানত অভিজাত-শ্রেণীভুক্ত মানুষ। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তাঁদের অনেকেরই প্রত্যক্ষভাবে খুব একটা কিছু অবদান ছিল না, কিন্তু প্রায় সকলেরই ছিল একটি সচেতন রাজনৈতিক মানস।[৮৯] এই কারণে সমসাময়িক ইউরোপীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে বাঙলার অনেক বুদ্ধিজীবীর তুলনায় তাঁরা ছিলেন অধিকমাত্রায় 'ওয়াকিফহাল' ও সংবেদনশীল। এই প্রসঙ্গে হীরেন্দ্রনাথ মুখার্জি, সুশোভন সরকার, রাধারমণ মিত্র প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৯৩৫-৩৬ সালে ইংল্যাণ্ড ও অক্স বিশ্ববিদ্যালয় প্রত্যাগত হীরেন মুখার্জি যখন 'পরিচয়ের আড্ডা'-য় যোগ দিলেন তখন থেকে 'পরিচয়গোষ্ঠী'র অভ্যন্তরে একটা গুণগত পরিবর্তন ঘটে। ফ্যাসিবাদ-বিরোধিতায় 'পরিচয়' আগের থেকেই সক্রিয়

ছিল এবং এই বিষয়ে সুশোভন সরকারের একাধিক প্রবন্ধ 'পরিচয়'-এর পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিল ; কিন্তু হীরেন মুখার্জির যোগদানের পর তাতে আলাদা একটি রাজনৈতিক মাত্রাও যুক্ত হয়।

এই প্রসঙ্গে সুধী প্রধানের একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি এক প্রবন্ধে লিখেছেন :

"……ইউরোপের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে 'ইউনাইটেড ফ্রন্টের' যে বাস্তব অঙ্কুর তৈরী হচ্ছিল—বাংলাতে ১৯৩১ সালের 'পরিচয়' প্রকৃতপক্ষে তারই প্রকাশ। ব্যাপারটা প্রায় স্বতঃস্ফূর্ত—তবু সত্য।……'পরিচয়ে' এই ধরনের যুক্তফ্রন্ট (অর্থাৎ ডিমিট্রভ ঘোষিত) তার উদ্যোক্তাদের প্রায় অজ্ঞাতেই গড়ে উঠেছিল।"[৯০] [বন্ধনী অংশ আমার]

১৯৩১ সালেই ১৯৩৫-এর 'যুক্তফ্রন্ট তত্ত্বে'র প্রয়োগ-সম্পর্কিত সুধী প্রধানের এই বক্তব্যকে কারো কারো কাছে স্বকপোল-কল্পিত বলে মনে হতে পারে, কিন্তু পরিচয়-এর 'সাহিত্যিকগোষ্ঠী'তে এত বিভিন্ন মত ও পথের বুদ্ধিজীবীরা সামিল হয়েছিলেন যে তাকে সত্যি সত্যিই একটি 'যুক্তমঞ্চ' রূপেই চিন্তা করা চলে। তবে একথা সত্য, ফ্যাসিস্ত-বিরোধী যুক্তফ্রন্ট গঠনের তত্ত্ব সচেতনভাবে 'পরিচয়-'এর সাহিত্যিকগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচার করার চেষ্টা করেন অধ্যাপক হীরেন মুখার্জি এবং অধ্যাপক সুশোভন সরকার আর সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী। যদিও এই প্রচেষ্টাকে তীব্র সমালোচনা করে কিঞ্চিৎ শ্লেষ সহকারেই সুধী প্রধান মন্তব্য করেছেন :

"……ভারসাম্য রক্ষা করতেন শ্রী হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী। ফলে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী যোগাড় করার জন্য সোভিয়েতকে টোটে-লেটারিয়ান বলতে দিত হত, সাহিত্যক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের প্রতি-নিধি এলিয়টকে প্রশস্তিও জানাতে হত।"[৯১]

এই সমালোচনার হয়তো সত্যিই কিছু ভিত্তি আছে। 'পরিচয়' সাহিত্যিক-গোষ্ঠী-র মধ্য থেকে ফ্যাসিস্ত-বিরোধিতার সমর্থন আদায়ের স্বার্থেই হীরেনবাবু ও অন্যান্য মার্কসবাদীদের এমন অনেক মতামতকে প্রশ্রয় দিতেই হতো যা তাঁদের নিজেদের আদর্শের অনুসারী ছিল না। কিন্তু এ সত্যকেও তো অস্বীকার করা যায় না যে, "চীন, আবিসিনিয়া, স্পেন, চেকোস্লোভাকিয়া প্রভৃতি দেশকে নিয়ে ফ্যাসি-জমের কদর্য কুকীর্তি আর তার পিছনে গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের নির্লজ্জ সমর্থন তখন আমাদের দেশের সর্বস্তরে নতুন চেতনা উদ্রিক্ত করছিল, 'অভিজাত' পত্রিকা বলে বর্ণিত 'পরিচয়' ফ্যাশিস্টবিরোধী প্রচারে অগ্রণী ভূমিকায় নেমেছিল।"[৯২]

হীরেন মুখার্জি যখন 'পরিচয়'-এর অড্ডায় যোগ দেন তার অনেক পূর্ব থেকেই অধ্যাপক সুশোভন সরকার 'পরিচয়' পত্রিকায় একটার পর একটা প্রবন্ধ লিখে সেই সময়কার ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় জনবোধ্য আকারে ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ সহকারে ব্যাখ্যা করতেন। বলাইবাহুল্য, তার মূল

সুর ছিল ফ্যাসিস্ত-বিরোধিতা। প্রবন্ধগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো : 'সোশ্যালিজমের মূল সূত্র' (১৯৩২), 'মাঙ্কুকুয়ো' (১৯৩৩), 'ইয়োরোপের গণতন্ত্র' (১৯৩৪), 'জার্মানীর দুরবস্থা' (১৯৩৩), 'আন্তর্জাতিক সংকট' (১৯৩৫), 'ফাসিসমো' (১৯৩৫), 'স্পেনে অন্তর্বিরোধ' (১৯৩৬), 'জার্মান গণতন্ত্র' (১৯৩৬), 'স্পেন ও ব্রিটিশ বৈদেশিক নীতি' (১৯৩৭), 'সাম্যবাদের সঙ্কট' (১৯৩৭), 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক' (১৯৩৮), 'ফ্যাশিজমের শেষ অঙ্ক' (১৯৪৬)। এছাড়া আরো অনেক প্রবন্ধে ও পুস্তক পর্যালোচনায় সুশোভনবাবুর ফ্যাসিস্ত-বিরোধিতার স্বাক্ষর সুস্পষ্ট।[৯৩]

সুশোভন সরকারের ঐ সব রচনা ছাড়াও এই সময় এমন সব প্রবন্ধ ও পুস্তক-পর্যালোচনাও (ধূর্জটিপ্রসাদ মুখার্জি, নীরেন্দ্রনাথ রায়, হীরেন মুখার্জি প্রমুখের) 'পরিচয়' পত্রিকার পাতায় প্রকাশিত হয়েছিল, যাতে ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সুর স্পষ্টতই ধ্বনিত। ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত হীরেন মুখার্জি-রচিত 'সংস্কৃতির সংকট' প্রবন্ধটির অংশবিশেষ প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য :

> "...বর্তমান যুগে, ধনতন্ত্রবাদের মরণোন্মুখ অবস্থায় পুরানো রাস্তায় সংস্কৃতি বিকাশের আশা নেই। সংস্কৃতির উপর আক্রমণ সবচেয়ে বেশি আসছে ফ্যাসিস্ট দেশ থেকে। আর তার কারণ এই যে ফ্যাসিজম্ ধনতন্ত্রবাদকে বাঁচিয়ে রাখার শেষ বিভ্রান্ত চেষ্টা। যাঁরা একথা স্বীকার করবেন তাঁদের আমরা সাহিত্যক্ষেত্রে বলব সহযাত্রী...শিল্পী-সাহিত্যিকদের মধ্যে যাঁরা সমাজ-বিপ্লব-কামীদের সহযাত্রী তাঁরা বিপ্লবের যুগে তাঁদের আর্টকে ব্যবহার করতে বাধ্য হবেন অস্ত্ররূপে।..
>
> "ধনতন্ত্রবাদের বিপদ যেখানে বেশি, যেখানে বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থা রক্ষা করার জন্য ফ্যাসিজম্ উদ্যত হয়েছে, সেখানেই ভবিষ্যৎকে নতুন করে গড়ে তোলা হচ্ছে অপরাধ, সেইখানেই সংস্কৃতি আজ বিপন্ন।
>
> "একথা যাঁরা ভুলে যাচ্ছেন, তাঁরা উটপাখীর মত বালিতে মাথা গুঁজে ভাবছেন যে ঝড় কেটে যাবে তাঁদের স্পর্শ না করে।...ঝড় আসছে জেনেও তাঁরা তৈরী হচ্ছেন না ; কারণ আসলে তাঁরা চান না যে ঝড় আসে—যে আমাদের সমাজের রূপ বদলায়।"[৯৪]

সুতরাং এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত থাকতে পারে না যে, 'পরিচয়'-এর সাহিত্যিক-গোষ্ঠী ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে তাঁদের দায়িত্ব যোগ্যতার সঙ্গেই পালন করেছিলেন। জনযুদ্ধের যুগে (সোভিয়েত আক্রান্ত হবার পর) তাঁদের তৎপরতা আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আরও প্রসারিত হয়। তথাপি, সুধী প্রধানের মতো তীক্ষ্ণধী সমালোচক দুঃখজনকভাবে 'পরিচয়'-এর সাহিত্যিকগোষ্ঠীকে 'সৌখিন, আত্ম-প্রতারণাময় ও পলায়নপর বুদ্ধিবিলাসী' বলে বিদ্রূপ করেছেন।[৯৫] হয়তো এই সাহিত্যিকগোষ্ঠীর অনেকেই 'অভিজাত' বা 'উঁচকপালে' ছিলেন ; কিন্তু তাই বলে তাঁদের ভূমিকাকে অস্বীকার করা হলে তা হবে ইতিহাসকে বিকৃত করারই সামিল।

২) অগ্রণী-সাহিত্যিকগোষ্ঠী :

'প্রগতি লেখক সংঘে'র কলকাতা অধিবেশন-এর পরেই ১৯৩৯ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত হয় 'অগ্রণী' মাসিক পত্রিকা। এ-প্রসঙ্গে ধনঞ্জয় দাশ লিখেছেন :

"বাংলা ভাষায় কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশে পরিচালিত প্রথম সাংস্কৃতিক পত্রিকা হচ্ছে এই 'অগ্রণী'। প্রফুল্ল রায় ছিলেন এর সম্পাদক। সম্পাদকমণ্ডলীতে ছিলেন দেবকুমার গুপ্ত, অদ্বৈত দত্ত, বীরেন্দ্র মজুমদার ও চিন্মোহন সেহানবীশ। কিছুদিনের মধ্যেই 'অগ্রণী'র সম্পাদনা ও পরিচালনার কাজে যুক্ত হন সরোজ দত্ত, সুনীল চট্টোপাধ্যায়, শ্যামনাথ সিংহ, সুধী প্রধান এবং অনিল কাঞ্জিলাল। এঁরা 'অগ্রণী'কে বামপন্থী মাসিক পত্রিকারূপে প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেন।"[৯৬]

'অগ্রণী' যেমন ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশ করেছিল, তেমনি সাহিত্যের 'আঙ্গিক' ও 'বিষয়বস্তু' নিয়ে মার্কসীয় দৃষ্টিতে সর্বপ্রথম এক বিতর্কেরও সূত্রপাত ঘটায়। প্রকৃতপক্ষে, ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলনের সংগঠকদের, বিশেষ করে মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীদের একত্রিত করার কাজে 'অগ্রণী' নিঃসন্দেহে পালন করেছিল এক উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব।

সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর 'ফ্যাসিজম ও বুদ্ধিদ্রোহ' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় 'অগ্রণী'র প্রথম সংখ্যায়। বস্তুতপক্ষে, সেই সময়ে বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা প্রায় ছিলই না বলা যায়। দেশপ্রেমীদের মধ্যে অনেকেই হিটলারের সাহায্যে ভারতবর্ষকে মুক্ত করার স্বপ্ন দেখতেন। সেই বিভ্রান্তির মধ্যে দাঁড়িয়ে 'অগ্রণীগোষ্ঠী' দৃঢ় ও সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছিলেন, "সাম্রাজ্যতন্ত্র-বিরোধের সঙ্গে ফ্যাসিস্ত-বিরোধ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।"[৯৭]

১৯৩৯ সালের জানুয়ারি থেকে ১৯৪০-এর জুন—এই ক্ষণস্থায়ী দেড় বছরের জীবনে 'অগ্রণী' প্রগতি-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মার্কসবাদী চিন্তা-ভাবনা প্রসারে যে নিষ্ঠা ও কর্মতৎপরতার পরিচয় দিয়েছে তা তুলনাহীন। মানবমুক্তি সংগ্রামের এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভাবজগতে প্রবাহিত তৎকালীন প্রগতিমুখী সমস্ত ধারার প্রতিফলন ঘটেছিল 'অগ্রণী'র প্রতিটি সংখ্যার প্রত্যেক রচনায়। সোমনাথ লাহিড়ী, আবদুল হালিম, রণেন সেন, ভবানী সেন, সরোজ মুখোপাধ্যায়, সুধাংশু দাশগুপ্ত, সরোজ দত্ত, বিশ্বনাথ মুখার্জি, গঙ্গাধর অধিকারী, অজয়কুমার ঘোষ, পি. সি. যোশী, ডি. ডি. কোশাম্বী, চিন্মোহন সেহানবীশ, করুণাকর গুপ্ত, নৃপেন চক্রবর্তী, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, মনোরঞ্জন রায়, সুধী প্রধান, সমর সেন, বিনয় ঘোষ প্রমুখ সমসাময়িক তরুণ কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবী ও নেতৃবৃন্দের নানা প্রবন্ধ-নিবন্ধই ছিল 'অগ্রণী'র অন্যতম উল্লেখযোগ্য সম্পদ।

এছাড়াও ইউরোপের 'নিউ রাইটিং'-এর আন্দোলন সহ র‍্যালফ ফক্স, কডওয়েল, সিলোন, এডওয়ার্ড আপওয়ার্ড-এর রচনাসমূহের অনুবাদ 'অগ্রণী'কে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সাহায্য করেছিল। চল্লিশের দশকের কয়েকজন

প্রগতিশীল ও ফ্যাসিস্ত-বিরোধী কবির প্রতিভা বিকাশেও 'অগ্রণী'র অবদান স্মরণীয়।' এঁরা হলেন অরুণ মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, দিনেশ দাস, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, চঞ্চল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। 'অগ্রণী'র ভূমিকা ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলনে তাই শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্মরণীয়।

৩) আনন্দবাজার পত্রিকার 'অনামীচক্র' :

বাঙলার ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনের ইতিহাসে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র ভূমিকাও অন্তত কিছুকালের জন্যে হলেও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যে-সময় ব্রিটিশ স্বার্থবাহী 'স্টেটসম্যান' পত্রিকা 'প্রগতি সাহিত্য' এবং সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনের বিরুদ্ধে ক্রমান্বয়ে কুৎসা রচনা করে চলেছে এবং 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র মতো জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র ফ্যাসিজমের বিপদ সম্পর্কে সম্যক সচেতন নয়, সেই সময় 'প্রগতি লেখক সংঘ' ও 'ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনে'র প্রতিটি কর্মসূচীর রিপোর্ট যথাযথভাবে প্রকাশ ও প্রচার ক'রে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' দায়িত্বশীল এক সংগঠকের ভূমিকা (১৯৩৫-১৯৪১) পালন করেছিল।

'আনন্দবাজার পত্রিকা'র তৎকালীন স্বনামধন্য সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের নাম এ-প্রসঙ্গে অবশ্যই স্মরণযোগ্য। বস্তুত, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার যতদিন (১৯৪১পর্যন্ত) 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন[৯৮] ততদিন 'ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলনে' এই সংবাদপত্র যথেষ্ট সহায়তাই শুধু প্রদান করেনি, কার্যত আন্দোলনের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল।

এই পত্রিকার সাংবাদিকরূপে অরুণ মিত্র, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, বিনয় ঘোষ, মন্মথ সান্যাল, নৃপেন চক্রবর্তী, বিজন ভট্টাচার্য, সুবোধ ঘোষ, মনোরঞ্জন রায়, পুলকেশ দে সরকার প্রমুখেরা তাঁদের রচনায় এবং সংবাদপরিবেশনে এক প্রগতিমুখী সাংবাদিকতার সূত্রপাত করেন। সাংবাদিকতার পেশা ছাড়াও এঁরা অধিকাংশই ছিলেন সৃজনশীল কবি-সাহিত্যিক, সমালোচক কিংবা গল্পকার। অর্থাৎ, বাঙলার প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গেও এঁদের যোগ ছিল নিবিড়। এঁদের দ্বারা সংগঠিত 'অনামীচক্র' (স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য 'অনামী' ছদ্মনামে লিখতেন, নামের উৎস সম্ভবত সেটাই) নামক সাহিত্য-আলোচনার আসরটি ছিল প্রগতিশীল তথা মার্কসীয় চিন্তাচর্চার একটি প্রধান কেন্দ্র। ফ্যাসিস্ত-বিরোধী সাহিত্য-আন্দোলনে এঁরা তখনই জড়িত ছিলেন এবং পরবর্তীকালে এঁদের অনেকেই নেতৃত্বের দায়িত্বও গ্রহণ করেন।

প্রকৃতপক্ষে, বাঙলার ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের নামটি চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁরই সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত দুটি বিখ্যাত সভা থেকে 'বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘ' (১৯৩৬)[৯৯] এবং 'সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি' (১৯৪১)[১০০] গঠিত হয়। সত্যেন্দ্রনাথ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন না,

কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির ঘনিষ্ঠ দরদী রূপে তিনি আমৃত্যু কাজ করে গিয়েছেন। তাঁর বাড়িটি ছিল মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী ও ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনের সংগঠক-দের প্রধান মিলনস্থল। যাহোক, ১৯৪১-এর ২২শে জুন সোভিয়েত ইউনিয়ন হিটলার কর্তৃক আক্রান্ত হবার পরে 'আনন্দবাজার কর্তৃপক্ষ'র সঙ্গে 'অনামীচক্র'র সদস্যদের তীব্র মতবিরোধ ঘটে। সোভিয়েতের পক্ষে কোনো প্রচার তাদের কাগজে করতে দিতে সম্ভবত 'আনন্দবাজার' কর্তৃপক্ষ আর রাজী ছিলেন না, কিংবা কমিউ-নিস্টদের 'জনযুদ্ধ'র নীতিও তারা পছন্দ করেননি। ফলে, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার সম্পাদকের পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে 'অরণি' পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

'পরিচয়', 'অগ্রণী' বা 'অনামীচক্র' ছাড়াও সেসময় পূর্ববঙ্গে (১৯৩৯-৪০ সালের মধ্যে) বামপন্থী চেতনায় আস্থাশীল কিছু তরুণ প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী ঢাকা, কুমিল্লা, শ্রীহট্ট, যশোহর, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলায় 'প্রতিরোধ', 'নবযুগ,' 'বলাকা', 'প্রগতি' প্রভৃতি পত্রপত্রিকাকে কেন্দ্র করেও ফ্যাসিস্ত-বিরোধী প্রচার চালাতে থাকেন। 'জনযুদ্ধে'র যুগে এঁদের সক্রিয়তা আরো বৃদ্ধি পায়, পরবর্তী অধ্যায়ে এঁদের কথাও আলোচিত হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

জনযুদ্ধের নীতি ও ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনে নতুন মাত্রা

বাঙলা তথা ভারতবর্ষের ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনকে নিঃসন্দেহে দুটি সুস্পষ্ট পর্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্যায়টি ক্রিয়াশীল ছিল সমগ্র ত্রিশের দশক জুড়ে, যাকে বলা যায় প্রাক-জনযুদ্ধের যুগ; আর দ্বিতীয় পর্যায়টি হলো নাৎসী জার্মানী কর্তৃক সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র আক্রমণের (২২ শে জুন, ১৯৪১) পরবর্তীকাল, ইতিহাসে যা জনযুদ্ধের যুগ রূপেই চিহ্নিত।

১. সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ জনযুদ্ধে রূপান্তরের রাজনৈতিক পটভূমি ঃ

১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয় নাৎসী বাহিনীর পোল্যাণ্ড আক্রমণের মধ্য দিয়ে। ৩রা সেপ্টেম্বর ব্রিটিশ সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ফ্রান্সও ব্রিটেনকে অনুসরণ করে। অনতিবিলম্বে ভারতের বড়লাট, লর্ড লিনলিথগো, ভারতীয় জনগণ কিংবা তাদের প্রতিনিধিত্ব মূলক কোনো সংগঠন অথবা জাতীয় নেতৃত্বের সঙ্গে কোনোরূপ আলোচনা না করেই একতরফাভাবে ভারতকে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত দেশ বলে ঘোষণা করলেন। এর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ১৯৩৫ সালে প্রবর্তিত 'ভারত শাসন আইন'কে সংশোধন করে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থাকে কার্যত বাতিল করে দিল এবং 'ডিফেন্স অফ ইণ্ডিয়া অর্ডিন্যান্স'-এর ঘোষণার দ্বারা বড়লাটকে প্রদান করল এক চরম স্বৈরাচারী ক্ষমতা। ফলে, ভারতীয় গণমানসে দেখা দিল তীব্র প্রতিক্রিয়া, সঞ্চারিত হলো প্রচণ্ড ক্ষোভ।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৩৯ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর ওয়ার্ধায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে গৃহীত এক ঐতিহাসিক প্রস্তাবে বলা হলো :

> "কংগ্রেস বারংবার ফ্যাসিবাদ এবং নাৎসীবাদের আদর্শ ও পন্থাকে এবং তাদের যুদ্ধের প্রশস্তি ও হিংসা সাধন এবং মানবীয় শক্তিকে দলিত করার কাজকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন না করার কথা ঘোষণা করেছে। এরা অনবরত যে আক্রমণের মধ্যে নিজেদেরকে নিহিত করেছে এবং সভ্য আচরণের গৃহীত নীতিসমূহ এবং মাপকাঠিগুলিকে ভাসিয়ে দিয়েছে, কংগ্রেস তার নিন্দা করেছে। ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদের মধ্যে সে প্রত্যক্ষ করেছে সাম্রাজ্যবাদী নীতির দৃঢ়করণ, যার বিরুদ্ধে ভারতের জনসাধারণ লড়াই করেছে। কার্যকরী সমিতি তাই নির্দ্বিধায় পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে জার্মানীর নাৎসী সরকারের সর্বশেষ আক্র-

মণকে তীব্র নিন্দা করছে এবং এই আক্রমণকে যারা প্রতিরোধ করছে তাদের প্রতি সহানুভূতি জানাচ্ছে।…

"গণতন্ত্রের যথার্থ মাপকাঠি হলো সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদ উভয়েরই অবসান এবং অতীত ও বর্তমানে তাদের সাথে জড়িত আক্রমণের পরিসমাপ্তি। একমাত্র এর উপর ভিত্তি করে একটি নতুন ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে। সেই নতুন বিশ্ব-ব্যবস্থা গড়ে তোলার সংগ্রামে কমিটি সর্বপ্রকারের সাহায্য করতে ইচ্ছুক ও প্রস্তুত।

"কিন্তু কমিটি নিজেদেরকে সেইরকম যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত করতে পারে না, কিংবা তাকে সাহায্য করতে পারে না, যে যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী ধারায় পরিচালিত এবং ভারত ও অন্যান্যস্থানে সাম্রাজ্যবাদকে সুসংহত করার উদ্দেশ্যে সৃষ্ট।"[১]

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এই প্রস্তাবে আরো বলা হয়েছিল :

"যুদ্ধ এবং শান্তি সম্পর্কে ভারতের জনগণই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে ; এ সম্পর্কে বাহিরের কাহারও কর্তৃত্ব বা আরোপিত সিদ্ধান্ত সে মানিবে না এবং সামাজ্য-বাদী উদ্দেশ্য সাধনের জন্যও ভারতের জনগণ তাহাদের শক্তি সম্পদের শোষণ বরদাস্ত করিবে না।…

"ব্রিটেন যদি গণতন্ত্ররক্ষা ও প্রসারকল্পেই যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার নিজের সাম্রাজ্যবাদী নীতি ত্যাগ করিতে হইবে এবং ভারতে পরিপূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতেই হইবে ; ভারতবাসীকে গণপরিষদ দ্বারা নিজ গঠনতন্ত্র এবং কর্মনীতি প্রণয়ন করিতে দিতে হইবে। স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভারত অন্যান্য স্বাধীন দেশের সহিত সানন্দে মিলিত হইয়া আক্রমণের বিরুদ্ধে পরস্পরকে রক্ষা করিবে এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সহযোগিতা করিবে।"[২]

ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনের ইতিহাসে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এই 'ওয়ার্ধা-প্রস্তাব' গভীর তাৎপর্যবাহী এক ঘটনা। 'ওয়ার্ধা-প্রস্তাবের' খসড়াটি রচনা করেন জওহরলাল স্বয়ং ; এর থেকে এটা বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না যে, কংগ্রেসের বামপন্থী অংশের, বিশেষ করে কমিউনিস্টদের, সম্পূর্ণ সম্মতি ছিল 'ওয়ার্ধা-প্রস্তাবে'র পিছনে। গান্ধীজী কিন্তু এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধী ছিলেন। তাঁর অভিমত ছিল, ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে যে-কোনো প্রকারের সাহায্যই করা হোক্-না-কেন, তা বিনা-শর্তেই করা উচিত। কিন্তু গান্ধীজী দুঃখের সঙ্গে উপলব্ধি করেছিলেন যে, তিনি ছাড়া আর কেউ এরূপ মনোভাব পোষণ করেন না। গান্ধীজী শত্রুর বিপদের সুযোগ নিয়ে সুবিধা গ্রহণ করাকে তখন ঘৃণার চোখেই দেখেছিলেন।[৩] বস্তুত-পক্ষে, যুদ্ধ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই (৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯) গান্ধীজী বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং এক বিবৃতিতে বলেন, "ব্রিটেন ন্যায়যুদ্ধ লড়িতেছে। একজন সত্যাগ্রহীকে ন্যায়ের পক্ষ সমর্থন করিতেই হইবে। সে পক্ষে শত্রু থাকিলেও করিতে হইবে।"[৪]

ব্রিটিশ সরকার কিন্তু ভারতের স্বাধীনতার দাবীটিকে কোনোভাবে আমলই

দিতে চাননি। বড়লাট লর্ড লিনলিথগো ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রায় পঞ্চাশ জন প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে একটি বিবৃতিতে (১৭ই অক্টোবর, ১৯৩৯) ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস দানকে ভারতে ব্রিটিশ নীতির লক্ষ্য বলে ঘোষণা করলেন এবং ১৯৩৫-এর 'ভারত শাসন আইনের' মধ্যেই রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করার কথা বললেন। এছাড়া যুদ্ধ পরিচালনায় ভারতীয় রাজন্যবর্গের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি পরামর্শদাতা পর্ষদ গঠনের প্রস্তাবও বড়লাট দিলেন।[৫]

স্বভাবতই এই প্রস্তাব কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মনোমত ছিল না। সুতরাং ওয়ার্কিং কমিটি কংগ্রেস পরিচালিত প্রাদেশিক সরকারগুলিকে (মন্ত্রীসভা) পদত্যাগের নির্দেশ দেয়। সেই নির্দেশ মান্য করে মন্ত্রীসভাগুলিও পদত্যাগ করে। কিন্তু তার-পর থেকে ১৯৪০-এর মার্চ মাস পর্যন্ত (রামগড় কংগ্রেস অবধি) জাতীয় কংগ্রেস অবলম্বন করে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় মনোভাব। ভারতে এই সময় কোনো গণআন্দোলন গড়ে উঠুক এটা কংগ্রেস নেতৃত্ব সত্যিই চাননি। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে ক্রমশই ব্রিটিশ সরকারের প্রস্তাব সম্পর্কে আপসমুখী মনোভাব প্রকট হয়ে উঠতে থাকে, এর পরিণতি আমরা দেখতে পাই রামগড়ে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে (মার্চ, ১৯৪০)। ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেস নেতৃত্বের এই দুর্বলতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত ছিল। গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী অংশ কখনোই ভারতে ব্রিটিশ-বিরোধী গণঅভ্যুত্থানের পথে যাবে না, সে সম্পর্কেও ছিল তাদের দৃঢ় প্রত্যয়। উপরন্তু, মুসলিম লীগ, এম. এন. রায়-পন্থী, দেশীয় রাজন্যবর্গ এবং সেই সঙ্গে হিন্দুমহাসভার মতো কায়েমী স্বার্থবাদীপুষ্ট দল ও গোষ্ঠীকে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট অনুগত সমর্থক রূপেই নিজেদের পাশে পেয়েছিল।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সেই মুহূর্তে প্রত্যক্ষ গণআন্দোলন ও গণসংগ্রাম গড়ার উদ্যোগ নিয়েছিল শুধুমাত্র কংগ্রেস-সোস্যালিস্ট পার্টি ও কমিউনিস্টরা। সুস্পষ্ট ভাষায় তারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে চিহ্নিত করল 'সাম্রাজবাদী যুদ্ধ' রূপে এবং ঘোষণা করেছিল এই যুদ্ধে 'একটি পয়সা বা একজন ভারতীয়কেও ব্যবহৃত হতে দেওয়া হবে না' (না এক পাই, না এক ভাই)। এই সঙ্গে তারা ভারত থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদী সরকারকে উচ্ছেদ করে 'জাতীয় সরকার' প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানায় এবং প্রবল গণআন্দোলন গড়ে তোলার উদ্যোগও গ্রহণ করে। এই সময় বে-আইনী কমিউনিস্ট পার্টির আহ্বানে ২রা অক্টোবর (১৯৩৯) একদিনের জন্য রাজনৈতিক ধর্মঘটে বোম্বাইয়ের বস্ত্রশিল্পের নব্বই হাজার শ্রমিক অংশগ্রহণ করে। এই ধর্মঘটই ছিল ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ-বিরোধী প্রথম শ্রমিক ধর্মঘট। এই সময় থেকেই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে কমিউনিস্টরা শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকদের মধ্যে তীব্র প্রচার শুরু করে।[৬]

ভারতে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলন মূলত পরিচালিত হচ্ছিল কমিউনিস্টদেরই উদ্যোগে। কিন্তু ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে যুদ্ধ শুরু হবার পর থেকেই ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলন সাময়িকভাবে স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং কার্যত থেমে যায়।

এই সময় একমাত্র 'রায়পন্থী' 'ইণ্ডিয়ান ফেডারেশন অফ লেবর'-ই সামান্য কিছু ফ্যাসিস্ত-বিরোধী প্রচার চালায় এবং ভারতীয় জনমতকে ব্রিটিশের যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সামিল করার চেষ্টা করে। 'রায়পন্থী'রা যে এর জন্য ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে মোটা অংকের আর্থিক সাহায্য পেত তা আজ ঐতিহাসিক সত্য।[৭]

কিন্তু কমিউনিস্টরা কি তাদের পূর্ব-ঘোষিত 'ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলন' থেকে সরে দাঁড়ালেন? ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের আহ্বানই বা তারা জানালেন কেন? এই প্রসঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন সম্পাদক পি. সি যোশীর বক্তব্য অনুধাবনযোগ্য:

" 'ন্যাশনাল ফ্রণ্ট' নামে আমাদের যে সাপ্তাহিক মুখপত্র বাহির করিয়াছিলাম, যুদ্ধ বাঁধিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। তৎক্ষণাৎ আমরা 'কমিউনিস্ট' নামে এক বে-আইনী মুখপত্র বাহির করি। ১৯৩৯-এর নভেম্বর মাসে উক্ত পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই আমরা ঐ সময়ের অবস্থা সম্পর্কে আমাদের বিশ্লেষণ জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করি। 'কমিউনিস্ট'-এ প্রকাশিত আমাদের পলিটব্যুরো-র প্রস্তাব:

"যুদ্ধের রূপ

"আজ ইউরোপে যে যুদ্ধ চলিতেছে সে যুদ্ধ ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের যুদ্ধ নহে। ইহা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ—১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধের উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ।" এই প্রস্তাবে জার্মান ফ্যাসিস্টদের 'যুদ্ধের প্রধান প্ররোচক' বলিয়া বর্ণনা করিবার সঙ্গে সঙ্গে 'সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে পরিচালিত করিবার আশায় ফ্যাশিস্ট আক্রমণে সাহায্য করিয়া ও প্ররোচনা দিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিক্রিয়াশীল নীতিই যে বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সূচনাকে দ্রুততর করিবার ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ইন্ধন যোগাইয়াছে' একথাও বলা হয়।

"যুদ্ধের লক্ষ্য

"বৃটেন ও ফ্রান্স স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতেছে না। তাহাদের বিজয়ের অর্থ ফ্যাসিজমের ধ্বংস নহে—এমন কি ফ্যাসিজম্ দুর্বল হওয়াও নহে।……চেম্বারলেন ও দালাদিয়ে তাহাদের সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এবং তাহাদের নিজেদের দেশে ফ্যাসিজমকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য জনসাধারণের ফ্যাসিস্ট-বিরোধী মনোভাবকে কাজে লাগাইতেছে…… তাহারা ইউরোপের প্রত্যেক দেশে প্রতিক্রিয়াকে চাঙ্গা করিয়া তুলিবে। তাহাদের নিজেদের দেশে তাহারা গণতন্ত্রের শেষচিহ্নটুকু পর্যন্ত ধ্বংস করিবে। তাহারা উপনিবেশগুলিতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শোষণ তীব্রতর করিবে।"[৮]

বস্তুত, একথা কিছুটা পরিমাণে সত্য যে, ১৯৩৯-এর আগস্ট মাসে যে 'নাৎসী-

'সোভিয়েত অনাক্রমণ চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয় (যা কিন্তু কোনোমতেই মৈত্রী চুক্তি নয়, এটা ছিল নিছকই আত্মরক্ষা ও যুদ্ধ-প্রস্তুতির জন্য একটি সাময়িক সোভিয়েত রণকৌশল মাত্র) তাতে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টিগুলো বেকায়দায় পড়লেও ভারতীয় কমিউনিস্টদের সামনে তা হাজির করেছিল এক স্বস্তিকর পরিস্থিতি। ফলত, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণআন্দোলনের প্রধানতম সংগঠকরূপে সেদিন কমিউনিস্টরা নিজেদের ভাবমূর্তি এবং মর্যাদাকেও ভারতীয় জনসাধারণের চোখের সামনে উজ্জ্বল করে তুলতে সক্ষম হয়েছিল।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের এই আহ্বান জানানো হলেও এর ফলে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে প্রচার-আন্দোলন গতিরুদ্ধ হয় না; কংগ্রেসের অনেক নেতাই ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদকে দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন, এমনকি পরস্পর-বিরোধী আদর্শ বলে এক ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করতেন। সোস্যালিস্টরাও ছিলেন ঐ একই পথের অনুসারী। একমাত্র কমিউনিস্টরাই ফ্যাসিবাদ যে সাম্রাজ্যবাদেরই নিকৃষ্ট ও বিকৃত রূপ—সে-সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করার চেষ্টা করেন। তাই প্রাক-জনযুদ্ধ পর্যায়ে তারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে ফ্যাসিবাদ-বিরোধী প্রচার আন্দোলনকেও যুক্ত করে নিতে পেরেছিলেন। তৎ-কালীন সময়ে (১৯৩৯-৪১) কমিউনিস্টদের 'বাস্তব কাজ' রূপে পার্টি সম্পাদক যোশী যা তুলে ধরেছেন তাতেই এর যথার্থতা প্রমাণিত হয়। তিনি লিখেছেন:

"(১) ইউরোপে দেশের পর দেশে হিটলারের প্রভুত্ব বিস্তার ও এই সমস্ত দেশের প্রতিক্রিয়াশীল গভর্নমেণ্টগুলির শোচনীয় পতনের কাহিনী ব্যাখ্যা করিয়া এবং সোভিয়েট ইউনিয়নকে কোণঠাসা করিবার এবং ভারতকে ক্ষমতা না দিবার বৃটিশ নীতির অর্থ যে হিটলারের নিকট পৃথিবী বিকাইয়া দেওয়া তাহা বুঝাইয়া আমরা যতদূর সম্ভব ব্যাপক যুদ্ধবিরোধী প্রচার চালাইয়াছিলাম।

"(২) সাম্রাজ্যবাদী গভর্নমেণ্টকে এক পাইও দিও না, একজন ভাইকেও দিও না—এই ধ্বনি তুলিয়া আমরা গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক প্রচার চালাইয়াছিলাম।

"(৩) শিল্পকেন্দ্রসমূহে শ্রমিক-সংক্রান্ত সমস্যা ও রাজনৈতিক সমস্যাকে ভিত্তি করিয়া আমরা বিরাট ধর্মঘটের স্রোত বহাইয়া দিলাম।

"(৪) আমাদের অধিকাংশ নেতাই এবং শত শত সাধারণ সভ্য ধরা পড়িয়াছিলেন, তথাপি আমরা নামেমাত্র কাজ না চালাইয়া পুরাদস্তুর সংগঠন বজায় রাখিয়া পুরাদমে কাজ চালাইয়াছি। এইভাবে আমরা জাতীয় জীবনে এক নতুন জিনিস দেখাইয়াছিলাম।"[৯]

কমিউনিস্ট পার্টির মতো সেই সময় সোস্যালিস্ট পার্টি, ফরওয়ার্ড ব্লক এবং উগ্রবাদী বিপ্লবীরাও তীব্রভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়ে তোলার পক্ষপাতী ছিল। কিন্তু কংগ্রেস ঐ সময়পর্বে ছিল সম্পূর্ণভাবে আপসপন্থী। বস্তুত, বিগত ছয় মাসের নিশ্চেষ্টতা ও অপেক্ষার কাল অতিবাহিত করে

১৯৪০-এর মার্চে রামগড়ে কংগ্রেসের যে জাতীয় সম্মেলন হয় তাতেও ব্রিটিশের সঙ্গে আপসের সুর ধ্বনিত। প্রধানত গান্ধীজীই ছিলেন এর প্রবক্তা। তিনি বিশ্বযুদ্ধকে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের সঙ্গে একত্রীভূত না করে শান্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করার পক্ষপাতী ছিলেন। কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আজাদ কিন্তু গান্ধীজীর অভিমতের বিরোধী ছিলেন। কংগ্রেসের জাতীয় সম্মেলনের পাশাপাশিই রামগড়ে ঐ একই সময়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল ফরওয়ার্ড ব্লকের 'আপস-বিরোধী সম্মেলন'!

যাহোক, কার্যত দেখা গেল রামগড় কংগ্রেসে 'সত্যাগ্রহ ও আইন-অমান্য আন্দোলনে'র সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও (পাশাপাশি গভর্নমেণ্টের সঙ্গে আপস-আলোচনাও চলবে এমন পথও খোলা রাখা হলো) গান্ধীজী মার্চ (১৯৪০) থেকে সেপ্টেম্বর মাস (১৯৪০) পর্যন্ত পুনরায় কংগ্রেস সংগঠনকে স্থবির ও অচল করে রাখলেন। ১৯৪০-এর ১৫ই সেপ্টেম্বর এ. আই. সি. সি-র বোম্বাই অধিবেশনে গান্ধীজীকে সংগ্রামের উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হলে তিনি তৎক্ষণাৎ ঘোষণা করেন:

"ব্যাপক আইন-অমান্য আন্দোলনের কোনো প্রশ্নই নাই। আমি এখনও নিশ্চিত নই—তবে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ চলিতে পারে। আমি এখনও একটা কিছু খুঁজিতেছি। এ পর্যন্ত আমি কিছুই খুঁজিয়া বাহির করিতে সমর্থ হই নাই।"[১০]

এ-প্রসঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক পি. সি. যোশীর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। কংগ্রেস নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট অভিযোগ করে তিনি বলেছিলেন:

> "কংগ্রেসের প্রধান নেতারা গণসংগ্রামের অস্ত্র ব্যবহার করিতে চাহেন না। তাঁহারা চাহেন বিনা সংগ্রামে যুদ্ধ সংকটের সুযোগ গ্রহণ করিয়া চড়া দর হাঁকিয়া সাম্রাজ্যবাদের নিকট সুবিধা আদায় করিতে।...আপস-রফাই এখনও নেতাদের নীতি, সংগ্রাম নহে। জনসাধারণের চাপে জাতীয় নেতৃত্ব যদি সংগ্রাম শুরু করিতে বাধ্যও হন তাহা হইলেও আপস-রফার অস্ত্ররূপে ব্যবহারের জন্য তাহাকে সীমাবদ্ধ রাখিবার চেষ্টা হইবে।"[১১]

কমিউনিস্ট পার্টি কিন্তু এই সময়ে তাদের সাংগঠনিক ক্ষমতাকে পূর্ণভাবে কাজে লাগায় ব্রিটিশ-বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ-বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার অব্যবহিত পরেই বোম্বাইয়ে যে শ্রমিক ধর্মঘট হয়, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রায় দেড় লক্ষ শ্রমিকের ৪০ দিন ব্যাপী সেই ধর্মঘট পরিচালনা করেছিল কমিউনিস্ট পার্টি। এ ছাড়া যুদ্ধের বিরুদ্ধে পার্টি ভারতের শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক প্রচার চালায়। ১৯৪০-এর বছরটি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ-বিরোধী প্রতিবাদ সভা ও বিক্ষোভ মিছিলে মুখর হয়ে ওঠে। বিহারের চিনি-কল শ্রমিক, কলকাতার ঝাড়ুদার, ঝরিয়ার কয়লাখনি শ্রমিক এবং সেই সঙ্গে সারা ভারত কিষাণসভা পরিচালিত কৃষকেরা তাদের অর্থনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ-বিরোধী আন্দোলনকে যুক্ত করে। একই সঙ্গে ফ্যাসিবাদের

বিরুদ্ধেও কমিউনিস্টরা ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর সাথে আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর ঘনিষ্ঠ মৈত্রী গড়ে তোলার কথা বলেছিলেন।

এ-প্রসঙ্গে প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা ই. এম. এস. নাম্বুদিরিপাদ বলেছেন:

"As distinct from the right-wing congress leaders, Bose and Jinnah, the communists had taken a stand which was simultaneonsly anti-fascist and anti-British. Theirs was an approach which linked together the objective of preventing the advance of fascism and strengthening the anti-British struggle.

"They opposed both the right-wing policy of bargaining with the British rule with the assistance of the fascist forces pursued by Bose. The method adopted by the communists to organise workers' strikes, peasants' struggle and other forms of revolutionary struggles and to link the Indian Independence struggle to the growing world movement against fascism."[১১]

বস্তুতপক্ষেই, কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে ব্রিটিশ ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে শ্রমিক-কৃষক সংগ্রাম সেই সময় জঙ্গীরূপ ধারণ করে। বিশেষ করে বামপন্থীদের শক্ত ঘাঁটি হিসাবে পরিচিত বোম্বে, বাঙলা, মাদ্রাজ, কেরল প্রভৃতি প্রদেশগুলিতেই এর ব্যাপকতা পরিলক্ষিত হয় সব থেকে বেশি। মার্চ, ১৯৪১-এ কেরালায় (উত্তর মালাবার) কৃষক-জমিদার রক্তাক্ত সংঘর্ষের পরিণামে ফাঁসি হয় চারজন তরুণের (কায়ুর শহীদবৃন্দ), যা সেই সময় সমগ্র ভারতবর্ষে তুমুল আলোড়ন তোলে। এছাড়াও বিহার ও অন্ধ্র প্রদেশের উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে, বিশেষ করে সাঁওতাল ও রাজবংশীদের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এবং জমিদার-বিরোধী শ্রেণী-আন্দোলন গড়ে তুলতে সমর্থ হয়। সব মিলিয়ে বলা যায়, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের এই পর্যায়ে কমিউনিস্টরা এক গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছিলেন।

এই সময়পর্বে কমিউনিস্ট পার্টির বাঙলা শাখার মুখপত্রের নাম ছিল— 'লালঝাণ্ডা'। এর মাধ্যমেই কমিউনিস্ট পার্টি সমস্ত পরিবহন শ্রমিকদের (রেল, বাস, ট্রাম, স্টীমার), জুটমিল কর্মচারীদের, বন্দর-শ্রমিক ও ছাত্রসমাজের উদ্দেশে একের পর এক আবেদন প্রচার করতে থাকে। সেই আবেদনে বলা হলো— সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় কোনো প্রকার সাহায্য নয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মেরুদণ্ড ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণী। এই যুদ্ধে ভারতীয় শ্রমিক-কৃষক কিংবা ছাত্র-যুবকের কোনো লাভ নেই। ব্রিটিশ সামাজ্যবাদকে আঘাত করার চরম সময় উপস্থিত। স্বাধীনতা ও বিপ্লব আসন্ন। সকলকে একসঙ্গে মিলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদকে শেষ মরণ আঘাত দিতে হবে। এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে স্বাধীনতার যুদ্ধে

পরিণত করো। আপসকামী বুর্জোয়া কংগ্রেস ধ্বংস হোক। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পদলেহী মুসলিম লীগ ধ্বংস হোক। এম. এন. রায় অনুগামী কংগ্রেসপন্থী কমিউনিস্টরা হলো ব্রিটিশদের দালাল—তারা ধ্বংস হোক। জনগণের শত্রু কংগ্রেস-সোস্যালিস্ট পার্টি ধ্বংস হোক। জনগণের ঐক্য জিন্দাবাদ ইত্যাদি।[১৩]

১৯৪০-এর বিভিন্ন সময়ে অসংখ্য আবেদন, প্রচারপত্র ও বেআইনী সংবাদপত্রের মাধ্যমে কমিউনিস্ট পার্টি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রচার-আন্দোলন সংগঠিত করত। ইতিমধ্যে ১৯৪১ সালের মধ্যভাগে বিশ্বযুদ্ধের গতি-প্রকৃতিও দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে যায়। ১৯৪১-এর ২২শে জুন হিটলারের নাৎসী বাহিনী অতর্কিতে সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণ করে। হিটলারের দোসর জাপানও হঠাৎ পার্লহারবারের উপর আক্রমণ চালিয়ে এশিয়া মহাদেশে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগুন ছড়িয়ে দেয়। এইসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মৌলিক পরিবর্তন ঘটে এবং সমগ্র বিশ্ব নতুন এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। যুদ্ধরত দেশগুলি দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে যায়। ফ্যাসিবাদী আর নাৎসীবাদী জার্মানী-ইতালি ও জাপানকে নিয়ে গঠিত হয় 'অক্ষশক্তি' নামে যুদ্ধজোট এবং এর বিরুদ্ধে ব্রিটেন-ফ্রান্স-সোভিয়েত ইউনিয়ন-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনকে নিয়ে গঠিত হয় 'মিত্রশক্তি' বা 'সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ' জোট। এর ফলেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চরিত্রগত পরিবর্তন ঘটে যায়। এই চরিত্রগত পরিবর্তন যেমন রণাঙ্গনেও প্রতিফলিত হলো তেমনি বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক দল এবং গণসংগঠনের সামনেও উপস্থিত করল পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রণনীতি ও রণকৌশল নির্ধারণের জন্য নতুনতর প্রশ্ন।

এই গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতিতে ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ভূমিকার উপর দৃষ্টিপাত করলে যেটা দেখা যাবে তা হলো—রামগড় অধিবেশনের (মার্চ, ১৯৪০) পর থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সঙ্গে আপসরফার চেষ্টা করে, যদিও কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আজাদ এক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করতেন। জয়প্রকাশ নারায়ণ, রামমনোহর লোহিয়া প্রমুখের নেতৃত্বে কংগ্রেস-সোস্যালিস্ট পার্টি এই সময় ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে উচ্ছেদের জন্য সশস্ত্র গণআন্দোলন পরিচালনার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। ফলে, কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গেও সোস্যালিস্ট পার্টির সম্পর্কের ক্রমাবনতি পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়া কমিউনিস্ট পার্টি পরিকল্পিতভাবে সোস্যালিস্ট পার্টির কর্মী, নেতৃত্ব ও ইউনিটগুলির একটা বড় অংশকে নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করে নিতে শুরু করার ফলেও এই সম্পর্কের অবনতি ঘটে। এইসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এবং অভ্যন্তরীণ চাপ ও ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের আপস-বিমুখতায় বাধ্য হয়েই গান্ধীজী অক্টোবর (১৯৪০) থেকে 'ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ' শুরু করার আহ্বান জানান। গান্ধীজী ও বিনোবা ভাবে ১৭ই অক্টোবর (১৯৪০) এবং ৩১শে অক্টোবর নেহরু ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ (যুদ্ধ-বিরোধী বক্তৃতা) করে কারাবরণ করেন। কিন্তু তৎকালীন গণমানস ছিল এতই অশান্ত যে, ১৯৪১-এর জুন মাসের মধ্যেই সারা ভারতে সত্যাগ্রহ করে

কারাবরণ করেন ২০ হাজার মানুষ।[১৪] এই পটভূমিকায় ব্রিটিশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় 'আটলান্টিক সনদ' (আগস্ট, ১৯৪১)। এতে বলা হয় যে, "সনদে স্বাক্ষরকারীরা বিশ্বের সকল মানুষের নিজস্ব সরকার গঠনের অধিকারকে স্বীকার করে নেবে এবং যারা এখনও স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত তাদের সার্বভৌম ক্ষমতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রদান করা হবে।"[১৫] কিন্তু তার ঠিক কয়েকদিন পরেই, ৯ই সেপ্টেম্বর (১৯৪১), ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল এক সরকারী ঘোষণায় বলেন: ভারত, বর্মা এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশ এই সনদের (আটলান্টিক চার্টার) আওতায় আসবে না। কারণ, নাৎসীশক্তির দ্বারা পদানত ইউরোপের জাতি ও রাষ্ট্রগুলির সার্বভৌমত্ব ও স্বাশাসনের ক্ষেত্রেই শুধু এই সনদ প্রযুক্ত হবে।

১৯৪১-এর ডিসেম্বরে জাতীয় কংগ্রেস সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বন্ধু রূপে অক্ষ শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলাকে নীতিগতভাবে সমর্থন করে। অবশ্য এই সমর্থন শর্তাধীন ছিল। 'ভারতের জাতীয় সরকার গঠিত হলে তবেই অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রশ্ন উঠতে পারে, কারণ কেবলমাত্র মুক্ত ও স্বাধীন ভারতই দেশের জন্য জাতীয় ভিত্তিতে প্রতিরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে'—এটাই ছিল জাতীয় কংগ্রেসের অভিমত। অবশ্য ফ্যাসিস্ত আক্রমণের বিরুদ্ধে এবং স্বাধীনতার জন্য যেসব দেশ লড়াই চালাচ্ছে তাদের সকলের প্রতি কংগ্রেসের প্রস্তাবে সহানুভূতি প্রকাশ করা হয়।

বস্তুত, ২৩শে-৩০শে ডিসেম্বর (১৯৪১) তারিখে বারদৌলিতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কিত আলোচনায় কংগ্রেসকে দ্বৈত-নীতি অনুসরণ করতে দেখা যায়। উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে গান্ধীজীকে সত্যাগ্রহ পরিচালনার দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেওয়ার ফলে কংগ্রেসে গান্ধীযুগের অবসান ঘটে।[১৬] আন্তর্জাতিক প্রশ্নে জহরলাল নেহরু ও মৌলানা আজাদ রাশিয়া, চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেনকে প্রগতিশীল রাষ্ট্রজোট রূপে অভিহিত করেন, কিন্তু তাঁরা ভারতের স্বাধীনতার বিনিময়েই শর্তাধীনে এই জোটকে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী যুদ্ধে সহায়তা করতে রাজী ছিলেন। অপরদিকে, রাজাগোপালাচারী ব্রিটিশের আপস-প্রস্তাবে রাজী হয়ে যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় গভর্নমেণ্টকে বিনাশর্তে সহায়তা প্রদানের কথা ঘোষণা করেন।

এই সময়কালেই আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট, চীনের জেনারেল চিয়াং-কাইশেক ও অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী যৌথভাবে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন—আটলান্টিক সনদ মেনে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দানের জন্য। এইভাবে মিত্রশক্তির চাপের মুখে এবং ভারতীয় সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহে তীব্র জাপানী আক্রমণের (১৫ই ফেব্রুয়ারি সিঙ্গাপুর, ৮ই মার্চ রেঙ্গুন এবং ২৩শে মার্চ আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের পতন ঘটে) ফলে ১১ই মার্চ ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করেন যে, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ মার্চ মাসেই ব্রিটিশ সরকারের সাংবিধানিক প্রস্তাবসহ

ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনার জন্য ভারতে উপস্থিত হবেন। ২৩শে মার্চ ক্রীপস্ মিশন দিল্লী পৌঁছে ভারতীয় নেতাদের কাছে যে প্রস্তাব দেন তাতে সেই সময়কালে ভারতে বিরাজিত রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের কোনো সম্ভাবনা ছিল না। কারণ, যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে জাতীয় সরকার গঠনের যে প্রস্তাব কংগ্রেস উত্থাপন করেছিল তার পরিবর্তে এই প্রস্তাবে যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্থিতাবস্থা বজায় রাখার কথাই বলা হয়। মোটকথা, ক্রীপস মিশনের প্রস্তাব কোনো রাজনৈতিক দলকেই সন্তুষ্ট করতে পারেনি। ১২ই এপ্রিল ক্রীপস্ ভারত ত্যাগ করেন। ক্রীপস্ মিশন কার্যত ব্যর্থই হয়।

১৯৪১ সালের ৩০শে ডিসেম্বর বারদৌলি অধিবেশনে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বলেছিলেন:

"ভারতের প্রতি ব্রিটেনের নীতির কোনো পরিবর্তন হয় নি, তথাপি যুদ্ধ—বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হওয়ায় এবং ভারতের নিকটে আসিয়া পড়ায় যে **নুতন বিশ্ব পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে** ওয়ার্কিং কমিটি তাহা পরিপূর্ণভাবে বিবেচনা করিবেন। যেসব জাতি আক্রান্ত হইয়াছে এবং স্বাধীনতার জন্ত সংগ্রাম করিতেছে কংগ্রেসের সহানুভূতি স্বতঃই তাহাদের প্রতি থাকিবে।"[১৭]

[বড় হরফ আমার]

কংগ্রেসের উপরোক্ত বক্তব্য থেকে এটা বলা যায় যে, যুদ্ধের চরিত্র-বিচারে কমিউনিস্ট পার্টির দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে জাতীয় কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গির তেমন কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। বিশেষকরে নেহরু এবং আজাদ যুদ্ধকে একটি আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার করেছিলেন। ক্রীপস মিশন যদি ব্যর্থ না হতো, তাহলে হয়তো কংগ্রেসও 'জনযুদ্ধে'-র নীতিকেই গ্রহণ করত। কিন্তু ক্রীপস্ মিশনের ব্যর্থতার পরে সে প্রশ্ন অবান্তর হয়ে যায়। গান্ধীজী এবং বল্লভভাই প্যাটেলের মতো দক্ষিণপন্থী নেতারা অতঃপর দেশের গণ-অসন্তোষকে কাজে লাগিয়ে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের উপর চাপ সৃষ্টির রণকৌশল গ্রহণ করেন। নেহরু এবং আজাদ ভিন্ন মত পোষণ করলেও এক্ষেত্রে তাঁদের অন্য কিছু করার থাকে না।[১৮]

১৯৪১-সালের ২২শে জুন হিটলারের নাৎসীবাহিনী সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করার পরেই কমিউনিস্ট পার্টির (বে-আইনী ঘোষিত) অভ্যন্তরেও যুদ্ধের চরিত্র সম্পর্কে নব মূল্যায়ন ও তীব্র বিতর্ক শুরু হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা সরোজ মুখার্জি লিখেছেন:

"সমগ্র পার্টিতে যুদ্ধের বর্তমান চরিত্র ও আমাদের কর্তব্য কি—এ সম্পর্কে রাজনৈতিক আলোচনা শুরু হয়। প্রত্যেক কমিটিকে ও নেতাকে নির্দেশ দেওয়া হয়—নিজ নিজ মতামত লিখে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় কমিটির কেন্দ্রে পাঠিয়ে দাও। বেশ মনে আছে জ্যোতি বসু প্রমুখ যাঁরা প্রকাশ্যে ছিলেন তাঁরাও নিজ নিজ মতামত লিখে গোপন কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেন। আমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ

অভিমত লিখে পাঠাই। দেউলীতে বন্দীরা একত্রে বসে আলোচনা করে একটি দলিল রচনা করেন। বি. টি. রণদিভেই মূলতঃ এই দলিল লেখেন এবং বোম্বাই কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেন। এস. এ. ডাঙ্গে, অজয় ঘোষ প্রমুখ প্রত্যেকে নিজ নিজ অভিমত লিখিতভাবে পাঠিয়ে দেন। এইভাবে আলোচনা ও লিখিত মতামতের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় কমিটি জনযুদ্ধের নীতি গ্রহণ করে। ইতিমধ্যে অবশ্য লণ্ডন থেকে ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির মতামত পার্টি'র কেন্দ্রীয় কমিটির হাতে এসে যায়।"[১৯]

এর থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, 'জনযুদ্ধ'-সংক্রান্ত একটা নীতি এবং আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গিও সেই সময় বিশ্ব-কমিউনিস্ট আন্দোলনে সক্রিয় ছিল। তাছাড়া পার্টি'র অভ্যন্তরেও এই নতুন লাইন নিয়ে তীব্র বিতর্ক চলেছিল। অন্য একজন প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা এ-প্রসঙ্গে যা বলেছেন তার সঙ্গে সরোজ মুখার্জির বক্তব্যের অমিল সামান্যই। শ্রী মুখার্জি বলেছিলেন, 'দেউলী দলিলে'র খসড়া রচনা করেন 'মূলতঃ রণদিভে'।[২০] অপর দিকে এ-প্রসঙ্গে রণেন সেন লিখেছেন:

"দেউলী জেলে এই দলিলের খসড়া প্রণয়ন করেন রণদিভে ও ডাঙ্গে। দলিলটি নিয়ে দেউলী ও বাইরে প্রচণ্ড বাদবিতর্ক হয়। শেষ পর্যন্ত যোশী ও অধিকারীর নেতৃত্বে যে মূল পার্টি কেন্দ্র গোপনে কাজ করছিল—সেটিও মোটামুটি ঐ লাইনই গ্রহণ করে।

"যোশী ঐ লাইনকে আরো সুদৃঢ় ও গ্রহণযোগ্য করে একখানা বই লেখেন "ফরোওয়ার্ড টু ফ্রিডম"। অর্থাৎ, স্বাধীনতার দিকে আগুয়ান হও। আমরা জেল থেকে বেরিয়ে ঐ বইটি পড়ি। পার্টি এ সবের ফলে জনযুদ্ধের নীতি গ্রহণ করল।"[২১]

জনযুদ্ধের নীতি নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি'র মধ্যে যে প্রচণ্ড তর্ক-বিতর্ক হয় তার প্রমাণ হলো সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হওয়ার পর (২২শে জুন, ১৯৪১) প্রায় ৬ মাস সময় লেগে যায় 'জনযুদ্ধের নীতি'-কে পার্টি লাইন রূপে ঘোষণা করতে। এর প্রধান কারণ তিনটি:

১) কমিউনিস্ট পার্টি'র অধিকাংশ সদস্যই ছিলেন তীব্রভাবে ব্রিটিশ-বিরোধী এবং এই যুদ্ধের সুযোগে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ভারতের মাটি থেকে চিরতরে উচ্ছেদের জন্য তাঁরা ছিলেন কৃতসংকল্প। সুতরাং আন্তঃপার্টি বিতর্ক ছিল তীব্র।

২) 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক'-এর সঙ্গে ভারতীয় কমিউনিস্টদের পক্ষে যোগাযোগ রক্ষাকারী ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির কাছ থেকে এ-দেশে নির্দেশ পৌঁছাতে যথেষ্ট বিলম্ব ঘটে।

(৩) পার্টি'র নেতৃত্ব ও সদস্যদের প্রায় প্রত্যেকেই তখন ছিলেন হয় কারাগারে, নয় আণ্ডার গ্রাউণ্ডে। এঁদের পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগেরও ছিল একান্ত অভাব।

যাহোক, ৩রা জুলাই (১৯৪১) মার্শাল স্তালিন তাঁর যেই ঐতিহাসিক বেতার

ভাষণেই সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 'জনযুদ্ধে'-র নীতি ঘোষণা করেন। তিনি বলেন :

"ফ্যাসিস্ট জার্মানীর বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ কোনো সাধারণ যুদ্ধ নয়, এটা শুধু দুটি সেনাবাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ নয়, এ হল জার্মান ফ্যাসিবাহিনীর বিরুদ্ধে সমগ্র রুশ জনগণের মহান যুদ্ধ। জনগণের এবং স্বদেশপ্রেমী এই যুদ্ধের লক্ষ্য কেবল আমাদের দেশকে বিপদমুক্ত করা নয়, জার্মান ফ্যাসিবাদের পরাধীনতায় আবদ্ধ সমস্ত ইউরোপীয় জনগণকে সাহায্য করাই এই যুদ্ধের লক্ষ্য।

"...মানুষের স্বাধীনতা হরণ, তাকে দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হিটলারের ফ্যাসিবাহিনীর এই অভিযানের যাঁরা বিরোধী ও স্বাধীনতার যাঁরা সমর্থক তাঁরা সকলেই এই দলে মিলিত হবেন।"[২২]

এর কিছুদিন পরেই দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার শেষে ১৯৪১ সালের ১২ই জুলাই মস্কোতে ঐতিহাসিক 'ইঙ্গ-সোভিয়েত চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির দুটি প্রধান শর্তই ছিল : ১) নাৎসী জার্মানীর বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে উভয় সরকারই সর্বতো-ভাবে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা করবে। ২) যুদ্ধ চলাকালে পারস্পরিক সম্মতি ব্যতিরেকে কোনো সরকারই নাৎসী জার্মানীর সঙ্গে এককভাবে যুদ্ধবিরতি বা সন্ধিচুক্তি করতে পারবে না।

বলাবাহুল্য, এই সব ঘটনায় যুদ্ধের সামগ্রিক চরিত্রে একটা গুণগত পরিবর্তনের সূচনা হয় ; যুদ্ধ ক্রমশই এক সর্বাত্মক ফ্যাসি-বিরোধী সংগ্রামের দিকে পরিণতি লাভ করতে থাকে।

আশ্চর্যের বিষয় হলো, বিশ্ব-ইতিহাসের এত বড় একটা তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করার দূরদৃষ্টি বেশিরভাগ কংগ্রেসী নেতারই ছিল না। তাই সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হওয়ার পরে অন্তত বারদৌলি অধিবেশনের (ডিসেম্বর, ১৯৪১) পূর্বে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি সহমর্মিতা বা সহানুভূতি জ্ঞাপনের কোনো প্রচেষ্টাই দেখা যায় নি। এমন বড় একটা ঘটনায় গান্ধীজীর প্রথম প্রতিক্রিয়া কী হয়েছিল—সে সম্পর্কে গান্ধীজীর জীবনীকার তেণ্ডুলকর বা কংগ্রেসের ইতিহাস-প্রণেতা ড. সীতারামাইয়া একটি কথাও বলেন নি। তাছাড়া ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ[২৩] বা আচার্য কৃপালনীর[২৪] কাছেও হিটলারের রাশিয়া আক্রমণ ছিল ফ্রান্সের পতনের মতনই নিছক সামরিক অর্থেই এক বৃহত্তম ঘটনা। এ ছাড়া এই আক্রমণের অন্য কোনো বিশেষ রাজনৈতিক তাৎপর্য কিংবা গুরুত্ব তাঁরা অনুধাবন করে উঠতে ব্যর্থ হন।

কিন্তু অত্যাশ্চর্যের বিষয়, সর্বপ্রথম যিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধ নাৎসী আক্রমণের প্রকৃত তাৎপর্যটি অনুধাবন করে এর বিরুদ্ধে দৃঢ়কণ্ঠে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন তিনি কিন্তু কমিউনিস্ট ছিলেন না। যতদূর জানা যায়, পাঞ্জাবের বিখ্যাত বিপ্লবী ও বামপন্থী কংগ্রেস নেতা মাস্টার রাজারামই (প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রাক্তন সম্পাদক) ১৯৪১-এর ২৭শে জুন সর্বপ্রথম এক দীর্ঘ বিবৃতিতে নাৎসীদের

রাশিয়া আক্রমণের তীব্র নিন্দা করেন এবং রাশিয়ার উপর এই আক্রমণকে সমগ্র বিশ্বের কৃষক এবং নিপীড়িত জনগণের উপর ঘৃণ্য আক্রমণ বলেই চিহ্নিত করেন।[২৫]

এ-প্রসঙ্গে আরও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা আমরা স্মরণ করতে পারি। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সোস্যালিস্টরাই সর্বপ্রথম এক বিবৃতিতে (২৯ জুন, '৪১) 'এই যুদ্ধকে জনযুদ্ধে পরিণত কর' (Make it People's war), এই আবেদন জানান। 'হিন্দুস্তান স্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকায় সংক্ষিপ্তাকারে উক্ত বিবৃতির নিম্নলিখিত রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়:

> "Hitler's attack on Russia is clear proof of his thrust to dominate the world and to destroy freedom of the peace loving countries", says an appeal issued by the Frontier Socialists, who urge the peoples to mobilise and make the present war a Peoples' war."[২৬]

যাহোক, কমিউনিস্ট পার্টির বিভিন্ন প্রাদেশিক কমিটি ও তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন গণসংগঠনগুলি নাৎসীবাহিনী কর্তৃক সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠলেও, সামগ্রিকভাবে 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ-বিরোধী' পুরনো লাইনকে পরিত্যাগ করে দ্রুততার সঙ্গে 'জনযুদ্ধে'র লাইন গ্রহণ করতে সক্ষম হয় না।

ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের স্বরাষ্ট্রদপ্তরের এক গোপন দলিলে (হোম/পোল/১৯৪১: এফ ১৪/২৬) দেখা যায় যে, অমৃতসরের ভারতীয় কমিউনিস্ট আচ্ছার সিং ছিনা (ইনি ১৯৩৪-৩৫ সালেই প্রথম মস্কো পৌঁছান 'ইনস্টিট্যুট অফ মার্কসিজম্-লেনিনিজম্'-এ শিক্ষা লাভের জন্য)[২৭] ১৯৪০ সালে রাশিয়ায় যান ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সামরিক সাহায্য লাভের আশায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হওয়ার পরেই তিনি ভারতে ফিরে আসেন 'কমিণ্টার্নের' (তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক) এক বিশেষ বার্তা নিয়ে, যাতে ভারতীয় কমিউনিস্টদের 'জনযুদ্ধে'-র নীতি গ্রহণ এবং বিশ্ব-ফ্যাসিবাদকে ধ্বংস করার জন্য ব্রিটিশ যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে সাহায্য করতে নির্দেশ প্রেরণ করা হয়েছিল। কিন্তু পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী থেকে মনে হয়, আচ্ছার সিং হয়তো পাঞ্জাব বা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল ছাড়া ভারতের অন্যান্য অংশের কমিউনিস্টদের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দিতে পারেন নি। কারণ, তিনি ভারতে ফিরেই গ্রেপ্তার হয়ে হন। তাছাড়া প্রাসঙ্গিক তথ্যসমূহ থেকেও দেখা যায় যে, 'জনযুদ্ধ'-সংক্রান্ত ব্যাখ্যা ও নির্দেশের জন্য ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি তখন ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক হ্যারি পলিটের উপরই বেশি নির্ভরশীল ছিল। এছাড়া এটাও জানা যায় যে, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের স্বরাষ্ট্রদপ্তর আচ্ছার সিং ছিনাকে মুক্তি দিয়ে অথবা বিভিন্ন জেলে কমিউনিস্টদের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে 'ভারতীয় কমিউনিস্টদের উদ্দেশে মস্কোর গোপন বিবৃতি' প্রচারে আগ্রহ দেখিয়েছিল; কিন্তু কার্যত নানা কারণে তা স্থগিত থাকে।[২৮]

যাহোক, ব্যাপক আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতেই ডিসেম্বরের শেষদিকে (১৯৪১) কমিউনিস্ট পার্টি 'জনযুদ্ধে'-র লাইন গ্রহণ করে। এই নীতি প্রথম ঘোষিত হয় পাটনায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের সর্বভারতীয় সম্মেলনে। কমিউনিস্ট ছাত্রনেতৃবৃন্দই সম্মেলনের মঞ্চ থেকে 'জনযুদ্ধে'র নতুন লাইন ঘোষণা করেন। বস্তুত, সম্মেলনে এই নতুন নীতি প্রচার করার দায়িত্ব দিয়েই অধ্যাপক হীরেন মুখোপাধ্যায় সহ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছাত্রনেতৃত্বকে পাটনায় প্রেরণ করা হয়েছিল।[২৯]

ইতিমধ্যেই ১লা ডিসেম্বর (১৯৪১) কমিউনিস্ট পার্টির গোপনীয় এক পার্টি চিঠিতে (বিজ্ঞপ্তি নং ৫৪) 'ফ্যাসিবাদের পরাজয় ঘটানোর জন্য পার্টির উদ্দেশে কমরেড পলিটের আবেদন'—এই শিরোনাম দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির দীর্ঘ বক্তব্য পেশ করা হয়। উক্ত আবেদনটি কমিউনিস্ট পার্টি অফ গ্রেট ব্রিটেনের পক্ষ থেকে প্রথম প্রচারিত হয় সোভিয়েত রাশিয়া আক্রান্ত হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই (৮ই জুলাই, ১৯৪১)। এই আবেদনে কেন হিটলারের পতনের জন্য সংযুক্ত জাতীয় ফ্রন্ট গড়ে তোলার প্রয়োজন তা হ্যারি পলিট ব্যাখ্যা করেন।[৩০]

এরপরেই কমিউনিস্ট পার্টি তাদের সদস্যদের কাছে প্রচারিত গোপনীয় আর একটি পত্রে (পার্টি চিঠি নং ৫৫) যুদ্ধ-সম্পর্কে নিজেদের নতুন 'জনযুদ্ধ' লাইনটিকে ব্যাখ্যা করেন।[৩১] এছাড়া দেউলী বন্দীশিবির থেকেও জনযুদ্ধের লাইনকে সমর্থন করে কমিউনিস্ট বন্দীদের নামে 'হিটলারের ফ্যাসিবাদ-বিরোধী জনযুদ্ধ' শীর্ষক একটি দলিল প্রকাশিত হয় (হোম/পোল/১৯৪২ : এফ ৪৪/৩২)।[৩২] এই দলিল থেকেই বোঝা যায় যে, জনযুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় কমিউনিস্ট পার্টির অংশগ্রহণ করা শর্তহীন ছিল না।

এই সময় কমিউনিস্ট পার্টি জনযুদ্ধের নীতি গ্রহণের শর্ত হিসাবে ব্রিটিশ সরকারের কাছে যেসব দাবী উত্থাপন করে সেগুলির মূলকথা হলো :

১) ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অধিকারকে স্বীকার করতে হবে।

২) গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহ প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং সকল রাজবন্দীকে মুক্তি দিতে হবে।

৩) জনগণের প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে হবে, যাতে জনসাধারণের ন্যূনতম চাহিদাসমূহ পূর্ণ করা যায়। যুদ্ধের ব্যয়ভার সাধারণ শ্রমিক-কৃষকের উপর থেকে তুলে নিয়ে ধনীদের উপর চাপাতে হবে এবং ন্যাশনাল কংগ্রেস, ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষকসভা, মুসলিম লীগ প্রভৃতির দ্বারা অনুমোদিত এক সর্বসম্মত জাতীয় দাবি-সনদ ব্রিটিশ সরকারকে মেনে নিতে হবে, তবেই তারা হিটলারের ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সকলের সমর্থন আদায় করবে।[৩৩]

২. জনযুদ্ধের পর্যায়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রাসঙ্গিক ভূমিকা :

কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক 'জনযুদ্ধের'-র নীতি গৃহীত হওয়ার পর থেকেই সাময়িক-

ভাবে থমকে-যাওয়া (১৯৩৯-৪০) ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলন পূর্বের তুলনায় চতুর্গুণ গতিবেগ নিয়ে পুনর্বার সারা ভারত জুড়ে আত্মপ্রকাশ করে। বলাবাহুল্য, এর মূল চালিকাশক্তি ছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন গণসংগঠনগুলি। কিন্তু ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল সেই সময় অত্যন্ত জটিল। জাতীয় কংগ্রেস আক্রান্ত সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হলেও কমিউনিস্টদের 'জনযুদ্ধে'র তত্ত্ব বর্জন করে। অপরদিকে, সোস্যালিস্ট পার্টি ও ফরওয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি দলগুলি এত তীব্রভাবে ব্রিটিশ-বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করে যে কার্যত তারা ফ্যাসিস্ত শক্তিরই সমর্থকে পরিণত হয়। এছাড়া ব্রিটিশদের প্রতি সম্পূর্ণ অনুগত আর এক ধারার রাজনৈতিক দল ছিল, এরা নিজ স্বার্থে ব্রিটিশদের বিনাশর্তে সমর্থন করতে থাকে। এই দলগুলির মধ্যে ছিল রায়পন্থী 'র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি', 'ইণ্ডিয়ান ফেডারেশন অফ লেবর', 'মুসলিম লীগ,' 'হিন্দু মহাসভা,' 'রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ' (আর. এস. এস.) প্রভৃতি দল। বস্তুত, এদের অনেকেরই ফ্যাসিস্ত-বিরোধিতা ছিল তাৎক্ষণিক সুযোগ-সন্ধানী মুখোশ মাত্র। সুতরাং 'জনযুদ্ধে'র পর্যায়ে বাঙলা তথা ভারতবর্ষের ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনের প্রকৃত তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করতে হলে উল্লিখিত রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠীসমূহের কার্যধারা ও ভূমিকা সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে হলেও কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

জাতীয় কংগ্রেস :

ক্রীপস মিশন ব্যর্থ হওয়ার অল্পকাল পরে (এপ্রিল, ১৯৪১) একদিকে যেমন সোভিয়েত রাশিয়া এবং আমেরিকা নাৎসী জার্মানী ও ফ্যাসিস্ত জাপান কর্তৃক আক্রান্ত হয়, অন্যদিকে তেমনি ভারতীয় সীমান্তের উপরও জাপবাহিনীর আক্রমণ শুরু হয়ে যায়। ফলত, জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরেও শুরু হয়ে যায় নানা পরস্পর-বিরোধী দ্বন্দ্ব। আমরা জানি, ক্রীপস মিশন ব্যর্থ হওয়ার ঠিক পরেই মাদ্রাজের কংগ্রেস নেতা চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারির নেতৃত্বে কংগ্রেসের একটা গোষ্ঠী ভারতবর্ষে জাপ-আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য মুসলিম লীগকে সঙ্গে নিয়ে এবং মুসলিম সংখ্যা-গরিষ্ঠ প্রদেশগুলিকে স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার দিয়ে একটি জাতীয় ফ্রন্ট গঠনের প্রস্তাব দেন। এর উদ্দেশ্য ছিল—ব্রিটিশের যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে বিনাশর্তে সহযোগিতা করা। কিন্তু কংগ্রেসে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে (মে, ১৯৪১) এই প্রস্তাব ১২০/১৫ ভোটে বাতিল হয়। ক্ষুব্ধ রাজাগোপালাচারি এর ফলে কংগ্রেস থেকে পদ-ত্যাগ করেন।[৩৪]

মৌলানা আজাদও মুসলিম লীগের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ফ্যাসিস্ত-শক্তির বিরোধিতা করার জন্য একটি জাতীয় ফ্রন্ট গঠনে আগ্রহী ছিলেন। এই জটিল সময়ে, ১৯৪১-এর ডিসেম্বর থেকে, গান্ধীজীর হাতেই আবার শেষ বারের মতো সমর্পণ করা হয় কংগ্রেসকে নেতৃত্বদানের দায়-দায়িত্ব। তৎকালীন রাজনৈতিক

পরিস্থিতিতে গান্ধীজী যে শান্তিবাদী নীতি গ্রহণ করেন তার সারমর্ম হলো: ১) জাপানের বিরুদ্ধে অহিংস অসহযোগ ২) ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অসহযোগিতা ৩) ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে মিত্রপক্ষকে নৈতিক সমর্থন ৪) ভারতবর্ষকে সশস্ত্র ও হিংস্র সংঘর্ষ থেকে রক্ষা করা। প্রকৃতপক্ষে, এই চতুর্থ নীতিটি জাপানীদের বিরুদ্ধে গেরিলা-যুদ্ধ ও পোড়ামাটির রণকৌশল গ্রহণের নেহরু-নীতির বিরুদ্ধেই গৃহীত হয়েছিল।[৩৫] ৩রা ও ১০ই মে (১৯৪১) তারিখে তিনি লিখছেন, ভারতে ব্রিটেনের উপস্থিতিই যেন জাপানকে কার্যত ভারত আক্রমণ করতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। একমাত্র ব্রিটেনের অনুপস্থিতিই জাপানী আক্রমণের হাত থেকে ভারতকে রক্ষা করতে পারে। ব্রিটিশরা চলে যাবার পরেও যদি জাপান ভারত আক্রমণ করে তবে ভারতীয়রা তা অহিংসভাবে প্রতিরোধ করবে।[৩৬] মোটকথা, সেদিন নেহরু, আজাদ, রাজাগোপালাচারি প্রমুখ কংগ্রেস-নেতৃত্ব গান্ধীজীর এই পরিকল্পনাকে নেহাতই কল্পনাবিলাস বলে মনে করেছিলেন।

তৎকালীন রাজনৈতিক ঘটনাবলী পর্যালোচনা করলে একথা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ক্রীপস মিশনের ব্যর্থতা আপসকামী কংগ্রেসের নেতৃত্বকে যে হতাশার মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল গান্ধীজী তার থেকে বেরিয়ে আসার জন্য পথ খোঁজার চেষ্টায় রত ছিলেন। ঐ সময়ে বিরাজিত যুদ্ধ-পরিস্থিতিতে ব্রিটেনের সংকটের সুযোগে তিনি দরকষাকষির ক্ষমতা বৃদ্ধি করে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের একটা চেষ্টা করেছিলেন মাত্র। প্রকৃত গণআন্দোলন গড়ে তোলার ইচ্ছা তাঁর কোনোকালেই ছিল না। বিক্ষুব্ধ জনতার সশস্ত্র অভ্যুত্থান গান্ধীজীর সত্যাগ্রহনীতির সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল। বস্তুত, ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৪০-এর সেপ্টেম্বরের মধ্যে গান্ধীজী কোনো গণআন্দোলনকেই সমর্থন করেননি। অবশ্য এটাও বলা যেতে পারে, গান্ধীজীর আশা ছিল ক্রীপস্ মিশন হয়তো ভারতীয়দের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা দেবে। সুতরাং সেটা ব্যর্থ হওয়ার পর তিনি মরীয়া হয়ে ওঠেন এবং শেষপর্যন্ত 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' আওয়াজ তুলতে বাধ্য হন।

৬ই জুলাই তারিখে (১৯৪২) ওয়ার্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির একটি বৈঠকে গান্ধীজী 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলনের প্রস্তাব দেন। তিনি বলেন, সীমান্তে জাপানীরা এসে গেছে এবং এইসময় যদি একটি অহিংস আন্দোলন গড়ে তোলা যায় তাহলে ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসের সঙ্গে চুক্তিতে আসতে বাধ্য হবে। আজাদ ও নেহরু গান্ধীজীর এই বক্তব্য অনুমোদন করেননি; কেননা তাঁদের মতে এ রকম আন্দোলন শুরু করার জন্য যে-প্রস্তুতির দরকার তা তখন কংগ্রেসের ছিল না। সর্বোপরি, ব্যক্তিগতভাবে অনেকেই ছিলেন যুদ্ধকালীন সময়ে ব্রিটিশের সঙ্গে সহযোগিতার নীতিতে বিশ্বাসী।[৩৭] কিন্তু শেষ পর্যন্ত গান্ধীজীরই জয় হলো। ১৪ই জুলাই তারিখে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের প্রস্তাব মেনে নিল। বিষয়টি অনুমোদনের জন্য নিখিল ভারত কংগ্রেসের অধিবেশন আহ্বান করা হলো—৭ই আগস্ট (১৯৪২); আর বোম্বাই অধিবেশনেই ৮ই আগস্ট ঐ প্রস্তাবটি গৃহীত হলো।[৩৮]

অতঃপর ৮ই আগস্ট মধ্যরাত্রেই গান্ধী, আজাদ, নেহরু, প্যাটেল সহ কংগ্রেসের উচ্চস্তরের প্রায় সকল নেতাকেই গ্রেপ্তার করা হয়। এক সপ্তাহের মধ্যেই প্রদেশ, জেলা ও আঞ্চলিক স্তরে কর্মরত কংগ্রেস সংগঠনের অসংখ্য নেতা এবং কর্মীও বন্দী হন ব্রিটিশ সরকারের হাতে। সরকারের তরফ থেকে ঘোষণা করা হয় যে, ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধান্তে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দানের প্রশ্নটি বিবেচনা করতে রাজী থাকলেও, কংগ্রেস যুদ্ধকালীন সংকটাবস্থার সুযোগ নিয়ে হঠকারী আন্দোলন চালাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কাজেই যে-কোনো মূল্যে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সরকার দৃঢ় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বাধ্য। বড়লাটের কার্যনির্বাহক পরিষদ এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেছিল।[৩৯]

৯ই আগস্ট (১৯৪২) প্রভাতেই কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের সংবাদ প্রকাশের পরেই শুরু হয়ে গেল দেশের বিভিন্ন প্রান্তে 'আগস্ট-আন্দোলনে'র জোয়ার। বিভিন্ন স্থানে প্রশাসনকে সম্পূর্ণ পঙ্গু করে দেওয়া হলো। রেলপথ, সেতু, যোগাযোগের মাধ্যমগুলিকে ধ্বংস করা হতে লাগল। ব্রিটিশ সামরিক উপকরণ ও বাহিনীর চলাচলে অন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্ম পরিচালনা করে বিপুল ক্ষয়-ক্ষতি ঘটানো হলো। বিশেষ করে বিহার ও বাঙলাতেই আগস্ট-আন্দোলনের উত্তাল ঢেউ সব থেকে তীব্রভাবে আত্মপ্রকাশ করে। বাঙলায় গঠিত হয় তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার। তমলুক মহকুমা (মেদিনীপুর জেলা) কার্যত স্বাধীন হয়ে যায়।[৪০] জামসেদপুরে টাটা কোম্পানীর (যুদ্ধের উপকরণ উৎপাদনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কারখানা) কুড়ি হাজার শ্রমিক ধর্মঘট করে, এমনকি জামসেদপুরের পুলিশ বাহিনীও ধর্মঘটে সামিল হয়। এর ফলে অবস্থা অত্যন্ত ঘোরালো হয়ে ওঠে। বহুস্থানে তীব্র কৃষক-আন্দোলনও আত্মপ্রকাশ করে।[৪১]

সন্দেহ নেই যে, ব্রিটিশ সরকার নির্মম দমননীতির মাধ্যমে পাশবিকভাবে এই আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেয়। ১৯৪৩-এর ১৯শে ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় আইন সভায় একটি সরকারী ঘোষণায় বলা হয়, শুধু '৪২-এর ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যেই পুলিশের গুলিতে ৯৪০ জন মারা যায় এবং আহত হয় ১৬৩০ জন। আর, গ্রেপ্তার হন ৬০,২২৯ জন নেতা ও কর্মী। নেহরুর মতে গুলিতে মৃত্যুর সংখ্যা হলো ১০ হাজারের কাছাকাছি।[৪২]

আমরা জানি, আগস্ট-আন্দোলন চলাকালেই কংগ্রেস নেতাদের বৃহত্তর অংশ কারারুদ্ধ হয়েছিলেন এবং জাতীয় কংগ্রেসকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়। তাই প্রধানত স্থানীয় নেতৃত্বের উপর নির্ভর করেই গড়ে উঠেছিল এই স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন। কংগ্রেস এবং কংগ্রেস সমর্থকেরা এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করলেও সরকারীভাবে এই আন্দোলনের, এই সহিংস অভ্যুত্থানের দায়-দায়িত্ব কিন্তু কংগ্রেস গ্রহণ করেনি। গান্ধীজী কতদূর যেতে রাজী ছিলেন সেকথা সঠিকভাবে বলা সম্ভব-পর না হলেও বিভিন্ন নেতাদের বক্তব্য থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, গান্ধীজীর 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' স্লোগানটি তাঁর অহিংস-ধর্মের বাইরে চলে যাক—এটা তিনি

চাননি। ১৯৪২-এর ২৩শে সেপ্টেম্বর ভাইসরয়ের কাছে এবং ১৯৪৩-এর ১৫ই জুলাই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে লিখিত পত্রেই গান্ধীজীর এই মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।[৪৩] এরপর ১৯৪৫-এর ২১শে সেপ্টেম্বর কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জওহরলাল নেহরু, বল্লভভাই প্যাটেল ও গোবিন্দবল্লভ পন্থ-র স্বাক্ষরিত একটি বিবৃতিতে বলা হয় যে, "কংগ্রেস অথবা গান্ধীজীর পক্ষ থেকে আদৌ আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো আন্দোলনই শুরু করা হয়নি।"[৪৪]

প্রকৃতপক্ষে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রকৃতি ও চরিত্র সম্পর্কে জাতীয় কংগ্রেস নতুন কোনো মূল্যায়ন করেনি। কিন্তু জওহরলাল নেহরু কমিউনিস্ট পার্টির 'জনযুদ্ধ'-তত্ত্বকে গ্রহণ না করলেও, নিঃসন্দেহে এই পর্যায়ের যুদ্ধকে তিনি ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্তর্জাতিক ও জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই বিচার করেছিলেন। ক্রীপ্‌স্‌-দৌত্য ব্যর্থ হওয়ার পর ১২ই এপ্রিল (১৯৪২) নেহরু এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন যে, "ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ভারত সম্পর্কে যাই ভাবুন না কেন, ভারত জাপ-আক্রমণের দ্বারা বিপন্ন বলে ব্রিটেন ও আমেরিকার যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় আমরা সম্পূর্ণ সহযোগিতা করব। উৎপাদন-ব্যবস্থা পুরোদমে চালু রাখব।"[৪৫]

ওই একই সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি সুভাষচন্দ্র বসুর ভূমিকা সম্পর্কে বলেন : "যেপথ তিনি (বসু) বেছে নিয়েছেন, তা সর্বতোভাবে ভুল। তাকে আমরা যে শুধু গ্রহণ করতে পারি না তাই নয়, তা যদি মূর্তি পরিগ্রহ করে, তা হলে তাকে রুখতেই হবে। তার কারণ এই যে বাইরে থেকে যে শক্তিই আসুক না কেন, তা আসবে একটা সাজপোশাক পরা পুতুলের মতন। জাপানীরাই তার উপর কর্তৃত্ব করবে। আসলে তা আক্রমণকারীকেই সাহায্য করবে।"[৪৬]

এর মাস তিনেক পরেই নেহরুজী তৎকালীন ভারতীয় পরিস্থিতি সঠিকভাবে অনুধাবন করে বলেন :

"গত তিন চার মাস ধরে আমরা দেশে জাপানীদের অনুকূলে একটি সুস্পষ্ট মনোভাবের বিরুদ্ধে লড়িতেছি। এ মনোভাব বাস্তবিকই জাপানীদের অনুকূলে নয়। কিন্তু ইংরাজ-বিদ্বেষ এখানে এত তীব্র যে জাপানীদের পক্ষে একটা ঝোঁক এসে যায়। আমরা চাই না যে ভারতবর্ষকে নিষ্ক্রিয়তার মনোবৃত্তিতে পেয়ে বসে। জাপানের সঙ্গে শান্তি স্থাপনের কথাবার্তা হলো মতিভ্রমের পরিচায়ক।"[৪৭]

সন্দেহ নেই যে, গান্ধীজীর নীতিকে এর মাধ্যমে নেহরু একটু পরোক্ষভাবেই আক্রমণ করেছিলেন। এর কিছু পূর্বেই নেহরু আবার জাপ-ফ্যাসিবাদকে সশস্ত্রভাবে প্রতিরোধের প্রস্তাব দিয়ে বলেছিলেন :

"আত্মরক্ষা এবং আত্মনির্ভরতার কর্মসূচী অনুসারে চূড়ান্তভাবে কাজ করাই হলো আমাদের কতব্য, প্রত্যেক কংগ্রেস সদস্যের কর্তব্য এবং অন্যান্য সকলের কর্তব্য। এমনও হতে পারে যে, আমাদের গেরিলাযুদ্ধ চালাতে হবে। কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত কী হবে তা জানি না। কিন্তু···সাধারণভাবে আমার পরামর্শ

হলো এই : বশ্যতা স্বীকার কোরো না, শত্রুকে কোনো জিনিস সরবরাহ কোরো না, আক্রমণকারীর প্রতি অসহযোগ নীতি প্রয়োগ করো, সকল উপায়ে তাকে বিব্রত করো। সশস্ত্র সেনাবাহিনী রণক্ষেত্রে সংগ্রাম চালাইবে।"৪৮

জওহরলাল নেহরুর বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি আমরা শুনতে পাই মৌলানা আজাদের কণ্ঠেও। ১৯৪০-এর মার্চ মাসে রামগড় কংগ্রেসের সভাপতি রূপে তিনি ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিলেন। ১৯৪২-এর এপ্রিলে এলাহাবাদে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় প্রদত্ত ভাষণে তিনি জাপ-আক্রমণ প্রতিরোধের আহ্বান জানিয়ে বলেন :

"জাপানী অভিযান হলো এক ভয়ঙ্কর বিপদ। একমাত্র দাস-মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিই ভাবতে পারে যে জাপান ভারতকে স্বাধীনতা দেবে। আমাদের জাতীয় আত্মমর্যাদাবোধের দ্বারাই আমরা বলতে পারি যে, কোনো প্রভু-বদল আমাদের কাম্য নয়। ব্রিটিশের সঙ্গে আমাদের বিরোধ থাকলেও আমরা জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধ করব। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনোভাবেই আমরা জাপানকে স্বাগত জানাতে পারি না।"

একথা সত্য যে, ১৯৪২-এর আগস্ট-আন্দোলনের ধ্বংসাত্মক ও অন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্মে অসংখ্য সাধারণ কংগ্রেস-কর্মী জড়িত থাকলেও তাদের নেতৃত্ব প্রধানত দিয়েছিলেন সোস্যালিস্ট ও ফরওয়ার্ড ব্লক নেতারা। কংগ্রেসের কোনো উচ্চপদস্থ দায়িত্বশীল নেতাই এই আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন না, বরঞ্চ পরবর্তীকালে এঁরা 'আগস্ট-আন্দোলনে'র হিংসাত্মক কাজের নিন্দা করেন এবং কার্যত আগস্ট-আন্দোলনে কংগ্রেসের দায়িত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকারও করেন।

এক্ষেত্রে বড়লাট লিনলিথগো কংগ্রেসের বিরুদ্ধে গণ্ডগোল সৃষ্টির যে অভিযোগপত্র (Congress Responsibility for the Disturbances) প্রকাশ করেন গান্ধীজীসহ কংগ্রেস-নেতৃত্ব তার বিরুদ্ধে যেমন তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন তেমনি প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টিও।

[দ্র. কমিউনিস্টদের জবাব/পি. সি. জোশী]।

এই প্রসঙ্গে এবার আলোচনা করা যাক কংগ্রেস এবং কমিউনিস্ট-বিরোধী কংগ্রেস-সোস্যালিস্ট পার্টির ভূমিকা।

কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি :

'ভারত-ছাড়ো' তথা 'আগস্ট-আন্দোলনে' সবচেয়ে থেকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল এই দল। জয়প্রকাশ নারায়ণ, রামমনোহর লোহিয়া প্রমুখের নেতৃত্বে এই দল ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ব্রিটিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে সব থেকে ধ্বংসাত্মক ও অন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্ম পরিচালনা করে। কমিউনিস্টদের 'জনযুদ্ধের তত্ত্ব' এঁরা খারিজ করে দেন এবং গান্ধী প্রমুখ কংগ্রেসের জাতীয় নেতৃবৃন্দের অনুপস্থিতির (গ্রেপ্তারের ফলে) সম্পূর্ণ সুযোগ নিয়ে কংগ্রেসী জনসাধারণ ও কর্মীদের

নিজেদের নিয়ন্ত্রণে এনে ও তাঁদের উপর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে সোস্যালিস্ট পার্টির নেতারাই মূলত আগস্ট-আন্দোলনকে সশস্ত্র এবং গেরিলা-পদ্ধতিতে পরিচালনা করতে থাকেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায়ের ঘটনাবলীর নতুন কোনো মূল্যায়ন কংগ্রেস-সোস্যালিস্ট পার্টি করেনি। তাঁরা এই যুদ্ধকে আগের মতো সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ রূপেই অভিহিত করতে থাকেন। এই দলের মতে, সোভিয়েত ইউনিয়নের মিত্রপক্ষে যোগ দেওয়ার ঘটনা যুদ্ধের প্রকৃতি ও চরিত্রে কোনো পরিবর্তন আনেনি। আচার্য নরেন্দ্র দেও বলেছিলেন যে, জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের যুদ্ধ অথবা পুঁজিবাদ এবং ফ্যাসিবাদকে ধ্বংস করার যুদ্ধকেই কেবল জনযুদ্ধ বলা যায়। ব্রিটেন, মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, ইতালি ও জাপানের মতো সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি তাদের জাতীয় স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য যখন পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত তখন সেই যুদ্ধ জনযুদ্ধ হতে পারে না।[৪৯]

কংগ্রেস-সোস্যালিস্ট পার্টির পুরুষোত্তমদাস ত্রিকমদাসও যুদ্ধ-সম্পর্কে সংবাদ-পত্রে এক বিবৃতি প্রদান করে বলেন:

> "ভারতবর্ষ ও অন্যান্য উপনিবেশকে স্বাধীনতা দেওয়া হয় নাই, কাজেই যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধই রহিয়া গিয়াছে এবং ইহার সহিত আমরা সম্বন্ধ রাখিতে পারি না।"[৫০]

বস্তুত, ব্রিটিশের যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে অন্তর্ঘাতের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত করা এবং গেরিলা রণকৌশলের মাধ্যমে ব্রিটিশ যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে জাপ-সেনাবাহিনীর জয়ের পথ সুগম করার জন্য সকল রকম উদ্যোগই এই দল নিয়েছিল। জয়প্রকাশ নারায়ণ 'স্বাধীনতার সৈনিকদের প্রতি পত্র' এবং 'এ. বি. সি. অফ ডিসলোকেশন' প্রভৃতি গোপন প্রচারপত্রের মারফৎ জাপানী বাহিনীকে সাহায্য প্রদানের জন্য দলের সদস্যদের কাছে গেরিলা যুদ্ধ-প্রস্তুতি গড়ে তোলার নির্দেশ দেন।[৫১] নেপালের তরাই অঞ্চলে এদের গেরিলা প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। ভারতবর্ষে, বিশেষ করে বাংলা ও উত্তর-পূর্ব ভারতে, জাপানের সমর্থনে এরা সংগঠিত প্রচারও চালাতেন। আগস্ট-আন্দোলনে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল এই দল। কমিউ-নিস্টদের সঙ্গে তাই এদের বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষও ঘটেছে বহু স্থানে। ফরওয়ার্ড ব্লকের সঙ্গেও এরা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে কাজ করত। কমিউনিস্ট পার্টি এদের সেই সময় ফ্যাসিস্ত-শক্তির পঞ্চম বাহিনীরূপে চিহ্নিত করে।[৫২] প্রকৃতপক্ষে, তীব্র ব্রিটিশ বিরোধিতা, উগ্র জাতীয়তাবোধ ও অন্ধ দেশপ্রেমের দ্বারা পরিচালিত হয়ে তখন সোস্যালিস্ট পার্টি এবং অন্যান্য কয়েকটি রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠী ফ্যাসিস্তপন্থী হয়ে ওঠে। এর কারণ এটা নয় যে, এরা মনেপ্রাণে ফ্যাসিবাদী ভাবাদর্শকে সমর্থন করত। এই কারণ নিহিত ছিল প্রধানত তাদের ভ্রান্ত রাজনৈতিক অবস্থানের মধ্যে। অর্থাৎ, এরা সাম্রাজ্যবাদ এবং ফ্যাসিবাদকে অভিন্ন না ভেবে দুটি পরস্পর-বিরোধী শক্তিরূপে মনে করত এবং 'জনযুদ্ধে'-র প্রকৃত আন্তর্জাতিক তাৎপর্য উপলব্ধি

করতেও এরা ব্যর্থ হয়েছিল। দুঃখের হলেও এটা সত্য যে, ১৯৪৩ সালের ৫ই ডিসেম্বর জাপানী বোমারু বিমান কলকাতার উপর বোমা ফেললে অন্ততপক্ষে তিন-শত মানুষ নিহত হন। এরা প্রায় সবাই ছিলেন গরীব বস্তিবাসী ও নিরীহ অসামরিক লোক। এই ঘটনায় সোস্যালিস্ট নেতা অচ্যুত পট্টবর্ধন তাঁদের দলীয় মুখপত্র 'ইনকিলাব'-এ ৯ই জানুয়ারি '৪৪, (রামমনোহর লোহিয়া ও অরুণা আসফ আলি সম্পাদিত) আনন্দ প্রকাশ করেন।[৫৩] এর থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, সোস্যালিস্টরা সে সময় কতখানি বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। মোট কথা, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণের দীর্ঘকালীন অসন্তোষের পুরো সুযোগ নেওয়ার চেষ্টাই সোস্যালিস্টরা করেছিলেন, কিন্তু তাঁদের হঠকারিতা ক্রমশই জনগণ থেকে তাঁদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। জয়প্রকাশ নারায়ণের অভিমত অনুযায়ী 'সংগঠন ও সমন্বয়ের অভাবেই এই আন্দোলন স্তিমিত হয়ে গেল'—এটা বোধহয় একমাত্র ব্যাখ্যা হতে পারে না।

ফরওয়ার্ড ব্লক ও অন্যান্য জাপ-সমর্থক রাজনৈতিক দল :

১৯৩৯ সালেই সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে 'ফরওয়ার্ড ব্লক' সংগঠিত করেন। কংগ্রেস-সোস্যালিস্ট ও অন্যান্য বামপন্থীরা 'ফরওয়ার্ড ব্লক'-কে একটি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মঞ্চরূপেই দেখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শ্রী বসু একে স্বতন্ত্র একটি রাজনৈতিক দলে পর্যবসিত করেন। ১৯৩৯-এর নভেম্বরে ফরওয়ার্ড ব্লকের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে আপসহীন মনোভাবের পুনরাবৃত্তি করা হয়। সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের নেতৃত্বকে রক্ষণশীল ও আপসমুখী বলে বর্ণনা করেন।[৫৪]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার ছ'মাস পরে রামগড়ে অনুষ্ঠিত 'আপস-বিরোধী সম্মেলনে' সুভাষচন্দ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামের সংকল্প পুনর্বার ঘোষণা করেন এবং এই উদ্দেশ্যে 'সারা ভারত এ্যাকশান কাউন্সিল'ও গঠন করা হয়। অতঃপর ১৯৪১-এর ১৭ই জানুয়ারি সুভাষচন্দ্র আত্মগোপন করে ব্রিটিশ-বিরোধী সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনার জন্য কাবুলের পথে রাশিয়া হয়ে জার্মানী চলে যান। জার্মানীতে বছর দু'য়েক থাকার পর (১৯৪১-৪৩) তিনি চলে আসেন জাপানে (জুন, ১৯৪৩) এবং আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করে জাপ-সেনাবাহিনীর সঙ্গে মিলিতভাবে পূর্বভারতের সীমান্ত অভিমুখে অভিযান পরিচালনা করেন।

সুভাষচন্দ্র নিঃসন্দেহে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ফ্যাসিস্ত শক্তিজোটকে অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ফ্যাসিবাদের বা ফ্যাসিস্ত-শক্তির কাছে তিনি কখনোই আত্মসমর্পণ করেন নি। আধুনিক গবেষণায় একথা প্রমাণিত যে, সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব হিটলারের কাছে ছিল অসহ্য। যদি সঠিক সময়ে তিনি জার্মানী ত্যাগ না করতেন তবে তাঁকে বন্দী অথবা হত্যা করাও নাৎসীদের পক্ষে হয়তো অসম্ভব ছিল না।[৫৫]

যাহোক, এখন এই সত্য উদ্ঘাটিত হয়েছে যে, সুভাষচন্দ্র প্রথমে কমিউনিস্ট রাশিয়ার কাছ থেকেই ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রামে সাহায্য পাওয়ার আশায় দেশ ত্যাগ করেন। সুভাষচন্দ্রকে গোপনপথে ভারতের বাইরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে যাঁরা সব থেকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন তাঁদের অন্যতম ভগতরাম তলোয়ার, আচ্ছার সিং ছিনা, আকবর শাহ প্রমুখ স্বাধীনতা-সংগ্রামীরা প্রায় প্রত্যেকেই ছিলেন বেআইনী কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য।[৫৬] জার্মানী কর্তৃক রাশিয়া আক্রান্ত হওয়ার পর (২২শে জুন, '৪১) সেখান থেকে সাহায্য পাওয়ার সব আশা বন্ধ হয়ে গেলে তিনি 'অক্ষ (ফ্যাসিস্ত) শক্তিজোট'-এর উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়েন, কিন্তু রাশিয়ার বিরুদ্ধে একটি শব্দও কোনোদিন সুভাষচন্দ্র উচ্চারণ করেন নি; বরঞ্চ জার্মানী পরিত্যাগের পূর্বে তিনি তাঁর দ্বারা সংগঠিত ভারতীয় সৈনিকদের রাশিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্র না ধারণ করারই নির্দেশ দিয়ে আসেন।[৫৭] সুভাষচন্দ্র সচেতনভাবে ফ্যাসিবাদের সমর্থক ছিলেন না এ-কথা ঠিক; কিন্তু তিনি যেভাবে স্বদেশের স্বাধীনতার স্বার্থে ফ্যাসিস্ত-শক্তিজোটকে ব্যবহার করার চেষ্টা করেন, সেইরকম ফ্যাসিস্তরাও নিজেদের স্বার্থে সুভাষচন্দ্রকে যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করেছিল তাঁর অজান্তেই। বার্লিন থেকে তিনি বেতার মাধ্যমে ভারতবর্ষের উদ্দেশে যেসব ভাষণ দিয়েছেন তার বিশেষ বিশেষ অংশ বাদ দিয়ে কিংবা বিকৃত করে নাৎসী-ফ্যাসিস্তরা নিজেদের উদ্দেশ্যে তা ব্যবহার করতে এবং এইভাবে বিশ্বের সামনে সুভাষচন্দ্রকে একজন কট্টর ফ্যাসিস্ত-অনুরাগীরূপে তুলে ধরতে সচেষ্ট ছিল। সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন গবেষণায় এই সব তথ্যই উদ্ঘাটিত হয়েছে।[৫৮]

বাঙলাসহ ভারতের বেশ কয়েকটি অ-হিন্দীভাষী প্রদেশে সুভাষচন্দ্রের বিপুল জনপ্রিয়তা ছিল। সুতরাং বার্লিন রেডিও থেকে প্রচারিত সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতা এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রচারের ফলে জনসাধারণের একটা বড় অংশ ফ্যাসিস্ত সমর্থক হয়ে ওঠে। আগস্ট-আন্দোলন চলাকালীন সময়ে ফরওয়ার্ড ব্লকিস্টরা সোস্যালিস্টদের সঙ্গে মিলিতভাবে উল্লেখযোগ্য তৎপরতা চালায়। কমিউনিস্ট পার্টির 'জনযুদ্ধ'-সংক্রান্ত ফ্যাসিস্ত-বিরোধী কর্মসূচীকে বানচাল করে দিতে এরা বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। জাপান থেকে পরিচালিত সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজের অভিযান চলাকালে ফরওয়ার্ড ব্লক অবিভক্ত বঙ্গপ্রদেশে সব থেকে সক্রিয় হয়ে ওঠে। তারা ব্রিটিশ সামরিক প্রস্তুতির মধ্যে যেমন অন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্ম চালাতে থাকে, তেমনি জাপানের সমর্থনেও জনগণের মধ্যে প্রচার চালায়।

অনুরূপভাবে আরো কয়েকটি বামপন্থী রাজনৈতিক-গোষ্ঠী প্রত্যক্ষভাবে জাপানী আক্রমণের সমর্থনে প্রচার চালাত, ব্রিটিশ যুদ্ধ-ব্যবস্থাকে বানচাল করে দেওয়ার চেষ্টা করত এবং কমিউনিস্ট পার্টির 'জনযুদ্ধে'-র নীতিকে আক্রমণ করত (এমনকি এরা কমিউনিস্টদের শারীরিকভাবে আক্রমণ ও হত্যাও করেছে, যেমন ঢাকায় সোমেন চন্দ-হত্যা, মার্চ '৪২)।[৫৯] এই গোষ্ঠীগুলি হলো আর. এস. পি. (অনুশীলন সমিতি প্রমুখ উগ্রপন্থী বিপ্লববাদী গোষ্ঠী থেকেই এদের উদ্ভব), আর.

সি. পি. আই, অর্থাৎ সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি এবং নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারের লেবর পার্টি।[৬০] আশ্চর্যের বিষয় হলো, যে-সৌম্যেন্দ্রনাথ ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সব থেকে বেশি সোচ্চার ছিলেন, তাঁর পার্টিই জাপ-ফ্যাসিস্তদের সমর্থনে কমিউনিস্ট পার্টির 'জনযুদ্ধ'-নীতিকে আক্রমণ করে। বস্তুত, ফরওয়ার্ড ব্লক, আর. এস. পি, আর. সি. পি. আই প্রভৃতি দল বা গোষ্ঠীর মূল কর্মক্ষেত্র ছিল বাঙলা প্রদেশ। সুতরাং বাঙলায় ফ্যাসিস্ত বিরোধী আন্দোলনকে নিঃসন্দেহে অত্যন্ত প্রতিবন্ধকতা ও জটিল পরিস্থিতির মধ্য দিয়েই এগোতে হয়েছিল।

রায়পন্থী র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি, ডেমোক্রাটিক ভ্যানগার্ডস ও বলশেভিক পার্টি :

এম.এন. রায় কিন্তু জাতীয় কংগ্রেসের 'দেখো এবং অপেক্ষা করো' নীতি সম্পর্কে ফরওয়ার্ড ব্লক বা আর.এস.পি. অনুসৃত যে ধ্যান-ধারণা তার থেকে ভিন্নমত পোষণ করতেন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই (১৯৩৯-এর অক্টোবরের মাঝামাঝি) রায়পন্থী 'লীগ অফ র‍্যাডিক্যাল কংগ্রেসম্যান' তাদের যে নীতি ঘোষণা করলেন তাতে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের আশু কর্তব্যরূপে হিটলারের পরাজয়ের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করার কথাটি বলা হয়। যুদ্ধের সূচনাতে তাঁর ঘোষিত নীতির দ্বারা মানবেন্দ্রনাথ রায় কিন্তু অন্যান্য বামপন্থীদের মতো এই যুদ্ধকে 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ' বলে চিহ্নিত করতে নারাজ ছিলেন। আবার এই যুদ্ধকে 'ফ্যাসিস্ত-বিরোধী' বলতেও তিনি রাজী ছিলেন না। রায়গোষ্ঠীর সুস্পষ্ট বক্তব্যের মর্মার্থ ছিল নিম্নরূপ :

> " ...ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট চা'ক বা না চা'ক এই যুদ্ধে হিটলারবাদের পতন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তাই বলে ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের কোথাও গণতন্ত্র ও স্বাধীনতাকামী জনগণ এই যুদ্ধে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করতে পারে না। বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের স্বার্থেই হিটলারবাদের পতন ও ফ্যাসিবাদের ধ্বংস একান্ত প্রয়োজন।"[৬১]

মৌলানা আজাদের বিরুদ্ধে কংগ্রেস সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য এবং তারপর কংগ্রেসের নীতি অমান্য করে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় নিঃশর্ত সমর্থন ও সহযোগিতা দানের কথা ঘোষণা করার ফলে মানবেন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য রায়পন্থীদের কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করা হয়। শ্রী রায় তাই বাধ্য হয়ে বোম্বাই শহরে একটি সম্মেলন আহ্বান করে (২১শে ডিসেম্বর, ১৯৪০) 'র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি' নামে এক নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেন। ইতিমধ্যে রায়পন্থীরা ১লা সেপ্টেম্বর (১৯৪০) যুদ্ধের প্রথম বছর পূর্তি উপলক্ষে সারা ভারতে 'ফ্যাসিস্ত-বিরোধী দিবস' উদ্‌যাপন করেছিল।[৬২] নতুন পার্টি গঠনের পর সমমতাবলম্বী অন্যান্য রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সঙ্গে মিলিতভাবে 'রায়গোষ্ঠী' যুদ্ধের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত একান্ত আনুগত্য সহকারে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের সঙ্গে সহযোগিতা করে গেছে। এজন্য ব্রিটিশ সরকারও এদের প্রশাসনিক এবং অর্থনৈতিক সবরকম

৮

সহযোগিতাই প্রদান করতেন।[৬৩] অবশ্য ভারতের কমিউনিস্টদের 'জনযুদ্ধে'-র তত্ত্বকে এম. এন. রায় কখনো সমর্থন করেননি। কমিউনিস্টরাও তাঁকে সরাসরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের 'অনুগত সেবক' বা 'তল্পীবাহক' বলতে কুণ্ঠাবোধ করেনি।[৬৪]

কালের দূরত্বে দাঁড়িয়ে আজ এ-কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, ১৯৪০ সালে যখন সারা দেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী হাওয়া প্রচণ্ড গতিতে বহমান, তখন এম. এন. রায়ের 'ফ্যাসিস্ত-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি', যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা এবং ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সঙ্গে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করার ঘোষিত নীতিটি ছিল জাতীয় স্রোতের বিপরীতমুখী অত্যন্ত এক দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা। আধুনিক গবেষকদের অনেকেই কংগ্রেস, কমিউনিস্ট ও সোস্যালিস্ট পার্টি কর্তৃক অনুসৃত তৎকালীন জাতীয় রাজনীতির প্রধান তিনটি ধারা থেকে (অপর ধারাটি ছিল মুসলিম লীগের) বিচ্ছিন্নতা-জনিত পরিস্থিতিকেই শ্রী রায়ের এই ব্রিটিশ তোষণনীতির মূল কারণ রূপে ব্যাখ্যা করেছেন। অপরদিকে, অধ্যাপক শিবনারায়ণ রায়, স্বদেশরঞ্জন দাস প্রমুখ রায়পন্থী গবেষকগণের অভিমত হলো : শ্রী রায় প্রথমাবধি ছিলেন ফ্যাসিবাদের বিপদসম্পর্কে পূর্ণমাত্রায় সচেতন এবং ফ্যাসিবাদ ও ফ্যাসিস্ত-শক্তিকে যে-কোনো উপায়ে প্রতিরোধ করতে তিনি ছিলেন স্থিরপ্রতিজ্ঞ।

এই প্রসঙ্গে স্বদেশরঞ্জন দাস এম. এন. রায় লিখিত 'ইণ্ডিয়া এ্যাণ্ড ওয়ার' গ্রন্থ থেকে যে-কথা উদ্ধৃত করেছেন তার থেকে জানা যাচ্ছে, উক্ত গ্রন্থে শ্রী রায় ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে বলেছেন :

> "সকল স্বাধীনতাকামী ও গণতন্ত্রের উপাসকদের আশু কর্তব্য হবে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। সকল সিদ্ধান্তের মধ্যে এটা যদি প্রাধান্য লাভ না করে তবে সেটা ভুলই হবে। সারা বিশ্বে যে সামাজিক ব্যবস্থা আজ অচল হয়ে পড়েছে তাকেই জোর করে খাড়া রাখতে এই ফ্যাসিবাদের উদ্ভব হয়েছে। এর ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে সেই পুরাতন ব্যবস্থাও ভেঙে পড়বে। তখন ভারতও স্বাধীন হয়ে যাবে, এবং সেই স্বাধীন ভারত মুক্ত-জগতের মাঝে আপন আসন করে নিয়ে উচ্চতর সভ্যতা গড়ার প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করতে সক্ষম হবে।
>
> "সেইহেতু সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেনের আমাদের সম্বন্ধে যে মনোভাবই থাকুক না কেন, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে ভারতকে আজ এই ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধে সহযোগিতা করতে হবে। ভারতের মুক্তির জন্যে যাঁরা সংগ্রাম করছেন আজ তাঁদের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের থেকে ব্রিটিশ গণতন্ত্রকে পৃথক করে দেখতে হবে, এবং এই ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধে সমস্বার্থেই ব্রিটিশ গণতন্ত্রের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে।"[৬৫]

সুতরাং আমরা বলতে পারি, উদ্দেশ্য যাই থাকুক না কেন, অন্তত তত্ত্বগত-ভাবে ভারতবর্ষে 'ফ্যাসিস্ত-বিরোধী জনযুদ্ধে'র নীতি' প্রচারে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের ভূমিকা অস্বীকার করা ইতিহাস-সম্মত নয়।

ইতিহাসের সাক্ষ্য থেকে আমরা এটাও জেনেছি যে, কমিউনিস্ট নিয়ন্ত্রণাধীন এ. আই. টি. ইউ. সি থেকে বেরিয়ে এসে রায়গোষ্ঠী গঠন করেছিল 'ইণ্ডিয়ান ফেডারেশন অফ লেবর'। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের আর্থিক সহযোগিতাপুষ্ট এই শ্রমিক সংগঠনটি সেই সময় যুদ্ধের প্রয়োজনীয় উৎপাদন-ব্যবস্থাকে অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়াসই চালিয়েছিল।

যাহোক, রায়গোষ্ঠীতে একটি বড় ভাঙন আসে ১৯৪৩ সালে। একদা রায়ের অনুগামী জীবনলাল চ্যাটার্জি তাঁর অনুগামীদের নিয়ে (প্রধানত প্রাক্তন যুগান্তর-গোষ্ঠীর বিপ্লববাদী অংশ) নতুন রাজনৈতিক গ্রুপ গঠন করেন (২৮শে অক্টোবর, ১৯৪৩)—'ডেমোক্রাটিক ভ্যানগার্ডস'। বস্তুত, এই জীবনলালগোষ্ঠী এম. এন. রায়ের অত্যধিক ব্রিটিশ আনুগত্য মোটেই পছন্দ করতেন না। তাছাড়া মার্কস-বাদী-লেনিনবাদী চিন্তাভাবনা পরিত্যাগ করে শ্রী রায় যেভাবে ব্রিটিশ সংসদীয় গণতন্ত্রে আস্থাশীল হয়ে উঠেছিলেন 'ভ্যানগার্ডস'দের তাতেও আপত্তি ছিল। অবশ্য এই ক্ষুদ্র রাজনৈতিক গ্রুপটি ফ্যাসিস্ত-বিরোধী রূপে ব্রিটিশ যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে আগাগোড়া সমর্থনও জানিয়ে গিয়েছিল।[৬৬]

ফ্যাসিবাদ-বিরোধী প্রচারকার্যে পূর্বভারতে বেশ কিছুটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল বলশেভিক পার্টিও। কমিউনিস্ট পার্টি থেকে ১৯৩৯ সালে বহিষ্কৃত নীহারেন্দু দত্তমজুমদার ও তাঁর কিছু অনুগামী যে-'লেবর পার্টি'র অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তাঁদেরই গোপন রাজনৈতিক সংগঠন ছিল 'বলশেভিক পার্টি'। বলশেভিক পার্টির অন্যান্য নেতারা প্রায় প্রত্যেকেই ছিলেন পোড়খাওয়া বিপ্লবী, অভিজ্ঞ সংগঠক, ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী এবং কমিউনিস্ট পার্টির প্রাক্তন সদস্য। এঁরা হলেন বিশ্বনাথ দুবে, শিশির রায়, প্রমোদ সেন, কমল সরকার, নন্দলাল বসু, কৃষ্ণপদ ঘোষ, মনোরঞ্জন রায়, হাফিজ জালালুদ্দিন, নৃপেন ঘোষ প্রমুখ। সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হওয়ার পর বলশেভিক পার্টিও কমিউনিস্টদের মতোই 'জনযুদ্ধে'র নীতি গ্রহণ করে। নীহারেন্দু দত্তমজুমদার এই নীতি মানতে অস্বীকার করে 'আগস্ট-আন্দোলনে' যোগদান করলে তাঁকে ঐ পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয়।

বলশেভিক পার্টির সদস্যেরা অত্যন্ত আন্তরিকভাবে নানা বিঘ্ন-বাধা অগ্রাহ্য করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী প্রচারকার্য চালায়। এই সময় বলশেভিক পার্টির নেতৃত্ব জাপ-আক্রমণের বিরুদ্ধে ও ফ্যাসিস্ত-বিরোধী প্রচারকার্যের অংশ রূপে বেশ কয়েকটি পদযাত্রা বাঙলা-আসাম ও আরাকানে (বর্মা) সংগঠিত করে। মনোরঞ্জন রায় প্রমুখ বর্তমান কমিউনিস্ট নেতারা ছিলেন এর নেতৃত্বে। জাপানী সামরিক বাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত বর্মার বালিবাজারে একটি বলশেভিক গ্রুপ দীর্ঘদিন অবস্থান করে সাধারণ মানুষকে ফ্যাসিস্ত-বিরোধিতায় উদ্বুদ্ধ করেন।[৬৭]

সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলিম লীগ ও হিন্দু মহাসভা :

ভারতের প্রধানতম সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল রূপে সংগঠিত 'মুসলিম লীগ' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘোষিত হওয়ার পর যুদ্ধ-সম্পর্কে তাদের বক্তব্য পেশ করে। ইউরোপের রাজনীতিতে ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদের অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগকে সোচ্চার হতে কখনোই দেখা যায়নি। জাতীয় ক্ষেত্রেও মুসলিম লীগ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করার চেয়ে বিভেদপন্থী সাম্প্রদায়িক রাজনীতি সম্প্রসারণেই তার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘোষিত হলে মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটি (১৯৩৯-এর ১৮ই সেপ্টেম্বর) যুদ্ধ-সম্পর্কে যে-প্রস্তাব গ্রহণ করে তাতে 'মানব-স্বাধীনতা'র মৌলিক নীতিগুলিকে সমর্থন করা হয়। মুসলিম লীগের প্রস্তাবে পোল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের জন্য সহানুভূতি জানিয়ে বিনা প্ররোচনায় মগ্ন ফ্যাসিস্ত আগ্রাসনকে ধিক্কার জানানো হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম পর্যায় থেকেই মুসলিম লীগ ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করতে থাকে কিন্তু তা ছিল শর্তাধীন। সন্দেহ নেই, এই শর্তগুলি সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক স্বার্থেই আরোপিত হয়েছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে মুসলিম লীগের দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এই যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে, অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের সময়, কিংবা দ্বিতীয় পর্যায়ে, অর্থাৎ সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত (জুন, ১৯৪১) হওয়ার পর, এক কথায় ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত যুদ্ধের কোনো পর্যায়েই মুসলিম লীগ অথবা তার অবিসংবাদী নেতা মহম্মদ আলি জিন্না বিশ্বযুদ্ধের কোনো রকম মূল্যায়নই করেননি। ফ্যাসিস্ত-বিরোধী কোনো প্রকার প্রচার-আন্দোলনেই এই সময়কালে মুসলিম লীগকে দেখা যায়নি। যেটা লক্ষণীয় তা হলো, যুদ্ধের সময় ব্রিটিশের সঙ্গে দরকষাকষি করে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সুযোগ-সুবিধা যতটা সম্ভব আদায় করে নিতেই তারা ছিল সতত উদগ্রীব। কারণ, এছাড়া জিন্নার অন্য কোনো উপায় ছিল না। দেশের মুসলিম জনগণের বৃহত্তর অংশ যেভাবে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি অনুরক্ত হচ্ছিল তাতে জিন্না তাঁর হারানো প্রভাব ও মর্যাদা ফিরে পাওয়ার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন। জাতীয় কংগ্রেসকে হিন্দুদের একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানরূপে বর্ণনা করে ব্রিটিশের সঙ্গে নানা দরকষাকষির রাজনীতিকেই মুসলিম লীগ অগ্রাধিকার দেয়। সাম্রাজ্যের স্বার্থরক্ষার তাগিদে ব্রিটেনও মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক দাবীগুলিকে জাতীয়তাবাদী ও গণতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে ব্যবহার করে। মোটকথা, মুসলিম লীগ 'আগস্ট-আন্দোলনে'ও যেমন সামিল হয়নি তেমনি ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনেও নিজেদেরকে যুক্ত করেনি। সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক স্বার্থরক্ষার তথা-কথিত রাজনীতির মধ্যেই মুসলীম লীগ ছিল আবদ্ধ।

'হিন্দু মহাসভা'র পৃষ্ঠপোষক ও নেতারা ছিলেন প্রধানত দেশীয় রাজন্যবর্গ ও

অভিজাত ভূস্বামী-সম্প্রদায়ভুক্ত। তাঁরা প্রথমাবধি ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সঙ্গে সুসম্পর্ক ও সৌহার্দ্য বজায় রেখেই চলতেন। মুসলিম লীগ, কমিউনিস্ট পার্টি, সোস্যালিস্ট পার্টি এবং জাতীয় কংগ্রেসকেও তাই হিন্দু মহাসভা সন্দেহের চোখে দেখত। বিশেষ করে মুসলিম লীগের 'পাকিস্তান দাবী' প্রসঙ্গে এদের প্রতিক্রিয়া ছিল অত্যন্ত বিরূপ। যাহোক, হিন্দু মহাসভা ফ্যাসিবাদ এবং ফ্যাসিস্ত আগ্রাসনবাদকে নিন্দা করলেও ফ্যাসিস্ত-বিরোধী কোনো আন্দোলনে কিন্তু এই সংগঠনকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে কখনো দেখা যায়নি।

ব্রিটিশ যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে প্রথম থেকে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করাই ছিল এদের উদ্দেশ্য ও ঘোষিত নীতি। এক্ষেত্রে এরা মুসলিম লীগেরই অনুসারী ছিল। হিন্দু মহাসভার অংশ রূপে পরিচিত এবং গোলওয়ালকর পরিচালিত রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ (আর. এস. এস.) 'আগস্ট-আন্দোলনে' কোনোভাবেই অংশগ্রহণ করেনি। অপরদিকে, সাভারকর এক বিবৃতিতে (৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৪২) হিন্দু মহাসভার সমস্ত সদস্যদের 'আগস্ট-আন্দোলনে' যোগ দিতে নিষেধ করে তাদের নিজ নিজ সরকারী পদসমূহ বজায় রাখতে নির্দেশ দেন। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে হিন্দুর সংখ্যা বৃদ্ধি করাও ছিল তাঁর লক্ষ্য। আর যখন মেদিনীপুরে চরম পুলিশী সন্ত্রাস চলছে (১৯৪২) তখন হিন্দু মহাসভার নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন বাঙলার ফজলুল হক মন্ত্রীসভার মন্ত্রীপদে আসীন।[৬৮] এই অত্যাচারের প্রতিবাদে পরবর্তীকালে (১৬ই নভেম্বর, '৪২) তিনি অবশ্য পদত্যাগ করেন এবং ব্যক্তিগতভাবে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনেও যোগদান করেছিলেন। কিন্তু সবমিলিয়ে হিন্দু মহাসভা ব্রিটিশের অনুগত ভূমিকাই সেসময় পালন করেছিল, একথা নিঃসংকোচে বলা যায়।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি :

ইতিমধ্যে অনেক তর্ক-বিতর্কের ঝড় পার হয়ে, পার্টির বিভিন্ন অংশ ও স্তরে বিষয়টি নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার পরই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরো (১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৪১) 'জনযুদ্ধে'র প্রস্তাবটি গ্রহণ করে।[৬৯] জুন থেকে ডিসেম্বর (১৯৪১)—প্রায় ছয়মাস পরে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় এটাই অনুমিত হয় যে, এরজন্য কমিউনিস্ট পার্টিকে তীব্র আন্তঃপার্টি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল। পার্টির অভ্যন্তরে জাতীয়তাবাদী একটি অংশ যে তখন সক্রিয়ভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন চেয়েছিল, এই ঘটনা থেকে তা আমরা অনুমান করতে পারি। কমিউনিস্ট পার্টির 'জনযুদ্ধ' থিসিস গ্রহণ প্রসঙ্গে সরোজ মুখার্জি লিখেছেন :

"বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটি আগে থেকেই এই নতুন থিসিসের জন্য প্রস্তুত ছিল। নতুন নীতি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাটনা ছাত্রসম্মেলনে যাবার জন্য প্রস্তুত কমিউনিস্ট ছাত্রনেতাদের কাছে এই থিসিসের সারমর্ম পৌঁছে দেওয়া হয়। জেলা কমিটিগুলিও নতুনভাবে যুদ্ধ-সম্পর্কিত নীতি পরিবর্তনের ইঙ্গিত পান। সকলেই কমিটিগতভাবে আলোচনা শুরু করেন।

"অক্টোবর-নভেম্বর-ডিসেম্বর (১৯৪১) এই তিনমাস প্রাদেশিক কমিটি পার্টির ভিতর রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার কাজকে অগ্রাধিকার দেয় এবং সফলভাবে স্বদেশপ্রেমের অনুপ্রেরণায় সমগ্র পার্টিকে উদ্দীপ্ত করতে সক্ষম হয়। পার্টির একটা সুস্থ, সবল, দৃঢ়, সঠিক ও বলিষ্ঠ রাজনীতির ভিত্তিতে জেলা সম্মেলন ও প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।" ৭০

এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখা দরকার যে, ১৯৪২ সালের ২৩ শে জুলাই কমিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে ব্রিটিশ সরকার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে। বহুদিন বে-আইনী থাকার পর কমিউনিস্ট পার্টি বৈধ হয়। পার্টির পলিটব্যুরোর সঙ্গেও গভর্নমেন্টের সর্বোচ্চ প্রশাসন যুদ্ধসংক্রান্ত বিষয়ে যোগাযোগ রেখে চলতে শুরু করে। কমিউনিস্ট পার্টির দাবী অনুযায়ী নেতৃস্থানীয় বহু কর্মীকে জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হলেও অনেক সাধারণ কর্মীকে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট দীর্ঘদিন ধরে মুক্তি দেয়নি। তবে মোটের উপর বলা যায়, প্রতিষ্ঠিত প্রায় সকল নেতাই মুক্ত জীবনে ফিরে আসেন এবং এই সময় তাদের একমাত্র কাজ হয় সমগ্র পার্টিকে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলন পরিচালনার জন্য প্রস্তুত করা।

বস্তুত, তৎকালীন পরিস্থিতিতে এটা ছিল সত্যিই অত্যন্ত কঠিন কাজ। এমনিতে বুদ্ধিজীবীদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশের সমর্থন পার্টি ইতিপূর্বেই লাভ করেছিল, কিন্তু বিপুল সংখ্যক সাধারণ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত এবং জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী-দের কাছে 'জনযুদ্ধে'র নীতি ছিল অবশ্য পরিত্যাজ্য। এ-প্রসঙ্গে প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা রণেন সেন একটি অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন :

"১৯৪১ সাল নাগাদ হিজলী জেলে বন্দী হয়ে আমরা কমিউনিস্ট পার্টির ১২/১৪ সভ্য ছিলাম ও পরে আমাদের সঙ্গে যোগ দেন সত্যেন মজুমদার প্রভৃতি আরো ১০ জন। বাকী প্রায় আড়াইশো বন্দী ছিলেন ফরওয়ার্ড ব্লক (বেশীর ভাগ বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স), আর. এস. পি ও কিছু 'যুগান্তর' পার্টিভুক্ত। তাঁদের সঙ্গে জেলে আমাদের সম্পর্ক খারাপ ছিল না।

"কিন্তু ফ্যাসিবাদী জার্মানী সোভিয়েত দেশ আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে অভ্যন্ত-রীণ সম্পর্ক খারাপ হতে থাকল। প্রতিদিন সংবাদপত্রে খবর বেরুতে লাগল হিটলার-বাহিনী কি বিদ্যুৎবেগে সোভিয়েত দেশে ঢুকে পড়ছে আর সঙ্গে সঙ্গে ঐ আড়াইশো জনের কি উল্লাস! যেন তাঁরাই হিটলার-বাহিনীর অংশ, তাই হিটলারের জয়ে তাঁরা নিজেদের জয়ী মনে করতে লাগলেন।......আর আমরা মুষ্টিমেয় ২০/২২ জনের তো আহার-নিদ্রা বন্ধের উপক্রম।

"যাঁরা হিটলারের অগ্রগতিতে আহ্লাদে আটখানা ছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অনেক পরীক্ষিত সংগ্রামী রাজনৈতিক ব্যক্তি এবং তাঁদের পার্টিগুলিও নিশ্চয়ই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ছিল। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ বলতে তাঁরা বুঝতেন ইংরাজ। সুতরাং ইংরাজের শত্রু জার্মানীকে তাঁদের সমর্থন জানাতে হবে।......কিছু দাদারা অবশ্য ছিলেন মূলতই অতিমানব

হিটলারের ভক্ত ও কমিউনিস্ট বিরোধী।"[৭১]

জুলাই মাসে কমিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিলে ঐ মাসেই বাঙলার তৎকালীন বিধানসভার কমিউনিস্ট সদস্য বঙ্কিম মুখার্জি প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হকের কাছে চিঠি লিখে জানতে চান—কতজন কমিউনিস্টকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং কতজনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে। এর জবাবে হক সাহেব যে বিবৃতি প্রচার করেন তাতে বলা হয়: গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত ২,০১১ জন, নিরাপত্তা বন্দী ৩৬৫ জন, ভারতরক্ষা বন্দী ১১০জন, চট্টগ্রাম মামলা ও অন্যান্য বন্দী ৬০ জন। শেষোক্ত এই বন্দীরা সকলেই ছিলেন কমিউনিস্ট। ইতিমধ্যেই ঢাকা সেণ্ট্রাল জেল থেকে ২৪ জন এবং দমদম সেণ্ট্রাল জেল থেকে ২১জন দীর্ঘমেয়াদী বন্দী 'জনযুদ্ধে'র নীতিকে সমর্থন করে বাঙলার প্রধানমন্ত্রীকে এক দীর্ঘ স্বাক্ষরিত বিবৃতি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এই সকল বন্দীরা এক সময় সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁরা সেই বিবৃতিতে জানালেন, সন্ত্রাসবাদে তাঁদের আর বিশ্বাস নেই। তাঁরা দেশের স্বাধীনতার জন্য গণআন্দোলনের উপরেই নির্ভরশীল। জাপানী ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য এই বন্দীরা দেশবাসীর কাছে আবেদন জানালে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ব্যাপকভাবে তা ছাপিয়ে প্রচার করেন।[৭২] কিন্তু এই সব বন্দীদের মুক্তির প্রশ্নে সরকার বিলম্ব ঘটাতে থাকে। কারণ, এই সকল প্রাক্তন সন্ত্রাসবাদীকে এবং জেলের মধ্যে কমিউনিস্ট মতবাদে দীক্ষিত বন্দীদের ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট অত্যন্ত সন্দেহের চোখেই দেখত।

যাহোক, ফেব্রুয়ারি মাসে (১৯৪২) জনযুদ্ধের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক পি. সি. যোশী 'ফরোওয়ার্ড টু ফ্রিডম' নামে একটি প্রচার-দলিল প্রকাশ করেন। এই দলিলে উল্লিখিত কয়েকটি প্রাসঙ্গিক বক্তব্য উদ্ধৃত করলেই 'জনযুদ্ধ'-প্রসঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য সুস্পষ্ট বোঝা যাবে। 'ফরোওয়ার্ড টু ফ্রিডম'-এ যা বলা হয় তার মর্মার্থ হলো:

> "সর্বমানবের যুদ্ধে ভারতীয় জনগণের সমর্থনের অর্থ সাম্রাজ্যবাদী গভর্নমেণ্টের সহিত দাসসুলভ সহযোগিতা অথবা তাহার নিকট নতি স্বীকার করা নহে। বরং ইহার অর্থ গণতান্ত্রিক অধিকার লাভ ও জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য সাম্রাজ্যবাদী গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। এইভাবেই ভারতীয় জনগণ তাহাদের যুদ্ধপ্রচেষ্টায় সাম্রাজ্যবাদী বাধাকে চূর্ণ করিতে এবং যুগপৎ জাতীয় স্বার্থসাধন করিতে পারে······বিদেশী গভর্নমেণ্টের সহিত বিতর্ক করিয়া নহে। আমাদের জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিয়া আমরা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এই প্রকার জাতীয় জয় অর্জন করিতে সমর্থ হইব···।
>
> "ভারতের ইতিহাসে ইহা সর্বাপেক্ষা গুরুতর সঙ্কটময় মুহূর্ত—আমাদের সুন্দর দেশের বিরুদ্ধে ফ্যাসিস্ট শত্রুগণের ভয়ঙ্কর বিপদ আসন্ন। আমাদের জাতীয় আন্দোলনে—বিশ্বমুক্তির সংগ্রামে, আমাদের জাতীয় মুক্তির জন্য সংগ্রামে ইহা সর্বাপেক্ষা গৌরবময় সুযোগ।

"…এই যুদ্ধে জয়লাভের জন্য সংগ্রামের অর্থ আমাদের দেশরক্ষা করা এবং আমাদের মুক্তি অর্জন করা।

"যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় আমাদের সমর্থনের অর্থ কি বর্তমানে যে যুদ্ধ-প্রচেষ্টা চলিতেছে সেইভাবেই তাহাকে সমর্থন করা? না। এই মনোভাব হইল বিশ্বাসঘাতক রায়ের মনোভাব। যুদ্ধের রূপান্তর হইয়াছে বটে কিন্তু আমাদের দেশে যুদ্ধ-প্রচেষ্টা যারা পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণ করে, সেই গভর্নমেন্টের কোনো রূপান্তর হয় নাই।

"…যেখানে আমরা সহযোগিতা করিতে পারি সেখানে আমরা সহযোগিতা করিব এবং যেখানে আমাদের বাধা দিতেই হইবে সেখানে আমরা বাধা দিব।

"…জনসাধারণের স্বার্থে যেখানে সহযোগিতা করা দরকার সেখানে আমরা সহযোগিতা করিব এবং জনসাধারণের স্বার্থে যেখানে প্রতিরোধ করা প্রয়োজন হইবে সেখানে আমরা প্রতিরোধ করিব।"[৭৩]

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, কমিউনিস্ট পার্টি যখন 'জনযুদ্ধ'-নীতি গ্রহণ করছে তখন ভারতবর্ষের পশ্চিম-সীমান্তে রাশিয়া নাৎসী বাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত এবং পূর্বাঞ্চলের ভারত-বর্মা সীমান্ত আক্রান্ত জাপানী ফ্যাসিবাদীদের দ্বারা। এক্ষেত্রে অচিরেই সমগ্রভারত ফ্যাসিস্ত-শক্তির কবলে চলে যাওয়ার একটা বাস্তব সম্ভাবনাই তৈরি হয়েছিল। পরবর্তীকালে পি. সি. যোশী লেখেন:

" 'মাইন ক্যামফ্' ও 'তানাকা দলিল'-এ ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাহাদের যে পরিকল্পনা সমূহ প্রকাশ পাইয়াছিল, সেগুলি উন্মাদের অলস স্বপ্ন নহে। ভারতের জন্য যুদ্ধে পূর্বে ও পশ্চিমের সাঁড়াশী আক্রমণের মধ্য দিয়া আমাদের দেশের জনগণের দেহের উপর দিয়া রক্তাক্ত থাবা মিলাইবার ফ্যাসিস্ট সামরিক বিশ্ববণ-পরিকল্পনা প্রায় বাস্তবে পরিণত হইয়াছিল।"[৭৪]

সুতরাং এটা সহজেই অনুমেয় যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায়ে শুধুমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নকে রক্ষা করার জন্যই জনযুদ্ধের দৃষ্টিভঙ্গি কমিউনিস্ট পার্টি গ্রহণ করেনি, অথচ এই অভিযোগে প্রায়শই তাকে অভিযুক্ত করা হয়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসহ সমগ্র মানব-সভ্যতাকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই দ্বিতীয় পর্যায়ের বিশ্বযুদ্ধকে জনযুদ্ধ বলা হয়েছিল। কমিউনিস্টরা ঘোষণা করেছিলেন যে, জনযুদ্ধের ধ্বনি দিয়ে তাঁরা কখনও ভারতীয় স্বার্থের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারকে একীভূত করতে চান না। কারণ, পরাধীন ভারতের জনগণ এবং তাদের শাসকবর্গের মধ্যে মৌলিক প্রভেদ সব সময়ই থাকবে। 'জনযুদ্ধ'-নীতির দ্বারা ব্রিটিশ যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে সাহায্য করলেও কমিউনিস্টরা জাতীয় ঐক্য এবং জাতীয় স্বাধীনতার দাবীকে সবসময়েই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। সেজন্য কমিউনিস্টরা জাতীয় কংগ্রেস, মুসলিম লীগ এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলিকে নিয়ে ভারতে 'যুক্ত জাতীয় মোর্চা' ও কংগ্রেস-কমিউনিস্ট-লীগের যৌথ নেতৃত্বে 'জাতীয় সরকার' গড়ার কথা বলেছিলেন, যার মূল কর্মসূচী হবে ফ্যাসিস্ত আক্রমণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

প্রকৃতপক্ষে, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিই সেসময় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবিতে সর্বাপেক্ষা অধিক সোচ্চার হয়েছিল। 'বন্দীমুক্তি আন্দোলন' সেসময় মূলত গড়ে উঠেছিল কমিউনিস্টদেরই নেতৃত্বে।[৭৫] ৯ই আগস্ট কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গেই কমিউনিস্ট পার্টি ব্রিটিশ দমন নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে তাদের কেন্দ্রীয় মুখপত্রে এক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। সেটির মূল বক্তব্য হলো :

"সাম্রাজ্যবাদী ঔদ্ধত্য তাহাদের পাগল করিয়া দিয়াছে। আমাদের মাতৃভূমিকে তাহাদের অধিকারে রাখিবার লোভ তাহারা ছাড়িতে পারে না। তাই তাহারা আমাদের জাতীয় শক্তিকে ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছে। তাহারা ভারতবর্ষকে রক্ষা করিতেছে না, তাহারা ভারতবর্ষের গলায় ফাঁসি দিতেছে। তাহারা মিত্রপক্ষের আদর্শকে শক্তিশালী না করিয়া ক্ষুণ্ণ করিতেছে।"[৭৬]

ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনকে জোরদার করে তোলার জন্য এবং জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের কাছে যে বিশেষ দাবীগুলি পেশ করে, সেগুলি হলো :

১) সমস্ত কমিউনিস্ট বন্দী ও আটক ব্যক্তিদের বিনাশর্তে মুক্তি দিতে হবে।

২) যাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত ও যারা নজরবন্দী সেইসব কমিউনিস্টদের উপর থেকেও আরোপিত বিধি নিষেধ তুলে নিতে হবে।

৩) আত্মগোপনকারী সব কমিউনিস্টদের উপর থেকে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রত্যাহার করে নিতে হবে।

৪) 'ন্যাশনাল ফ্রন্ট' ও 'নিউ এজ' প্রভৃতি সকল কমিউনিস্ট পত্র-পত্রিকার উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিতে হবে।

৫) ফ্যাসিস্ত-বিরোধী প্রচার-আন্দোলন সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে নতুন পত্র-পত্রিকা ও প্রচারপত্র প্রকাশের অনুমতি কমিউনিস্ট পার্টিকে দিতে হবে।[৭৭]

এছাড়াও সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত বিভিন্ন তথ্য থেকে এটা জানা যায় যে, কমিউনিস্ট পার্টির উচ্চতর নেতৃত্ব সেই সময় জাপানী আক্রমণকারীদের প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের কাছে অস্ত্র এবং গেরিলা প্রশিক্ষণের দাবী জানায়। এই সব বিষয় নিয়ে তৎকালীন পার্টি সম্পাদক পি. সি. যোশী ও ভাইসরয় কাউন্সিল-এর হোম মেম্বর রেজিল্যাণ্ড ম্যাক্সওয়েল-এর মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষার ব্যবস্থা ছিল বলে সি. পি. আই-র তৎকালীন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অরুণ বোস জানিয়েছেন।[৭৮]

এসব সত্ত্বেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী প্রশাসন কিন্তু সবসময়েই কমিউনিস্টদের সন্দেহের চোখেই দেখত। যেসব গবেষক বা ব্যক্তি জনযুদ্ধের কালে কমিউনিস্ট-ব্রিটিশ সম্পর্ককে 'মধুচন্দ্রিমার কাল' বলে মনে করেন, তাঁরা ঐতিহাসিক তথ্য সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিফহাল নন বলেই মনে হয়। ১৯৪২-এর ৪ঠা মে বোম্বাই-এর গভর্নর স্যার রোজার লাম্‌লী, বড়লাট লিনলিথগোকে এক গোপন পত্রে লেখেন :

"কমিউনিস্ট পার্টি পরিপূর্ণভাবে যুদ্ধে সমর্থন জানাচ্ছে—এই সমর্থন গ্রহণ

করলে ব্যাপারটা বেশ গোলমেলে হয়ে উঠবে।…প্রথমত সৈন্যবাহিনী ও পুলিশবিভাগে তাদের গ্রহণ করা অসম্ভব। তারা সৈন্যদল ও পুলিশে প্রবেশ করতে চায় নিজেদের ঘাঁটি গড়বার জন্য এবং সুবিধামতো সময়ে সেইসব ঘাঁটিগুলিকে তারা নিজেদের কাজে লাগাবে। জেল থেকে হয়তো কমিউনিস্টদের ছেড়ে দিতে আমরা বাধ্য হবো, কিন্তু এই বামপন্থীরা যদি ভারতবর্ষে আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে, তাহলে ধনিকশ্রেণী ও মালিকগোষ্ঠী আতঙ্কিত হয়ে পড়বে।…মালিকরা ছাড়াও ধনবান ব্যক্তিরা ও উচ্চমধ্যবিত্তরা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে, কেন না তারা কমিউনিস্ট ও সর্বহারাদের শাসন সম্বন্ধে আতঙ্কিত।… কমিউনিস্টদের প্রভাব বাড়ছে দেখলে যে সামাজিক অস্থিরতা ভারতে দেখা দেবে, তার কথা ভেবে, কমিউনিস্টদের সম্পর্কে আমাদের খুবই সন্তর্পণে পা ফেলা উচিত।”…৭৯

১৯৪২-এর ৭ই জুলাই ভারত-সচিব এমেরি বড়লাট লিনলিথগোকে এক গোপন পত্রে লেখেন :

“যেসব বামপন্থী, ফ্যাসিস্ত-বিরোধী বলে নিজেদের ঘোষণা করেছে—তারা ছাত্র, কৃষক, ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী বা কমিউনিস্ট যেই হোক না কেন, তাদের সঙ্গে আমাদের সহযোগিতা করা ছাড়া উপায় নেই…কিন্তু ভবিষ্যতে এরা মোটেই নির্ভরযোগ্য থাকবে না। তা যদি নাও হয়, ভবিষ্যত ভারতে বামপন্থীদের প্রভাব বাড়বেই এ কথাটা বুঝতে পারলে, বিড়লা ও তাদের সাঙ্গপাঙ্গরা আবার অনেক ভদ্র ব্যবহার করবে।”৮০

‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলনের ১৫ দিন পূর্বে, ১৯৪২-এর ২৩শে জুলাই, বাঙলার গভর্নর স্যার জন হাবার্ট, বড়লাট লিনলিথগোকে এক গোপন পত্রে লেখেন :

“ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সম্বন্ধে উদারনীতি গ্রহণ যে খুবই বিপজ্জনক, তা আমি আগেই লিখেছি। গত ১৫ দিনের ঘটনাবলী আমার সন্দেহকে সঠিক বলে প্রমাণ করেছে। …কমিউনিস্ট পার্টি এবং ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীরা জাপান-বিরোধী জনসভায় যেসব বক্তৃতা করেছে, তার থেকে স্পষ্টভাবেই বোঝা যাচ্ছে যে, আমাদের গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে প্রচার বন্ধ করার তাদের কোনো বাসনাই নেই।…তাছাড়া সৈন্যবাহিনী ও জনসাধারণের মধ্যে সংযোগরক্ষাকারী কর্মচারী (Liason) রূপে ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীদের নিয়োগ করার প্রস্তাবকে আমি মারাত্মকভাবে ভুল মনে করি, কেন না এই সংযোগরক্ষাকারীরা আমাদের উপকার করবে যৎসামান্য, কিন্তু তার চেয়ে ঢের বেশি বিপদের কারণ হয়ে উঠবে।”…৮১

১৯৪২ এর ৪ঠা জুলাই স্বরাষ্ট্রদপ্তরের গোপন দলিলে জানানো হয় :

“ফ্যাসিবাদ-বিরোধী হলেও, কমিউনিস্টরা তাদের মতামত বদলায়নি। তারা এখনও ঘোরতর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদকে এখনও তারা জনগণের শত্রু মনে করে। তারা জাতীয় সরকার গঠনে উদগ্রীব, কেন না

তারা বুঝতে পেরেছে যে, যতদিন ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ থাকবে, ততদিন এই যুদ্ধকে জনযুদ্ধে রূপান্তরিত করা যাবে না। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম অব্যাহত আছে ও থাকবে…"[৮২]

১৯৪৩-এর ২০শে সেপ্টেম্বর গভর্নমেন্টের স্বরাষ্ট্রদপ্তর থেকে সমস্ত প্রাদেশিক সরকারগুলির কাছে যে গোপন পত্র পাঠানো হয় [নং ৭/১৫/৪২—পোল্ (১)] তাতে যা বলা হয় তার মর্মার্থ হলো :

"…সুস্পষ্টভাবে কমিউনিস্ট পার্টি এই সময়কালে তার ক্ষমতা, প্রভাব ও সদস্য সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি করতে পেরেছে।…কমিউনিস্টরা একটি সাময়িক আর একটি দীর্ঘকালীন উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করছে, যা যুদ্ধের পরে তারা প্রয়োগ করবে।…প্রধানত এই পার্টি একটি জাতীয়তাবাদী পার্টি—তা সে আন্তর্জাতিকতার কথা মুখে যতই বলুক না কেন। এরা জাতীয় স্বাধীনতার জন্যই কাজ করছে এবং এই পার্টির অধিকাংশ সদস্যই এই মুহূর্তেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্য উচ্ছেদের পক্ষে।…ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি আমাদের কাছে এক বড় বিপদ রূপে দেখা দিতে পারে।"[৮৩]

বিহার কমিউনিস্ট পার্টির কাজকর্ম সম্পর্কেও বিস্ময়কর কিছু তথ্য পাওয়া যায় বিহারের গভর্নর মিঃ মুডি কর্তৃক ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়াভেলকে ২৭শে অক্টোবর, ১৯৪৩ সালে লিখিত এক গোপন পত্র থেকে (নং-ডি. ও, ৭১০. জি. বি)। এর মর্মার্থ হলো :

"কমিউনিস্টরা প্রসারণের কৌশল অবলম্বন করে দ্রুত নিজেদের প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। এরা শ্রমিক ও কৃষকদের সংগঠিত করার কাজ করছে এবং কংগ্রেসের সঙ্গে ঐক্য বজায় রেখে কিসাণ সভা ও ট্রেড ইউনিয়নে ঐক্য বজায় রেখে চলেছে এবং এক্ষেত্রে কংগ্রেস-নীতিকেই সমর্থন জানাচ্ছে। এই প্রদেশে অনেক কমিউনিস্ট 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে অংশগ্রহণও করেছিল, যদিও পরবর্তীকালে তারা তাদের প্রচারপত্রে যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় অন্তর্ঘাতের যাবতীয় প্রচেষ্টাকে বিপজ্জনক বলে নিন্দা করে। কিন্তু তথাপি তারা এই 'গণবিক্ষোভে'র পশ্চাতে গভর্নমেন্টের প্ররোচনাকেই দায়ী করছে এবং সমস্ত কংগ্রেস নেতার মুক্তি দাবি করছে।…কার্যত এই প্রদেশে কমিউনিস্টরা যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় কোনো সহযোগিতাই করছে না, বরঞ্চ তাদের ফ্যাসিস্ত-বিরোধী প্রচার জাতীয় কংগ্রেসেরই পক্ষে যাচ্ছে। সর্বত্র তারা গভর্নমেন্টের সমালোচনাই করছে।"…[৮৪]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ২৬শে জানুয়ারি, ১৯৪৩, কমিউনিস্ট পার্টি দেশের সর্বত্র জাতীয় স্বাধীনতা দিবস পালনের আহ্বান জানায় এবং এসম্পর্কিত কেন্দ্রীয় কমিটির একটি ইস্তাহার প্রকাশ করে। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট এতে অসন্তুষ্ট হয়।[৮৫]

বস্তুত, 'জনযুদ্ধে'র নীতি গ্রহণ করার পরেও কমিউনিস্ট নেতৃত্বের মধ্যে এই লাইন চালিয়ে যাওয়া নিয়ে একটা বিতর্ক থেকেই গিয়েছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠ পার্টি নেতারা 'জনযুদ্ধে'-র তত্ত্বে আস্থাশীল হলেও কেউ কেউ পার্টিকে এই লাইন পরিত্যাগ করে

ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করার লাইন গ্রহণ করারও প্রস্তাব দেয়। কিন্তু তা প্রত্যাখ্যাত হয় বলে ১৯৪৩ সালে গঠিত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অরুণ বোস মতপ্রকাশ করেছেন।[86] তিনি নিজেও নাকি ছিলেন 'সরকারী লাইনে'র বিরোধী। সুতরাং বিহার প্রদেশের মতো কংগ্রেস ও সোস্যালিস্ট প্রভাবিত প্রদেশে এমনটি ঘটতেই পারে। কিন্তু বাঙলা প্রদেশে এই জাতীয় সমস্যা আত্মপ্রকাশ করেনি বললেই চলে; কারণ 'জনযুদ্ধ'-সংক্রান্ত নীতির বাস্তব রূপায়ণ অত্যন্ত দক্ষভাবে বাঙলা প্রদেশেই সমাধা করা হয়। যাহোক, কমিউনিস্টরা 'জনযুদ্ধ'-নীতি গ্রহণ করা সত্ত্বেও যে ব্রিটিশের তাঁবেদারে পরিণত হয়নি, উপরোক্ত তথ্যগুলি (এরকম আরও অসংখ্য তথ্য আছে) তারই প্রমাণ।

প্রকৃতপক্ষে, জনযুদ্ধের নীতি গ্রহণ করার পরেই কমিউনিস্ট পার্টি সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তাদের পরিবল্পনা ও কর্মসূচী নির্ধারণ করে নেয়। সরকারী গোপন তথ্যদলিল থেকে ওই সময়কালে কমিউনিস্ট পার্টির কার্যক্রমের যেসব বিবরণ পাওয়া যায় তাতে দেখা যাচ্ছে যে, পার্টি সব থেকে অগ্রাধিকার দিয়েছিল দেশব্যাপী ফ্যাসিস্ত-বিরোধী প্রচার-আন্দোলন সংগঠিত করার উপরই। দেশের বিপুল সংখ্যক অসংগঠিত জনসাধারণকে, যারা চরম ব্রিটিশ-বিরোধী এবং ভারত-ছাড়ো আন্দোলনের প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ সমর্থক, তাদেরকে জনযুদ্ধের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিয়ে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনে টেনে আনা ছিল অত্যন্ত কঠিন কাজ। কমিউনিস্ট পার্টি তাই বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় সংবাদপত্র ও প্রচার-পুস্তিকা প্রকাশ, প্রদেশে প্রদেশে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী প্রদর্শনী ও 'মেলা'র আয়োজন করার প্রস্তুতি নেয়। কমিউনিস্ট পার্টি তার সদস্য এবং জঙ্গী কর্মীদের নিয়ে জাপ-আক্রমণের বিরুদ্ধে এমন এক 'গেরিলা বাহিনী' গড়ে তোলার চেষ্টা করে—যারা ফ্যাসিস্ত-বিরোধী যুদ্ধে প্রাণ দেবার জন্যও প্রস্তুত থাকবে। তাছাড়া অঞ্চলে অঞ্চলে 'জনরক্ষী বাহিনী' গড়ে তোলা এবং যুদ্ধের প্রয়োজনে উৎপাদন-ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে সচেতন করে তোলার কাজও শুরু করা হয়।[87] এ ব্যাপারে সব থেকে সাফল্য অর্জন করে নিঃসন্দেহে বাঙলা প্রদেশ। কারণ, বাঙলায় বহুপূর্ব থেকেই ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনের একটি মহৎ ঐতিহ্য ছিল। তাছাড়া এই প্রদেশের বুদ্ধিজীবী এবং সাংস্কৃতিক কর্মীদের মধ্যে মার্কসবাদ ও কমিউনিজমের আদর্শ একটি স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন ও বামপন্থী মতাদর্শের একটি ধারাও অন্য প্রদেশের তুলনায় বাঙলায় ছিল অনেক বেশি শক্তিশালী। তাই সব মিলিয়ে বলা যায়, অবিভক্ত বঙ্গ প্রদেশই ছিল সর্বভারতীয় ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু।

১৯৩৪ সাল থেকে আট বছর বে-আইনী অবস্থায় কাটাবার পর ১৯৪২ সালের ২৩ শে জুলাই ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি'র উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয়। কমিউনিস্ট পার্টি বৈধ হওয়ার পরেই কমিউনিস্ট পার্টির বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির সাপ্তাহিক বাংলা মুখপত্র 'জনযুদ্ধ' পত্রিকায়

সোমনাথ লাহিড়ী এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে লেখেন :

"...নিষেধাজ্ঞা উঠিয়া যাওয়ায় আজ পার্টির কর্মীদের দায়িত্ব শতগুণ বাড়িয়াছে। যুদ্ধের জন্য, জাতীয় গভর্নমেণ্টের জন্য, জাতীয় ঐক্যের জন্য কমিউ-নিস্টদিগকে আজ কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে। অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে একটি বিরাট জাতিকে ফ্যাসিস্ট শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করিতে হইবে। এইকাজে সফলতা লাভ করিবার জন্য অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে পার্টির গণভিত্তি বাড়াইতে হইবে, পার্টিকে সমগ্র শোষিত জনগণের পার্টিতে পরিণত করিতে হইবে। একাজ অবসর সময়ের কাজ নহে, ইহার জন্য প্রত্যেক কর্মীকে ২৪ ঘণ্টা পার্টির কাজে নিযুক্ত থাকিতে হইবে, মৃত্যুবরণ করিবার জন্য দিবারাত্রি প্রস্তুত থাকিতে হইবে।"[৪৮]

প্রকৃতপক্ষে, কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে এই আহ্বান ঘোষিত হওয়ার অনেক পূর্ব থেকেই ১৯৪১-এর ২২শে জুন সোভিয়েত ইউনিয়ন নাৎসী-বাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাঙলার কমিউনিস্টরা সক্রিয় হয়ে ওঠেন এবং পার্টির 'জনযুদ্ধ' লাইন গ্রহণের পূর্বেই গঠন করেন 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি' বা **'Friends of Soviet Union'** (১৯৪১)।

৩. সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি গঠন :

১৯৪১-এর ২২শে জুন সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন নাৎসী বাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বে-আইনী-অবস্থা-তেই কংগ্রেসের অভ্যন্তরে থেকে প্রচণ্ড সংগ্রাম চালাচ্ছে। জনযুদ্ধের নীতি তখনও গৃহীত হয়নি। যুদ্ধের প্রকৃতি ও তার চরিত্র নিয়ে পার্টির মধ্যে বিতর্ক চলেছিল ছয় মাস। কিন্তু বাঙলাদেশের প্রগতিশীল ও মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীরা প্রায় প্রথম থেকেই সক্রিয় হয়ে ওঠেন আক্রান্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে জনমত গঠন করার কাজে। বাঙলায় তখন ফ্যাসিস্ত-বিরোধী সংগঠন রূপে ওয়াই. সি. আই. বেশ সক্রিয় ছিল। কিন্তু সেটা ছিল প্রধানত ছাত্র-যুবকদেরই সংগঠন এবং তার তেমন কোনো ব্যাপ্তি বা গণভিত্তিও ছিল না, যদিও আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁদের কর্মপ্রচেষ্টাকে তৎকালীন বিচারে ক্ষুদ্র বলা চলে না। এছাড়া বাঙলায় এম. এন. রায়গোষ্ঠী মোটামুটি ধারাবাহিকভাবে তাদের মতো করে এক ধরনের ফ্যাসিস্ত-বিরোধী প্রচার চালিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু তার প্রভাব ছিল খুবই নগণ্য এবং তা ছিল ব্রিটিশ মুখাপেক্ষী।

অথচ সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি একটা উচ্চধারণা ও সহানুভূতি বাঙলার অধিকাংশ বুদ্ধিজীবীর মধ্যেই প্রথমাবধি লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি' প্রকাশের (১৯৩০) পর অনেক অমার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী এবং সাধারণ মানুষের মধ্যেও রাশিয়া সম্পর্কে একটা ভালো ধারণার সৃষ্টি হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন বহু ব্যক্তিই (কমিউনিস্টরা ছাড়াও) সেসময় বাঙলায় ছিলেন।

সুতরাং আক্রান্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থনে এগিয়ে আসার জন্য একটা মনোভাব ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। যদিও কমিউনিস্টরাই প্রধানত সোভিয়েতের প্রতি সমর্থনসূচক এই প্রতিক্রিয়াকে সংগঠিত করেছিল, তথাপি অনেক অকমিউনিস্ট এবং কমিউনিস্ট-বিরোধীরাও 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি'র আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। এইভাবে 'জনযুদ্ধ'-র প্রারম্ভিক পর্যায়েই এফ এস. ইউ প্রথম ফ্যাসিস্ত-বিরোধী প্রকৃত গণআন্দোলনকে সংগঠিত করতে অগ্রসর হয়। এই আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন বাঙলার প্রখ্যাত বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক সহ শ্রমিক ও কৃষক সমাজের অগ্রণী অংশ। প্রকৃতপক্ষে, এই গণআন্দোলন এবং 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি'র মতো সংগঠন গড়ে তোলা ছিল তখন একান্তভাবেই অপরিহার্য। কারণ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বতীব্র ক্ষোভ ও অসন্তোষের ফলে বাঙলার সাধারণ মানুষ এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একটা বড় অংশ বিভ্রান্তির শিকার হয়ে সেই সময় নাৎসী জার্মানী ও ফ্যাসিস্ত শক্তিজোটকে সমর্থন করতেও শুরু করেছিল। মধ্যবিত্তশ্রেণীর অনেকেই মনে মনে এবং প্রকাশ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে হিটলারের বিজয়ও কামনা করত। অস্বাভাবিক হলেও এটাই ছিল তৎকালীন বাস্তব পরিস্থিতি।[৮৯]

এই পরিপ্রেক্ষিতেই দেখা গেল, সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হওয়ার একমাসের মধ্যেই ২১শে জুলাই (১৯৪১), সোমবার, বাঙলার শ্রমিক-কৃষক ও বুদ্ধিজীবীদের উদ্যোগে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপনের এবং সাহায্য সংগ্রহের জন্য 'সোভিয়েত-দিবস' পালনের আয়োজন করা হয়েছে। এর আগের দিন, অর্থাৎ ১৯শে জুলাই, নিখিল ভারত কিষাণ সভার অস্থায়ী সাধারণ সম্পাদক, সাহিত্যিক গোপাল হালদার লণ্ডনস্থ সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত মেইস্কির কাছে নিম্নলিখিত মর্মে এক তারবার্তা প্রেরণ করেন :

> "আগামী কল্য কিষাণ সভার উদ্যোগে পাঁচলক্ষ কৃষক 'সোভিয়েট দিবস' পালন করিবে, এবং শ্রমিকগণ তাহাতে সহযোগিতা করিবে। ডঃ স্যার পি.সি. রায় প্রমুখ বহু লেখক এবং বিদ্বান ব্যক্তি এবং দশ বারো জন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক এতৎসম্পর্কে এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রকে আমাদের সম্ভাষণ এবং শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিবেন।"[৯০]

ঐ দিনই—'মানব কল্যাণে সোভিয়েটের অবদান : নাৎসী সামরিক অভিযানে পৃথিবীর ইতিহাসে নূতন অধ্যায়ের সূচনা : সোভিয়েট রুশিয়ার প্রতি বাংলার মনীষীবৃন্দের সহানুভূতি'—এই শিরোনামে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় লেখক-শিল্পী ও মনীষীদের এক আবেদনমূলক বিবৃতি প্রকাশিত হয়। এর প্রথম ও শেষ অনুচ্ছেদ হলো নিম্নপ্রকার :

> "সোভিয়েট ইউনিয়নের উপর নাৎসী আক্রমণ পৃথিবীর ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছে। বিশাল রণক্ষেত্র জুড়িয়া যন্ত্র ও মানুষের তাণ্ডব চলিতেছে ; ব্যাপকতায় এ যুদ্ধ অভূতপূর্ব। এই সংকটকালে আমরা মনে করি,

নৈতিক ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিপুল কীর্তির প্রতি সর্বসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করা একান্ত কর্তব্য। আমরা কেহ কেহ সোভিয়েট শাসনের কোন কোন বিষয়ের বিরুদ্ধে সমালোচনা করিয়া থাকি; কেহ কেহ মার্কসবাদ সমর্থনও করি না। কিন্তু জার আমলের কুশাসনের যে কুৎসিৎ উত্তরাধিকার সোভিয়েট ইউনিয়নকে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল এবং তারপরে সদ্যোজাত সোভিয়েটের বিরুদ্ধে প্রায় সমস্ত রাষ্ট্রের যে মারাত্মক আক্রমণ চলিয়াছিল, তাহা যখন স্মরণ করা যায়, তখন সোভিয়েটের বর্তমান কীর্তিকে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।...

"কুড়ি বৎসরের প্রবল বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও সোভিয়েট ইউনিয়নের জনসাধারণ এক নূতন সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছে। সেই সভ্যতা যখন বিপদাপন্ন, তখন আমরা বহু যুগব্যাপী অন্নাভাবে জীর্ণ, হীনতায় নিমজ্জিত ভারতবাসীরা নিরুদ্বিগ্ন থাকিতে পারি না। আমরা অসহায় ও পরাধীন, তথাপি সোভিয়েটে অন্ততঃ আমাদের শুভ কামনা আমরা প্রেরণ করিতে পারি।"[১১]

এই ঐতিহাসিক বিবৃতি ও আবেদনের শেষে প্রথমেই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের নাম বড় করে ছাপা হয়। স্বাক্ষরকারী আর যেসব প্রখ্যাত লেখক, শিল্পী, সাংবাদিক, শিক্ষক ও আইনজীবীর নামের তালিকা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় তাঁরা হলেন:

সাহিত্যিক ও শিল্পী: প্রমথ চৌধুরী, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, যামিনী রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী, হিরণকুমার সান্যাল, নীরেন্দ্রনাথ রায়, গোপাল হালদার, আবু সয়ীদ আইয়ুব, আব্দুল কাদের, সমর সেন, বিনয় ঘোষ, অজিত চক্রবর্তী, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য।

আইনজীবী (হাইকোর্ট, বার-লাইব্রেরী): অরুণ সেন, অবনী ব্যানার্জী, সুকুমার মিত্র, এন. এস. মালেহজি, স্নেহাংশুকান্ত আচার্য, জ্যোতি বসু।

অধ্যাপক: নির্মল ভট্টাচার্য, সুশীল দত্ত (স্কটিশ চার্চ কলেজ)। আনন্দকৃষ্ণ সিংহ, বিজয়কুমার রায়, সতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত, ভবতোষ দত্ত, নন্দলাল ঘোষ (রিপণ কলেজ)। এস. এন. সেনগুপ্ত, করুণাময় মুখার্জি (বঙ্গবাসী কলেজ)। প্রভাসচন্দ্র ঘোষ (বিদ্যাসাগর কলেজ)। অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র (ভিক্টোরিয়া ইনস্টিট্যুশন)।

অধ্যক্ষ: রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ (রিপণ কলেজ), প্রশান্তকুমার বসু (বঙ্গবাসী কলেজ). বীরেশচন্দ্র গুহ (বিজ্ঞান কলেজ)।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়: কালিদাস নাগ, অমিয়কুমার সেন, নারায়ণচন্দ্র ব্যানার্জি, জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রিপুরারি চক্রবর্তী, এন. কে. সিংহ, হুমায়ুন কবীর, নীহাররঞ্জন রায়, বটকৃষ্ণ ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এল. পি. সুকুল, এ. বি. এন. হবিবুল্লা, ধীরেন্দ্রনাথ সেন, পি. সি.

গুপ্ত, হরিচরণ ঘোষ, রেণু রায়, নিখিল চক্রবর্তী, সরসীকুমার সরস্বতী।

সাংবাদিক: হেমচন্দ্র নাগ (সম্পাদক, হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড), বঙ্কিমচন্দ্র সেন (সম্পাদক, দেশ), সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, মৃণালকান্তি বসু (অমৃতবাজার পত্রিকা), বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদক, যুগান্তর), অমল হোম (সম্পাদক, মিউনিসিপ্যাল গেজেট), জ্যোতিষ ভৌমিক (সম্পাদক, ফরোয়ার্ড), এ. আর. মলিহাবাদী (সম্পাদক, রোজানা হিন্দ্)।

এ-প্রসঙ্গে প্রগতি-সংস্কৃতি আন্দোলনের গবেষক নেপাল মজুমদার-এর মতে স্বাক্ষরকারী বুদ্ধিজীবীদের অধিকাংশই ছিলেন অরাজনৈতিক এবং মার্কসবাদ-বিরোধী। তথাপি ফ্যাসিস্ত বিরোধিতার গণমঞ্চে ঐক্যবদ্ধ হতে এঁদের আটকায়নি। বাঙলার ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনের ইতিহাসে এটা সত্যিই এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।[২২]

যাহোক, পূর্বোক্ত ঘোষণা অনুসারে ২১ শে জুলাই (১৯৪১) সারা দেশে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি সহমর্মিতা ও সমর্থন জ্ঞাপনের জন্য 'সোভিয়েট-দিবস' উদ্‌যাপিত হয়। বলাবাহুল্য, কমিউনিস্ট এবং বামপন্থী প্রগতিশীল গণসংগঠনগুলিই ছিল এর প্রধান উদ্যোক্তা। ঐ দিনই 'সোভিয়েট-দিবস' উপলক্ষে কলিকাতা 'টাউন-হল'-এ বাঙলার শ্রমিক-কৃষক ও বুদ্ধিজীবীদের একটি বিশাল জনসভা হয়। এই সভাতেই আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয় 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি' বা **'Friends of the Soviet Union'**; পরদিন 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় এই সভার বিবরণ প্রকাশ করে লেখা হয়:

> "সোভিয়েট দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে সোমবার সায়াহ্নে সোভিয়েত রাশিয়ার উপর জার্মান আক্রমণের প্রতিবাদকল্পে টাউন হলে শ্রমিক-কৃষক, ছাত্র-যুবক ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের এক মহতী জনসভা হয়। শ্রমিকগণ লাল পতাকা হস্তে বিভিন্ন ধ্বনি করিতে করিতে সভায় সমবেত হয় এবং 'নাৎসীবাদ ধ্বংস হউক' 'সোভিয়েট জিন্দাবাদ' প্রভৃতি ধ্বনি দ্বারা সভাস্থল মুখরিত করিয়া তোলে। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় নিম্নলিখিত মর্মে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়:
>
> "এই সভা সোভিয়েট রাশিয়ার জনগণের প্রতি এবং সাহসী লাল পল্টনের প্রতি গভীর সহানুভূতি প্রকাশ এবং আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছে। এই সভা আশা করে যে, সোভিয়েট রাশিয়া এই সংগ্রামে অতি সত্বর সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করিবে। নাৎসীবাদের ধ্বংসের জন্য এই সভা দাবী করিতেছে যে, অবিলম্বে (১) ভারতের সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদিগকে মুক্তি দেওয়া হউক; (২) জাতীয় সৈন্যদল গঠন করা হউক; (৩) ভারতে গণতন্ত্র স্থাপন করা হউক।
>
> "এই সভা প্রস্তাব করিতেছে যে, রাজনৈতিক মতবাদ-নিরপেক্ষ সমস্ত প্রগতিশীল দলের একটি সঙ্ঘ গঠন করা হউক। উহার নাম হইবে 'ফ্রেণ্ডস্ অব সোভিয়েট'। এই সঙ্ঘ সোভিয়েট রাশিয়ার বিপুল সংগঠন পরিকল্পনা সম্বন্ধে, বিশেষভাবে

এশিয়ায় অনুন্নত জনসাধারণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রবর্তন ও প্রসার বিষয়ে এদেশের জনগণকে সজাগ করিয়া তুলিবে এবং সোভিয়েট রাশিয়ার বর্তমান সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় উহাকে আর্থিক ও নৈতিক সাহায্য দানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে।"[৯৩]

এই সব ঘটনা যখন ঘটছে রবীন্দ্রনাথ তখন গুরুতরভাবে অসুস্থ। ২৫শে জুলাই তাঁকে বোলপুর থেকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয় এবং এর দিন তিনেক পরে 'সোভিয়েত সুহৃদ সংঘে'-র উদ্যোক্তারা কবির সঙ্গে যোগাযোগ করলে এই আশ্বাস পান যে, কবি একটু সুস্থ হয়ে উঠলেই তাঁদের সংঘের অন্যতম পৃষ্ঠপোষকরূপে কাজ করবেন। কিন্তু কবির আকস্মিক জীবনাবসানের ফলে তা আর হয়ে ওঠে না।[৯৪]

এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, 'সোভিয়েত সুহৃদ সংঘে'-র সাংগঠনিক কমিটির নামের তালিকা সহ সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয় :

"গত ২১শে জুলাই, 'সোভিয়েট দিবস' উপলক্ষে টাউন হলে অনুষ্ঠিত জনসভায় গৃহীত এক প্রস্তাব অনুসারে নিম্নলিখিত সদস্যদের লইয়া 'সোভিয়েট ইউনিয়ন মিত্র সমিতি' সম্পর্কে একটি সংগঠন কমিটি গঠিত হইয়াছে :

মৌলবি সৈয়দ নৌশের আলি, শ্রীযুক্ত শিবনাথ ব্যানার্জী, মীরা দত্তগুপ্তা, নির্মল ভট্টাচার্য, বিষ্ণু দে, জ্যোতি বসু, শ্রীযুক্তা কমলা দাশগুপ্ত, মৃণালকান্তি বসু, ডাঃ চারু ব্যানার্জী, মিসেস স্টেলা ব্রাউন, বিনয় ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, চিরঞ্জী-লাল শ্রফ, বীণা দাশ, মিঃ এ. আর. মালিহাবাদী, এন. দত্তমজুমদার, এ. এস. আয়ুব, বুদ্ধদেব বসু, সজনীকান্ত দাস, আব্দুর রেজ্জাক খাঁ, মণিকুন্তলা সেন, বিবেকানন্দ মুখার্জী, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, (চেয়ারম্যান), সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার (কোষাধ্যক্ষ), হীরেন মুখার্জী, এস. কে. আচার্য (যুগ্ম-সম্পাদক), মনোরঞ্জন রায়, ধীরেন ধর এবং সুনীল সেন (সহ-সম্পাদক)।

"জানা গিয়াছে যে, স্বাস্থ্যের অবস্থা অনুকূল হইলে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সমিতির পৃষ্ঠপোষকরূপে কার্য করিবেন। ...কলকাতায় এই সম্পর্কে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত সংগঠন কমিটিই সমিতির সদস্য সংগ্রহ করিবেন, শাখা সমিতি গঠন করিবেন এবং জনসাধারণের নিকট অর্থ সংগ্রহ করিবেন।"[৯৫]

যাই হোক, সীতারামাইয়া-র কংগ্রেসের ইতিহাসে এত বড় তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার কোনো উল্লেখ না থাকলেও আমাদের মনে রাখা দরকার, হিটলারের রাশিয়া আক্রমণের প্রতিবাদে এবং সোভিয়েত রাশিয়ার সমর্থনে দেশের বামপন্থীদের সঙ্গে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, নরেশ সেন-গুপ্ত, যামিনী রায় প্রমুখ বাঙলার শ্রেষ্ঠ মনীষী ও লেখক-শিল্পীরা ঐক্যবদ্ধভাবে জনমত গঠনের জন্য এগিয়ে এসেছিলেন ; এটি ছিল নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা।

বস্তুত, সেই সময় যুদ্ধে ব্রিটিশের বিপর্যয়ের সংবাদে দেশের সাধারণ লোকের,

এমন কি একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর মধ্যেও চাপা আনন্দ ও উল্লাস প্রকাশ পায়। হিটলার এবং মুসোলিনী সম্পর্কেও একশ্রেণীর মানুষের মনে উচ্চ ধারণা ও আশা ছিল। কিন্তু সন্দেহ নেই যে, হিটলারের রাশিয়া অভিযানের সংবাদে তাদের এই ধারণা প্রচণ্ড আঘাত পায় এবং ক্রমশ অধিকাংশ ভারতবাসীর সমর্থন ও সহানুভূতি রাশিয়ার দিকেই ধাবিত হতে থাকে। কেন অধিকাংশ ভারতবাসী এই যুদ্ধে রাশিয়ার জয়লাভ কামনা করে, রামানন্দবাবু এর এক যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখিয়ে তাঁর সম্পাদিত 'মডার্ন রিভ্যু'-তে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করেন।[৯৬] প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, 'মডার্ন রিভ্যু' ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনে এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান সেইসময় রেখেছিল।

২১ শে জুলাই (১৯৪১) শুধু কলকাতাতেই নয়, হাওড়ার শিল্পাঞ্চলসহ আন্দুল, বাঁকুড়া, নাটোর, নদীয়া, বর্ধমান, করিমগঞ্জ, জামসেদপুর প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলেও 'সোভিয়েট দিবস' উদ্‌যাপিত হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায়। 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি'-র সাংগঠনিক কমিটি গঠনের পর (যুগ্ম-সম্পাদক : হীরেন্দ্রনাথ মুখার্জি ও স্নেহাংশুকান্ত আচার্য) কলকাতার ২৭নং বেকার রোডেই সমিতির স্থায়ী অফিস স্থাপিত হয়। ১লা আগস্ট এই অফিসে অনুষ্ঠিত হয় সাংগঠনিক কমিটির প্রথম সভা। সারাদেশে সংঘের শাখা কমিটি গঠনের সিদ্ধান্তও সভায় গৃহীত হয়। এর অনতিকাল পরেই বাঙলার কয়েকটি জেলায় ও অঞ্চলে গড়ে ওঠে সংঘের শাখা কমিটি।[৯৭]

'সোভিয়েত সুহৃদ্ সমিতি' তার প্রচার-আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে 'সোভিয়েত সিরিজ'-এর চারটি পুস্তিকা প্রকাশ করে। এর মধ্যে আপাতত মাত্র একটির সন্ধান পাওয়া গেছে। সেটি হলো—গোপাল হালদার প্রণীত 'সোভিয়েট যুদ্ধের তিন মাস,' এই সিরিজের 'পুস্তিকা নং ২'। সমিতির পক্ষ থেকে লেখক কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য : দুই আনা। হালকা হলুদ রঙের কভার পেপারে ছোট একটি ব্লক ব্যবহার করা হয়েছে—কাস্তে-হাতুড়ি ও তারার। পুস্তিকাটিতে প্রকাশকাল নেই, তবে মনে হয় ১৯৪১-এর সেপ্টেম্বর বা অক্টোবরে এটি প্রকাশিত হয়েছিল। তৃতীয় কভার পর্যন্ত বিস্তৃত প্রবন্ধটির পৃষ্ঠা সংখ্যা হলো সতেরো। চতুর্থ কভারে বিজ্ঞাপিত হয়েছে 'সোভিয়েত সুহৃদ্ সমিতি'র উদ্দেশ্য :

> "দেশবাসীর মধ্যে সোভিয়েট রাষ্ট্র ও তার নানা দিককার অপূর্ব সংগঠনের কথা, বিশেষ করে এশিয়াস্থ সোভিয়েট জাতিদের উন্নতির কথা জানানো—বর্তমান সোভিয়েট যুদ্ধের মূল কি, যুদ্ধ কিরূপ চলছে, এই যুদ্ধের ফলাফল সকল দেশ ও জাতির পক্ষে কি হতে পারে, দেশবাসীকে তা বোঝানো—ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থায়, তার জাতীয় স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রেখে সরাসরি যতটা সম্ভব সোভিয়েট রাষ্ট্রে আমাদের সাহায্য পৌছানো —"

এরপর ছিল 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি'তে যোগদানের আবেদন।[৯৮]

সমসাময়িককালে প্রকাশিত এবং হীরেন্দ্রনাথ মুখার্জী লিখিত একটি প্রবন্ধ থেকেও 'সোভিয়েত সুহৃদ আন্দোলন' এবং ঐ সংগঠনের কার্যক্রম সম্পর্কে অনেক

তথ্য জানা যায়। প্রবন্ধটির অংশবিশেষ নিম্নপ্রকার :

"সোভিয়েট সুহৃৎ সমিতির পক্ষ থেকে বাংলা, ইংরেজী, হিন্দী, উর্দুতে ছোট বড় বই আর ইস্তাহার বার করা হয়েছে।...লেখকেরা সবাই পুরোপুরি মার্কসবাদী না হলেও সোভিয়েটের বন্ধু; এঁদের একত্র করাই সমিতির সাফল্য। সোভিয়েট-এ দেশ থেকে যে টাকা পাঠান হয়েছে, তার প্রথম কিস্তি গিয়েছিল সমিতির সভ্য চিরঞ্জীলাল মারফৎ। তারপর নানা উপলক্ষ্যে আরও কিছু টাকা গিয়েছে, মলোটভ আর মাইস্কির কাছে তার পাঠানো হয়েছে—কিন্তু এসব নিয়ে কাগজ গরম করার চেয়ে সোভিয়েট সম্বন্ধে প্রচারকার্য চালানোই আমরা বেশী জরুরী মনে করে এসেছি।"[৯৯]

এইভাবে প্রাদেশিক সাংগঠনিক প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে নভেম্বর মাসে (১৯৪১) 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি'র উদ্যোগেই নিখিল ভারত সম্মেলন আহ্বান করা হয় কলকাতায়। ৭ই থেকে ১৭ই নভেম্বর পর্যন্ত অনেক জায়গায় সভাসমিতি হয়, শোভাযাত্রা আর পোস্টার-প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা ছিল। কনফারেন্স হয় ১৬ই তারিখে, পঞ্জাব কংগ্রেসের সভাপতি মিঞা ইফতিকারউদ্দিনের সভাপতিত্বে। কনফারেন্সে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, রাধাকৃষ্ণণ, অধ্যাপক কোশাম্বি, অধ্যাপক কে. টি. শাহ, অধ্যাপক ধ্যানচাঁদ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রেরিত বাণী পাঠ করা হয়। সম্মেলনের সাফল্য ছিল আশাতিরিক্ত; সোভিয়েতকে উদ্দেশ্য করে মূল প্রস্তাবটি গৃহীত হয়; এছাড়া আর একটি প্রস্তাবে সোভিয়েত ইউনিয়নে আমাদের দেশের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে পাঠাবারও ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়। সম্মেলন থেকে সারা দেশে সমিতির কাজ চালানোর জন্য একটি কমিটিও নিয়োগ করা হয়েছিল। কয়েকটি প্রদেশে এবং সিংহলেও স্থাপিত হয়েছিল সমিতির শাখা। কিন্তু তখনও পর্যন্ত যেহেতু সব প্রদেশে সমিতি গড়ে ওঠেনি সেইহেতু প্রধান কাজ প্রাদেশিক ভিত্তিতেই পরিচালিত হচ্ছিল।

বাঙলাদেশে সমিতির সম্পাদক হন জ্যোতি বসু। প্রায় প্রত্যেক জেলাতেই সমিতির কিছু কিছু কাজ হচ্ছিল। ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান, বাঁকুড়া, রংপুর, ময়মনসিংহ, জলপাইগুড়ি, খুলনা, নোয়াখালি—এই ক'টা জেলার সঙ্গে প্রাদেশিক সমিতির নিয়মিত যোগাযোগ স্থাপিত হয়। যশোর, মুর্শিদাবাদ, চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর, দিনাজপুর, ফরিদপুর, ঢাকা ও নদীয়াতেও জেলা সমিতি গঠিত হয়েছিল। কলকাতা শহরে আবার উত্তর, দক্ষিণ, মধ্য ও পূর্ব এলাকায় কাজের সুবিধার জন্য আলাদা কমিটি ছিল।[১০০]

সতি কথা বলতে কি, 'সোভিয়েত সুহৃদ্ সমিতি'র সংগঠন গড়ার কাজ মোটেই সহজসাধ্য ছিল না। কমিউনিস্ট পার্টি তখন ছিল বেআইনী। অথচ ফ্যাসিস্ত-বিরোধী এই আন্দোলনের এবং 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি' গঠনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন এরাই। সুতরাং ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের দমননীতি ও গ্রেপ্তারী পরোয়ানা এড়িয়ে এই কাজ করা খুবই কঠিন ছিল। এ-প্রসঙ্গে হীরেন্দ্রনাথ মুখার্জি লিখেছেন :

"…সরকারী দমননীতির ফলে অনেক সময় এমন অবস্থা ঘটেছিল যে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী সম্মেলনের আয়োজন করার কোনো সংস্থাই ছিল না—সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি ছাড়া আর সমিতি সরকারের বিরাগভাজন হয়েই চলেছে। আপাতদৃষ্টিতে সমিতির পক্ষে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী সম্মেলন করা যদি কারো কাছে অযৌক্তিক লাগে তো স্মরণ করতে হয় যে এখন পৃথিবীতে এমন পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে যাতে ফ্যাসিস্টের বিষদাঁত ভাঙতে পারলেই সোভিয়েটকে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করা যায়।"[১০১]

সোভিয়েত সুহৃদ্ সমিতি গঠনের পর থেকেই তা সত্যিই দলমত-নির্বিশেষে এক ব্যাপক ভিত্তি লাভ করে। এ-প্রসঙ্গে হীরেন মুখার্জি আরো লিখেছেন:

"সমিতির কাজ আর বিস্তার আজ সুদূরপ্রসারী হয়ে পড়েছে। খানিকটা এর ফলেই দেখা গেছে যে যাঁদের রাজনৈতিক চেতনা খুবই জাগ্রত, তাঁরাই কেবল সমিতির কাজে লেগে আছেন—অনেকে শুধু নামে কমিটিতে আছেন, কাজে তাঁদের বিশেষ সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রথম থেকেই সোভিয়েট সুহৃদ্ সমিতিকে খুব ব্যাপক করে গড়া হয়েছে—যাঁরা সাধারণতঃ রাজনীতির ধার ধারেন না, কিন্তু সোভিয়েটের সাফল্য সম্বন্ধে জোর গলায় বাহবা দিতে সঙ্কোচ করেন না তাঁদেরই তাই আজ এগিয়ে আসতে হবে।…সকলেই অবশ্য কর্মী নন। সভাসমিতি অনেকের ধাতে সয় না, বিপ্লবী আওয়াজ তোলা স্বভাববিরুদ্ধ, কিন্তু তাঁরা অনেকেই সমিতিতে যোগ দিয়েছেন, তাঁরা অনেকেই আজ ফ্যাসিজমের ছোবল থেকে দেশকে বাঁচাবার চেষ্টায় সাধ্যানুযায়ী লাগতে চাইছেন। আমাদের সমিতি যেন তাদের অবহেলা করে শুধু পাকা সাম্যবাদী কর্মীদের উপর নির্ভর না করে। যে ব্যাপক সমর্থন সমিতি প্রথম থেকে পেয়েছে, তাকে বাড়িয়ে তোলার চেষ্টাই আজ প্রধান কর্তব্য।"[১০২]

এই নীতি গ্রহণ করার ফলেই 'সোভিয়েত সুহৃদ্ সমিতি' অত্যন্ত দ্রুতগতিতে প্রসার লাভ করেছিল বাঙলাদেশের সর্বত্র। এমনকি বাঙলার বাইরে সুরমা উপত্যকা এবং শিলং-এও বিস্তৃত হয়েছিল সমিতির কাজকর্ম। শ্রীহট্টে যে প্রথম সম্মেলনটি হয় তাতে ভাষণ দেন সাহিত্যিক ও কৃষক সভার নেতা গোপাল হালদার (১৯৪১-এর ১৯ ডিসেম্বর)। একাজ মোটেই সহজ ছিল না। এ-প্রসঙ্গে চিন্মোহন সেহানবীশ লিখেছেন:

"সোভিয়েত সভ্যতা, তার আদর্শ ও কর্মকাণ্ডের সঙ্গে বাঙলাদেশের মানুষের তখনও পরিচয় ছিল যৎসামান্য। **Sea Customs** আইনের সতর্ক প্রহরা পেরিয়ে আসল খবর খুব অল্পই পৌঁছাতো এদেশে। সাধারণ পাঠকের উপযোগী মালমশলার একান্ত অভাব ছিল। সরকারী বিধিনিষেধের বেড়াজাল এড়িয়ে যে দু'চারটি বই বা পুস্তিকা এদেশে প্রকাশিত হত তাতে খবর থাকত সামান্যই—হাজারো বিকৃতি ও কুৎসার তোড়ে তারা ভেসে যেত অনেকখানি।… এই বিপুল অপরিচয় তার উপর তখনকার যথেষ্ট বিরূপ আবহাওয়ার

মুখে সেদিন 'সোভিয়েত সুহৃদ্ সমিতি' বাঙলাদেশের মানুষের কাছে সোভিয়েতের প্রকৃত রূপ তুলে ধরার পণ নিয়ে কাজে নামে।"[১০৩]

পরবর্তীকালে 'সোভিয়েত সুহৃদ্ সমিতি'-র আন্দোলন গড়ে ওঠে ৪৬নং ধর্মতলা স্ট্রীটের বিখ্যাত বাড়িটিকে কেন্দ্র করে। ১৯৪১ সালের মধ্যেই এই সংগঠন ও তার নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলন বাঙলায় ফ্যাসিস্ট-বিরোধিতার যে জোয়ার নব-পর্যায়ে নিয়ে আসে, 'জনযুদ্ধের যুগে' সেই ভিত্তির উপরেই ব্যাপক আকারে, বিরাট পটভূমিতে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে ধনঞ্জয় দাশ লিখেছেন :

"'সোভিয়েত সুহৃদ্ সমিতি'র মাধ্যমেই ভাঁটাপড়া সাংস্কৃতিক আন্দোলনে পুনর্বার জোয়ারের বেগ সঞ্চারিত হল। সোভিয়েত ভূমির পক্ষে জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে সমিতির কর্মীরা তখন একের পর এক জনসভা, পোস্টার-প্রদর্শনী, চলচ্চিত্র-প্রদর্শনী, সঙ্গীত-আসর প্রভৃতি পরিচালনা করতে থাকেন। 'সোভিয়েত সুহৃদ্ সমিতি'র অন্যতম নেতা মোহিত ব্যানার্জি নিজে তেমন সঙ্গীতজ্ঞ না হয়েও অনুবাদ করেছিলেন—'জাগো-জাগো-জাগো সর্বহারা', কিংবা 'সোভিয়েত ভূমি বিশ্ব-শ্রমিক প্রিয়'-র মতো আন্তর্জাতিক ও বিপ্লবী সঙ্গীত। আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি, সোভিয়েত সংস্কৃতির সঙ্গে এই সমিতিই সেদিন বাঙলার জনসাধারণ এবং বুদ্ধিজীবীদের ব্যাপক পরিচয় ঘটিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল।"[১০৪]

পঞ্চম অধ্যায়

জনযুদ্ধ-পর্যায় ঃ ফ্যাসিস্ত-বিরোধী সাহিত্য-আন্দোলন

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরো কর্তৃক 'জনযুদ্ধের নীতি' গৃহীত হয়। এই নীতির ভিত্তিতে ১৯৪২-এর সূচনা থেকেই কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে ও সক্রিয় উদ্যোগে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী প্রচার-আন্দোলন এবং সংগঠন গড়ার কাজ পুরোদমে শুরু হয়ে যায়। ইতিমধ্যেই 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি' বাঙলার প্রায় প্রতিটি জেলায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তার মাধ্যমেই ফ্যাসিস্ত-বিরোধী প্রচার-আন্দোলনও যথারীতি পরিচালিত হচ্ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হওয়ার পরে বাঙলার প্রতিষ্ঠিত ও প্রগতিশীল সাহিত্যিক মহলেও ফ্যাসিস্ত-বিরোধিতার প্রকাশ তখন ঘটতে শুরু করেছে। প্রকাশিত হচ্ছে 'পরিচয়', 'অরণি'ও 'ক্রান্তি'-র মতো ফ্যাসিস্ত-বিরোধী সাহিত্য পত্রিকা সমূহ। নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকা 'বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘ'কেও সক্রিয় করে তোলার একটা প্রাথমিক প্রচেষ্টা পুনর্বার শুরু হয়েছে। এই সময়পর্বে অত্যন্ত আকস্মিকভাবে ঘটে ঢাকার তরুণ সাহিত্যিক ও ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সক্রিয় ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী সোমেন চন্দ-র হত্যাকাণ্ড। এই পাশবিক, নিষ্ঠুর ও বর্বরোচিত ঘটনার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠলেন বাঙলার সকল স্তরের বিবেকবান মানুষ ও প্রতিষ্ঠান। সোমেন চন্দ-র হত্যাকাণ্ড ও তজ্জনিত প্রতিক্রিয়া থেকেই আত্মপ্রকাশ করে 'ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'।

১. সোমেন চন্দ-র হত্যাকাণ্ড ও তজ্জনিত প্রতিক্রিয়া ঃ

১৯৪১ সালের ২২শে জুন সোভিয়েত ইউনিয়ন নাৎসীবাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার অল্পকালের মধ্যেই ঢাকা শহরে সংগঠিত হয়েছিল 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি'। এই সমিতির ঢাকা জেলার তৎকালীন সম্পাদক ছিলেন কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ও দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য এবং সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের নতুন সমাজ ও সভ্যতার বহুমুখী অগ্রগতির বিষয়টি তুলে ধরার জন্য ঢাকা শহরের সদরঘাটের সন্নিকটে ব্যাপটিস্ট মিশন হলে সপ্তাহব্যাপী একটি চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয়।·· ঢাকা শহরে এই ধরনের একটি ব্যাপার তখনকার দিনে ছিল একেবারেই নতুন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় চিত্র-প্রদর্শনীগৃহে অজস্র লোকের সমাবেশ ছিল বিশেষ লক্ষণীয়। প্রদর্শনীটির নাম দেওয়া হয়েছিল 'সোভিয়েট মেলা।'

এই প্রসঙ্গেই সোমেন চন্দ সম্পর্কে দু-একটি কথা বিশেষ করে বলা প্রয়োজন।

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনের ও সোভিয়েত সুহৃদ্ সমিতির একজন কর্মী রূপে এই সূত্রে সোমেন-প্রসঙ্গে লিখেছেন :

> "তরুণ লেখক সোমেন চন্দ ছিলেন এই প্রদর্শনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের মধ্যে সবচাইতে প্রাণবান ও উৎসাহী। প্রদর্শনী-গৃহে দিনের পর দিন ভিড় বেড়েই চলেছিল অথচ চিত্রগুলোর পটভূমি ও তাৎপর্য দর্শকদের বুঝিয়ে দেবার মতো অভিজ্ঞ স্বেচ্ছাসেবক বা সাংস্কৃতিক কর্মীর সংখ্যা তেমন বেশি ছিল না। সোমেন ছিলেন চিত্র-ব্যাখ্যাকার এবং দেখা গেল যেখানেই সোমেন ছবি সম্পর্কে কিছু বলছেন সেখানেই দর্শকরা এসে জড়ো হচ্ছেন, ভিড় বাড়ছে।"১

এ-কথা কাজ স্বীকৃত যে, ফ্যাসিস্ত-বিরোধী কর্মী সোমেন ছিলেন একজন অসামান্য তরুণ গল্পকার। মাত্র ১৭ বছর বয়সে (জন্ম : ১৯২০) তিনি লেখেন তাঁর প্রথম উপন্যাস 'বন্যা'। তারপর একের পর এক লিখেছেন গল্প, উপন্যাস, নাটক। গল্পই লিখেছেন বেশি। এর মধ্যে মৃত্যুর পূর্বে (১৯৪২-এর ৮ই মার্চ) রচিত ও পরবর্তীকালে 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত 'ইঁদুর' গল্পটি বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গল্পগুলির অন্যতম রূপে পরিচিত। এছাড়া তাঁর লেখা 'সঙ্কেত', 'দাঙ্গা' প্রভৃতি চমৎকার গল্পগুলিতেও উদ্‌ঘাটিত হয়েছে সমকালীন রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও সামাজিক টানাপোড়েনের বৃত্তান্ত। মাত্র ২০/২১ বছর বয়সেই সোমেন চন্দ যেসব বিষয় নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন তা ছিল সত্যিই অকল্পনীয়। অধিকাংশ প্রখ্যাত সাহিত্য-সমালোচকের মতেই সোমেন চন্দ জীবিত থাকলে বাংলা সাহিত্য এক শক্তিশালী লেখকের সাক্ষাৎ পেত। সোমেন চন্দ ঢাকার প্রগতিশীল লেখক মহলে ছিলেন অতি পরিচিত ব্যক্তিত্ব। ঢাকার 'প্রগতি লেখক সংঘে'র তিনি ছিলেন সহ-সম্পাদক। ঢাকার 'সবুজপত্র', 'ক্রান্তি' এবং কলকাতার 'পরিচয়' ও 'বালিগঞ্জ' পত্রিকার তিনি ছিলেন প্রায় নিয়মিত লেখক।

১৯৪১ সালে মাত্র ২০ বছর বয়সে তরুণ সোমেন সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হন 'রেলওয়ে শ্রমিক ইউনিয়ন' (ই. বি)-এর সম্পাদক। ইতিমধ্যে তিনি কমিউনিস্ট পার্টি'র একজন সক্রিয় কর্মী ও সদস্যেও পরিণত হন। অত অল্প বয়সেও অত্যন্ত অভিজ্ঞ একজন ট্রেড-ইউনিয়ন নেতার মতোই তিনি শ্রমিক-আন্দোলন ও শ্রমিক-সমস্যাসমূহ মোকাবিলা করতেন। ঢাকা শহরের শ্রমিকদের কাছে সোমেন চন্দ ছিলেন সত্যিই আপনজন ও প্রিয় নেতা।

নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান সোমেন পারিবারিক দারিদ্র্য উপেক্ষা করেই মানবপ্রেম ও দেশপ্রেমের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন কমিউনিস্ট আন্দোলনের তীব্র স্রোতে। কিন্তু দুঃখের কথা, ঢাকার ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনের এই তরুণ সেনানীর জীবনদীপ নিভে গেল অকালে, মাত্র একুশ বছর বয়সে।

১৯৪২-এর ৮ই মার্চ ঢাকা জেলার সূত্রাপুর সেবাশ্রম প্রাঙ্গণে 'সোভিয়েত

সুহৃদ্ সমিতি'র আহ্বানে একটি 'ফ্যাসিস্ত-বিরোধী সম্মেলনে'র ব্যবস্থা করা হয়। কলকাতা থেকে স্নেহাংশুকান্ত আচার্য ও বঙ্কিম মুখার্জি ওই সম্মেলনে প্রধান অতিথি ও সভাপতিরূপে উপস্থিত ছিলেন। সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির প্রাদেশিক সম্পাদক এবং তৎকালীন ট্রেড ইউনিয়ন নেতা জ্যোতি বসুও উপস্থিত ছিলেন সম্মেলনে। এই সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শতশত ফ্যাসিস্ত-বিরোধী কর্মী উপস্থিত হচ্ছিলেন। সম্মেলনে প্রায় তিন হাজার প্রতিনিধির উপস্থিতির রিপোর্ট পাওয়া যায়। কিন্তু ঢাকা জেলার শক্তিশালী দুটি রাজনৈতিক দল 'আর. এস. পি' ও 'ফরওয়ার্ড ব্লক' এই সম্মেলন বানচাল করে দেওয়ার জন্য পরিকল্পনা করে। প্রথমে এই দুটি দলের ফ্যাসিস্ত-পন্থীরা টিকিট কিনে ভূয়া প্রতিনিধি সেজে সম্মেলন মণ্ডপে প্রবেশ করে এবং 'ফ্যাসিস্ত-পন্থী' ও 'কমিউনিস্ট-বিরোধী' ধ্বনি দিতে থাকে। কিন্তু স্বেচ্ছাসেবকদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে তারা পুনর্বার সশস্ত্র অবস্থায় ফিরে আসে এবং দলবদ্ধভাবে সম্মেলন-মণ্ডপ আক্রমণ করে। উপস্থিত পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে তাদের খণ্ডযুদ্ধ হয় এবং পুলিশের গুলিতে একজন আক্রমণকারী নিহত হয়।

অতঃপর নিহত যুবকের মৃতদেহ নিয়ে ক্ষিপ্ত তাণ্ডবকারীরা যখন ফিরে যাচ্ছিল তখন তাদের মুখোমুখি পড়ে যান সোমেন চন্দ। তিনি সম্মেলনস্থলে ইতিপূর্বে সংঘটিত কোনো ঘটনার কথা কিছুই জানতেন না। এক্রামপুর অঞ্চল দিয়ে তখন রেলওয়ে শ্রমিকদের একটি শোভাযাত্রা পরিচালনা করে তিনি সম্মেলনে যোগদান করতে আসছিলেন। ঠিক এই সময়ে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত একদল লোক সোমেন চন্দ-র উপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে তাঁর হাত থেকে 'লাল পতাকা' ছিনিয়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলে এবং কমরেড চন্দকে পুনঃ পুনঃ আঘাত করতে থাকে। ফলে, কমরেড চন্দ-র তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়।[২]

৮ই মার্চ (১৯৪২) সূত্রাপুর সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন ঢাকা জেলার কমিউনিস্ট নেতা জ্ঞান চক্রবর্তী, ফণী গুহ, অনিল মুখার্জি, নেপাল নাগ প্রমুখ। সোমেন চন্দ-র হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে জ্ঞান চক্রবর্তীর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন :

"পার্টির প্রচেষ্টায় সেই সময় ঢাকায় 'সোভিয়েত সুহৃদ্ সমিতি' নামে একটি সংগঠন গড়িয়া তোলা হয় এবং তাহার মাধ্যমে একটি সুদৃশ্য পোস্টার প্রদর্শনী ঢাকা সহ জিলার বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শন করা হয়। 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি'র আহ্বানে জিলায় কতকগুলি সভারও অনুষ্ঠান করা হয়। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী সরকার এইগুলিকে বরদাস্ত করে না। কয়েকটি সভার উদ্যোক্তা ও বক্তাদের গ্রেপ্তার করিয়া দীর্ঘকালের জন্য হাজতবাস করানো হয়। সোভিয়েত বইপত্র রাখার অপরাধে জেল দেওয়া হয়। জনসাধারণের চাপে সোভিয়েতের সঙ্গে মৈত্রী জোটে মিলিত হইতে বাধ্য হইলেও সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেন যে পরাধীন ভারতের জনসাধারণের মনে সোভিয়েতের প্রতি

সমর্থনের মনোভাব গড়িয়া উঠাকে কতখানি ভয় করে এই ঘটনাগুলি হইতে তাহারই প্রমাণ পাওয়া যায়।...

"আমাদের এই ফ্যাসিস্ট-বিরোধী জনযুদ্ধের নীতি ও কর্মপদ্ধতিকে জাতীয়তাবাদীরা, বিশেষ করিয়া ফরওয়ার্ড ব্লক ও আর. এস. পি-র মতো বামপন্থী জাতীয়তাবাদীরা তীব্রভাবে বিরোধিতা করিতে থাকে। তাহারা মনে করে যে, আমরা এই নীতি গ্রহণ করিয়া আসলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকেই সাহায্য করিতেছি এবং দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছি। সুযোগ পাইলেই তাহারা আমাদের কমরেডদের উপরে মারাত্মক আক্রমণ চালায়।

" ১৯৪২ সালের প্রথম দিকে প্রদ্যোৎ সরকার নামে জগন্নাথ কলেজের একজন তরুণ ছাত্র-কমরেড দিনে দুপুরে ছোরার আঘাতে নিহত হয় (২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪২)। এই বৎসরই ৮ই মার্চ আমাদের কমরেডদের উদ্যোগে সূত্রাপুরে একটি ফ্যাসিস্ট-বিরোধী সম্মেলন আহ্বান করা হয়। এই সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য রেলওয়ে কলোনী হইতে একদল রেলশ্রমিক তরুণ সাহিত্যিক কমরেড সোমেন চন্দের নেতৃত্বে শোভাযাত্রা করিয়া আসিতে থাকেন। পথে লক্ষীবাজারের নিকট এই শোভাযাত্রাটি ফ্যাসিবাদে বিশ্বাসী কয়েকটি রাজনৈতিক গ্রুপের কর্মীদের দ্বারা বেলা ৩ টায় আক্রান্ত হয়। সোমেনকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। সদর রাস্তার উপরে তাহার চক্ষু দুইটি খুলিয়া ফেলা হয়। তাহার সর্বশরীরে ছোরার আঘাত করা হয়। এবং ভোজালি দিয়ে তাহার পেট চিরিয়া ফেলা হয়। তারপর হত্যাকারীর দল তাহার দেহের উপর দাঁড়িয়ে পৈশাচিক জয়ের আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে।...

" সোমেন চন্দকে হত্যা করিবার পর এই বামপন্থী জাতীয়তাবাদী কর্মীরা লাঠি তরবারি ভোজালি প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র নিয়া পুনঃ পুনঃ সম্মেলন স্থান আক্রমণ করে। কিন্তু স্বেচ্ছাসেবকদের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধের ফলে তাহারা সম্মেলন মণ্ডপ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে নাই। এই অবস্থার মধ্যেও সম্মেলনের কাজ বেশ সুচারুভাবে আশাতীত সাফল্যের মধ্য দিয়া সমাপ্ত হয়।"[৩]

কমিউনিস্ট নেতা জ্ঞান চক্রবর্তীর বিবরণ থেকে নিম্নলিখিত কতকগুলি বিষয় সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায় :

১) পশ্চিম বঙ্গের কলকাতার মতো পূর্ববঙ্গের ঢাকা শহরকে কেন্দ্র করেও ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে।

২) কমিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে ব্রিটিশ সরকারের নিষেধাজ্ঞা তুলে না নেওয়া পর্যন্ত (জুলাই, ১৯৪২) কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ও কর্মীদের উপর (এবং সেইসূত্রে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনকারীদের উপর) সরকারী দমনপীড়ন অব্যাহত থাকে।

৩) বামপন্থী জাতীয়তাবাদীগণ (ফরওয়ার্ড ব্লক, আর. এস. পি. প্রভৃতি) হিটলার ও ফ্যাসিবাদের উগ্র সমর্থক হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদের

প্রকৃতি সম্পর্কে কোনোরূপ ধারণা ছিল না। কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে তাদের ক্রোধ ও বিদ্বেষ কত প্রবল ছিল তা সোমেন চন্দ-র নৃশংস ও অমানুষিক হত্যাকাণ্ডের বিবরণ শুনলেই বোঝা যায়।

৪) অত্যন্ত সংখ্যাল্প হলেও একদিকে সরকারী দমননীতি, অপরদিকে ফ্যাসিবাদের সমর্থক উগ্র জাতীয়তাবাদীদের দ্বিমুখী আক্রমণের সম্মুখীন হয়েও কমিউনিস্টরা সাহসের সঙ্গে জাতীয় অনুভূতির সম্পূর্ণ বিপরীত স্রোতে দাঁড়িয়ে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য একটা দিক হলো শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী চেতনার ক্রমপ্রসার।

৫) ঢাকাতে নিহত ছাত্র প্রদ্যোৎ সরকারই ছিলেন বাঙলার ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনের প্রথম শহীদ। দ্বিতীয় শহীদ হলেন সোমেন চন্দ। যদিও বহু গ্রন্থে সোমেন চন্দকেই ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনের প্রথম শহীদের মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে।

যাহোক, সম্ভাবনাময় তরুণ লেখক সোমেনের মৃত্যুতে বাঙলাদেশের প্রগতিশীল মানুষের মধ্যে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ছাত্র-যুব, শ্রমিক-কৃষক ও বুদ্ধিজীবীদের প্রগতিশীল গণসংগঠনগুলি এই বর্বর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠে। বিভিন্ন সভা-সমবেশে ধ্বনিত হয় তাদের প্রতিবাদের ভাষা। তৎকালের প্রগতিশীল সংবাদপত্র ও সাহিত্যপত্রগুলিতে এই হত্যাকাণ্ডের বিবরণ এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদও প্রকাশিত হয়। বাঙলাদেশের প্রগতিশীল দল ও সংগঠনগুলির নেতৃবৃন্দ তীব্রকণ্ঠে এই হত্যাকাণ্ডের প্রতি ধিক্কার জানান। সোমেনের মৃত্যুর পরেই বাঙলায় ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলন দ্বিগুণ বেগে প্রসারিত হতে থাকে। যে সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি ও সংগঠন পূর্বে এই আন্দোলনের বাইরে ছিলেন, এই হত্যাকাণ্ড তাঁদেরও অনেকের চোখ খুলে দেয়। সক্রিয়ভাবে তাঁরাও অংশগ্রহণ করেন ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনে।

'নিখিল ভারত সোভিয়েত সুহৃদ্ সমিতি'র সাধারণ সম্পাদক হীরেন মুখার্জি, 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস'-এর সাধারণ সম্পাদক সুধীন্দ্র প্রামাণিক, 'ভারতীয় লেবার পার্টি'র সম্পাদক নন্দলাল বসু, 'নিখিল ভারত কিষাণ সভা'র সম্পাদক গোপাল হালদার এবং 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন'-এর সম্পাদক অরুণ ভট্টাচার্য সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য যে বিবৃতি দেন তাতে সোমেন চন্দ-র এই কাপুরুষোচিত ও বর্বর হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করে বলা হয়ঃ

> "......ইতিহাসের বর্তমান সন্ধিক্ষণে সমস্ত ফ্যাসিস্ট-বিরোধীগণের আজ ঐক্যবদ্ধ হওয়া কর্তব্য। বর্তমান ঘোরতর প্রতিক্রিয়াশীলতার দিনে ফ্যাসিস্ট-বিরোধীগণ এবং যাঁহারা সুনিশ্চিতভাবে ফ্যাসিস্ট, তাহারা যখন প্রকাশ্যেই কার্য শুরু করিয়াছেন, তখন সম্মুখে যে দুর্দিন সমাগত তাহার ভয়াবহ রূপই এই ঘটনায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ফ্যাসিস্টপন্থী জাপানীগণ যখন আমাদের প্রিয় জন্মভূমির নিকটবর্তী হইতেছে, সেই সময় শ্রমিক ও শ্রমিক

প্রতিষ্ঠান সমূহের শত্রুগণ ও স্বাধীনতা যাঁহারা ভালবাসেন, যাঁহারা জাপানীদের নিকট দেশের স্বার্থ বিক্রয় করিবেন না, নিজেদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি যাঁহারা প্রিয় বলিয়া মনে করেন এবং যাঁহারা উহা প্রতিক্রিয়াশীল ফ্যাসিস্টদের নিকট বিসর্জন দিতে চাহেন না, তাঁহাদের সকলেরই আজ ঐক্যবদ্ধ হওয়ার দিন আসিয়াছে। সোমেনের রক্ত আজ আমাদের যে বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছে উহা কখনই ছিন্ন হইবে না। যাঁহারা ভদ্র নিষ্কলুষ রাজনৈতিক জীবন যাপন করিতে চাহেন, আমাদের বিশ্বাস, অন্ততপক্ষে তাঁহারা নিশ্চয়ই এরূপ ফ্যাসিস্ট অপকৌশল ও জুলুমের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হইবেন।"[৪]

এই বিবৃতি থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ফ্যাসিস্ত-বিরোধী গণসংগঠনগুলি এই সময় সর্বস্তরের মানুষের ফ্যাসিস্ত-বিরোধী একটি গণতান্ত্রিক ঐক্য গঠনের উপরেই বেশি জোর দিয়েছিল, এমনকি কমিউনিস্ট-বিরোধীরাও সেই 'যুক্তফ্রন্ট'-এ ছিল স্বাগত। বস্তুত, এরই ফলশ্রুতি স্বরূপ ১৯৪২ সালের ২৩শে মার্চ বাঙলাদেশের কয়েকজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক সোমেন চন্দ-র হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানিয়ে সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি দেন। বিবৃতিটিতে স্বাক্ষর করেছিলেন: সর্বশ্রী প্রমথ চৌধুরী, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, আবু সয়ীদ আইয়ুব, প্রমথ বিশী, সুবোধ ঘোষ, জ্যোতির্ময় ঘোষ, নীরেন্দ্রনাথ রায়, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, আবদুল কাদের, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, হিরণকুমার সান্যাল, সুভাষ মুখার্জি, সমর সেন, বিনয় ঘোষ, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, অরুণ মিত্র, অমিয় চক্রবর্তী, সরোজ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত, বিষ্ণু দে এবং শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী। বিবৃতিটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই বিবৃতির মাধ্যমে বলা হয়:

"সম্প্রতি ঢাকা হইতে এক মর্মান্তিক সংবাদ আমাদের নিকট আসিয়া পৌছিয়াছে। তরুণ সাহিত্যিক সোমেন চন্দ যখন শ্রমিকদিগের একটি শোভাযাত্রা লইয়া ফ্যাসিস্ট- বিরোধী সম্মেলনে যোগ দিতে যাইতেছিলেন তখন তাহাকে নৃশংসভাবে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হইয়াছে। আমরা জানি যে, শ্রীযুক্ত চন্দ মার্কসবাদী আন্দোলন এবং জনগণের অধিকার রক্ষার সংগ্রামের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। লেখক হিসাবে ন্যায়তঃ স্বভাবতঃ তিনি যে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী হইবেন তাহাতে সন্দেহের কিছুই নাই। যে সমস্ত সংবাদ আসিয়াছে তাহা হইতে বোঝা যায় যে তিনি এবং তাঁহার সহকর্মীরা তাঁহাদের রাজনৈতিক বিপক্ষদলের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। একথা নিশ্চিত সত্য যে, পূর্ব হইতে চিন্তা করিয়া ও সম্পূর্ণ অকারণে তাঁহাকে হত্যা করা হইয়াছে এবং সম্ভবতঃ তাঁহার বিপক্ষদলই এই কার্য করিয়াছে। বাঙলার রাজনৈতিক জটিলতা আমাদের নিকট দুর্বোধ্য—বিশেষ করিয়া ঢাকায় যে প্রতিহিংসার বিষাক্ত বাষ্প সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক আকাশকে দূষিত করিয়া তুলিয়াছে, আমরা তাহার পশ্চাতের মনোবৃত্তি অনুধাবন করিতে অক্ষম। সোমেন চন্দ একজন উদীয়মান ও বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। তিনি

তাঁহার নিজের চিন্তাধারার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া অনুরূপভাবে দেশের ও দশের সেবায় যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাহাতেই তাঁহার প্রকৃতির উৎকর্ষতা সূচিত হইতেছে। ফ্যাসিবাদের কুৎসিৎ মূর্তি দেখিয়া প্রত্যেক দেশের সাহিত্যিকেরা ফ্যাসিবাদের প্রতি নিজেদের ঘৃণা জানাইয়াছেন। ভারতবর্ষে আমরা আমাদের সভ্যতার অভ্যন্তরীণ এই দুষ্ট ক্ষত সম্পর্কে তীব্রভাবে এবং একবাক্যে নিজেদের মনোভাব জ্ঞাপন করিয়াছি। আমাদের কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অপেক্ষা এত তীব্রভাবে সম্ভবত আর কেহই ফ্যাসিবাদের বিরোধিতা করেন নাই। এই দুর্দিনে দেশের মধ্যে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী দল সংগঠন করিতে সোমেন চন্দ যে অগ্রসর হইবেন ইহাতে আশ্চর্যের কিছুই থাকিতে পারে না। মাত্র এই কারণেই এবং এই অভিযোগেই গুপ্তঘাতকের হস্তে তাঁহাকে আত্মবলি দিতে হইয়াছে। আমাদের একজন নির্ভীক সহকর্মীর মৃত্যুতে আমরা সন্তপ্তচিত্তে দেশের জনসাধারণের নিকটে এই রক্তলিপ্সা এবং বিষ-কলুষ মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে একবাক্যে তীব্র ঘৃণা জ্ঞাপন করিতে আবেদন জানাইতেছি।"[৫]

বাঙলার প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের এই বিবৃতি ছাড়াও সোমেন চন্দ-র হত্যা-কাণ্ডের প্রতিবাদী প্রতিক্রিয়া রূপে অসংখ্য রিপোর্ট, নিবন্ধ, প্রতিবাদ-পত্র, বিবৃতি, কবিতা, সাহিত্যিক রচনা ও স্মৃতিকথা বাঙলার বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলি প্রকাশের জন্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল—'আনন্দবাজার পত্রিকা', 'অরণি' সাপ্তাহিক পত্রিকা, 'পরিচয়' মাসিক পত্রিকা, 'প্রতিরোধ' সাহিত্য পত্র প্রভৃতি। এছাড়া 'সোভিয়েত সুহৃদ্ সমিতি'র আহ্বানে বাঙলার বিভিন্ন জেলায় সোমেন চন্দ-র নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-সভা ও স্মরণ-সভা অনুষ্ঠিত হতে থাকে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র-ফেডারেশনের নির্দেশক্রমে ঢাকা জেলা ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে ১৭ই মার্চ (১৯৪২), সোমেনকে হত্যা করার সপ্তাহ কালের মধ্যেই, ঢাকায় 'নিখিল বঙ্গ সোমেন দিবস' পালন করা হয়। সংবাদপত্রের প্রতিবেদন অনুসারে এই সভা বসে—৪১ নং জোড়পুলস্থিত ছাত্র ফেডারেশনের অফিসে। "জিলা ছাত্র ফেডারেশনের অস্থায়ী সভাপতি কমরেড অমূল্য চন্দ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। উক্ত ফেডারেশনের সম্পাদক কমরেড অজিত রায় এবং অন্যান্য কয়েকজন বক্তা সোমেন চন্দ-র রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক জীবনের বিভিন্ন দিক উদঘাটন করিয়া বক্তৃতা করেন।"[৬]

সোমেন চন্দ-র নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড নিঃসন্দেহে বাঙলার ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনে এক তাৎপর্যপূর্ণ এবং দিকনির্দেশক ঘটনা। একদিকে ভারতের পূর্ব-সীমান্তে জাপানী ফ্যাসিস্তদের আক্রমণ, অপরদিকে দেশের অভ্যন্তরে বোধবুদ্ধিহীন উগ্র জাতীয়তাবাদী দেশীয় ফ্যাসিস্তদের তাণ্ডবলীলা শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের চোখ খুলে দেয়। সোমেনের মৃত্যু সাধারণ মানুষের চেতনায় হানে তীব্র কশাঘাত। তাই দেখা যায়, সোমেন চন্দ-র মৃত্যুর পরবর্তী সময় থেকেই

কমিউনিস্টদের জনযুদ্ধ-সংক্রান্ত নীতি ও বক্তব্য জানবার জন্য সাধারণ মানুষ তথা সমাজের সকল স্তরের মানুষের মধ্যেই আগ্রহ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফ্যাসিস্ত-বিরোধী সভা-সম্মেলনের ব্যাপকতাও এই সময় থেকে অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। অন্য যে-বৈশিষ্ট্যটি উল্লেখযোগ্য তা হলো—এই সব প্রচারাভিযান নগরকেন্দ্রিক ছিল না। 'অরণি', 'জনযুদ্ধ' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত 'আন্দোলনের খবর' থেকে দেখা যায় যে, সুদূর গ্রামেগঞ্জেও বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ফ্যাসিবিরোধী সভা-সম্মেলন। এগুলিতে জনতার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ খুবই লক্ষণীয় ব্যাপার ছিল।[৭]

২. ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে-র প্রতিষ্ঠা ও কার্যক্রম :

'ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'-র জন্মপ্রসঙ্গে ওই সময়কার প্রগতি-সংস্কৃতি আন্দোলনের অন্যতম প্রধান সংগঠক চিন্মোহন সেহানবীশ বলেছেন :

"…১৯৪২ সালের মার্চ মাসে এই বাংলা প্রদেশে প্রগতি লেখক সংঘ 'ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে' রূপান্তরিত হয়। এ শুধু নতুন নামকরণ বা বহিরঙ্গের রূপান্তর মাত্র নয়। যে সংগঠন ছিল তা আরও ব্যাপক ও ব্যাপ্ত হল লেখক শিল্পী সংগঠনে। সংগঠনের আঙ্গিনা আরও বড় হয়। সেদিন ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যে ব্যাপক প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল সারা পৃথিবীতে তার শরিক হওয়ার প্রতিশ্রুতি পরিস্ফুট হল সংগঠনের নতুন নামের মধ্য দিয়ে। এর এক বছর বাদে ১৯৪৩ সালে বোম্বাইয়ে 'সারা ভারত গণনাট্য সংঘ' তৈরি হয়। 'ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' এবং 'গণনাট্য সংঘ' সহোদর হিসাবে কাজ করতে শুরু করে। ··

"প্রসঙ্গত বলি, তখনকার পূর্ব বাঙলায় তরুণ লেখক ও ট্রেড ইউনিয়নিস্ট সোমেন চন্দ-র নিষ্ঠুর হত্যার ঘটনা সেদিন সমস্ত স্তরের লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের বিপুলভাবে নাড়া দিয়ে গিয়েছিল। এই হত্যার ঘটনার ২০ দিন বাদে আমাদের সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়।"[৮]

বস্তুতই সোমেন চন্দ-র নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ফলে বাঙলাদেশের প্রগতিশীল লেখকেরা সচকিত হয়ে ওঠেন। সোমেনের আত্মদান তাঁদের মধ্যে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিপুল প্রেরণা রূপে দেখা দেয়। বাঙলার প্রগতিশীল লেখক ও সাহিত্যিকেরা স্পষ্টতই উপলব্ধি করেন যে আর দেরি নয়, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র মৌখিক ধিক্কার উচ্চারণই নয়—অবিলম্বে ফ্যাসিবিরোধী লেখকদের একটি সংগঠনের মধ্যে এনে সুসংহতভাবে কাজও শুরু করতে হবে এবং ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে জনমানসে চেতনা জাগ্রত করার জন্য বাস্তব কার্যক্রমও গ্রহণ করতে হবে। আর তা না করতে পারলে সভ্যতার শত্রুরা সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে গ্রাস করবে, বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের রত্নাগার চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। তাই নিঃসন্দেহে এটা বলা যায় যে, ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ গঠনের ক্ষেত্রে হিটলারের সোভিয়েত আক্রমণ ও জাপানের

ভারতবর্ষ আক্রমণের প্রস্তুতি পরোক্ষ প্রেরণা হলেও, প্রত্যক্ষ প্রেরণা ছিল অবশ্যই সোমেনের আত্মদান। এ-প্রসঙ্গে প্রগতি সাহিত্য ও সংস্কৃতি-আন্দোলনের সংগঠক ও গবেষক ধনঞ্জয় দাশ লিখেছেন:

"...সোমেন চন্দ-র হত্যাকাণ্ডে বিচলিত হয়ে ওঠেন বাঙলার সকল দলের সর্বমতের শিল্পী-সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীরা।...ফ্যাসিবিরোধী সংগ্রামে মানবিকতার বিবেক, শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের ব্যাপক অংশ যেন একটা ঐক্যসূত্র খুঁজে পেলেন। এই সূত্র ধরেই ১৯৪২ সালের ২৮শে মার্চ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হল ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক সম্মেলন এবং এই সম্মেলন মঞ্চেই গঠিত হয় 'ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ।"[৯]

প্রকৃতপক্ষে, বাঙলাদেশের লেখক ও বুদ্ধিজীবীরা কেবলমাত্র ২৩শে মার্চের বিবৃতি দিয়েই (পূর্বোল্লিখিত)[১০] ক্ষান্ত হলেন না। ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক সম্মেলনের প্রস্তুতিও চলতে থাকল। অবশ্য এক্ষেত্রে প্রধান উদ্যোগ গ্রহণ করে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন'। তাদের তরফে সংবাদপত্রে ২৮শে মার্চের (১৯৪২) 'ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক সম্মেলনে'র ঘোষণাসূচক একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞপ্তিটি ইংরাজী কাগজ 'অমৃতবাজার'-এ ছিল নিম্নরূপ:

"ANTI-FASCIST WRITER'S CONFERENCE

"An Anti-Fascist Conference of the well-known writers and journalists of Bengal will be held today (saturday) at 5 P. M. in the University Institute Hall. Sj. Ramananda Chatterjee will Preside. Sjts. Atul Gupta, Satyendra Majumdar, Buddhadev Bose, Suren Goswami, Premendra Mitra, Pramathanath Bisi, Hirendranath Mukherjee, Gopal Haldar, Saroj Dutta, Sajanikanta Das, Nihar Roy, Bishnu Dey, Nilima Devi will address.

There will be arrangement for community songs, recitals and picture posters. All are welcome."[১১]

পরদিন, অর্থাৎ ২৯শে মার্চ (১৯৪২), সংবাদপত্রে ওই ফ্যাসিস্ত-বিরোধী সম্মেলনের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয় তা নিম্নরূপ:

"গত ২৮শে মার্চ অপরাহ্নে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুট লাইব্রেরী হলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখকগণের এক সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার নাতিদীর্ঘ অভিভাষণে ফ্যাসিজমের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া স্বাধীনতাকামী দেশবাসীর ও লেখকগণকে আপদকালীন কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হইতে বলেন। শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু সভাস্থলে একটি কালোপযোগী স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। অধ্যাপক

অমিয় চক্রবর্তী, অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায়, অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত হিরণকুমার সান্ন্যাল, শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার, কবি আব্দুল কাদের, ও ছাত্রকর্মী দেব বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে লেখক, শিল্পী, সাংবাদিক ও ছাত্রসম্প্রদায়কে সংঘবদ্ধ হইয়া একযোগে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সম্মিলিতফ্রন্ট গঠন করিতে আহ্বান করেন। শ্রীযুক্তা সুজাতা মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা আবৃত্তি করেন। মধ্য ও দক্ষিণ কলিকাতার ছাত্র ফেডারেশনের ছাত্রবৃন্দের দুইটি গান বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল। উপসংহারে শ্রীযুক্ত অতুল গুপ্ত মহাশয় লেখক ও বুদ্ধিজীবীগণকে বর্তমান সংকট সম্পর্কে সচেতন হইতে অনুরোধ করেন। সভাস্থলে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী এবং জনযুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা জ্ঞাপক বহু সুন্দর সুন্দর প্রচারপত্র প্রদর্শিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত অতুল গুপ্ত, গোপাল হালদার, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও বিষ্ণু দে-কে (আহ্বায়ক) লইয়া একটি সংগঠন কমিটি গঠিত হয়। ঢাকার তরুণ লেখক ও শ্রমিক কর্মী সোমেন চন্দের শোচনীয় মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।"[১২]

এই সম্মেলনের মঞ্চ থেকেই 'ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' গঠনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে একটি সাংগঠনিক প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়।

প্রকৃতপক্ষে,'সম্মেলন' বলে বিজ্ঞাপিত হলেও একথা বলা যায়, এটি ছিল প্রধানত একটি 'ফ্যাসিস্ত-বিরোধী সভা', যা সোমেন চন্দ-র হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানাতেই সংগঠিত হয়েছিল।[১৩] এ-প্রসঙ্গে সঠিক তথ্যটি পাওয়া যায় হীরেন মুখার্জি লিখিত এক প্রতিবেদন থেকে, যেটি **'Bengal progressive writers getting together for the People'**—শিরোনামে **'People's War'** (কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন মুখপত্র)-এ প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনটির অংশবিশেষ নিম্নরূপ :

"...২৮শে মার্চ তারিখে ভারতীয় সাংবাদিকতার শিরোমণি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় একটি জনবহুল সভায় সভাপতিত্ব করেন। সুপরিচিত সাহিত্য-যোদ্ধারা এই সভায় ফ্যাসিবাদের নারকীয় দিকগুলো নিয়ে এবং ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লেখক ও শিল্পীদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা তোলেন। 'ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' সংগঠিত করার জন্য একটি কমিটি তৈরি করা হয়। কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল এমনি সব তাৎপর্যপূর্ণ নাম : যামিনী রায়, অতুল গুপ্ত, আবু সয়ীদ আইয়ুব, সত্যেন মজুমদার, হিরণকুমার সান্যাল, সজনীকান্ত দাস, নরেশ সেনগুপ্ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য কবিরা।"[১৪]

[ইংরাজী থেকে অনূদিত]

হীরেন মুখার্জি লিখিত ঐ প্রতিবেদন থেকেই জানা যায় যে, উক্ত সভা থেকে যে সাংগঠনিক কমিটি (ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ) গঠিত হয় তার

সভাপতি হয়েছিলেন শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত এবং যুগ্ম-সম্পাদক হন বিষ্ণু দে ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়। বস্তুত, তৎকালীন তরুণ ছাত্রনেতা ও নবীন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ই ছিলেন এই সভার অন্যতম প্রধান আহ্বায়ক।

'ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে'-র সাংগঠনিক কমিটি গঠনের পরে কলকাতার কালিঘাটের কাছে ১/১০ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোডে সংঘের অফিস স্থাপিত হয়। বস্তুত, ফ্যাসিবিরোধী মঞ্চে প্রগতিশীল লেখক, শিল্পী এবং সাংস্কৃতিক কর্মীদের সুসংহত করার জন্য এই সংঘ বাস্তব কার্যক্রম গ্রহণ করে ও শিল্প-সাহিত্যের মাধ্যমে ফ্যাসিবিরোধী প্রচারাভিযানকে ব্যাপকতর করে তোলে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি বিজ্ঞপ্তিতে এর কিছু নজির পাওয়া যাবে। বিজ্ঞপ্তিটি নিম্নপ্রকার :

লেখক ও শিল্পীদের প্রতি আবেদন

"ফ্যাসিস্ট আক্রমণের মুখে বিপন্ন স্বদেশের রক্ষাকার্যে যে সকল বাঙালী লেখক ও শিল্পী তাঁহাদের সৃজনশক্তিকে নিয়োগ করিবার জন্য আগ্রাহান্বিত আমরা তাঁহাদের পরিপূর্ণ সহযোগিতা কামনা করিতেছি। তাঁহারা যেন ফ্যাসিস্ট-বিরোধী গল্প, কবিতা, নাটিকা, প্রবন্ধ, ছবি, কার্টুন প্রভৃতি নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরণ করিয়া সংগঠনগত আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ রক্ষা করেন। বিভিন্ন জেলার প্রগতিশীল সাময়িক পত্রিকা, সাহিত্য সংঘ প্রভৃতিকেও আমরা সক্রিয় সহযোগিতার আহ্বান জানাইতেছি; প্রেরিত রচনাদির মনোনয়ন ও প্রকাশের ভার আমরা গ্রহণ করিতেছি।

সম্পাদক, ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ।
১।১০ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড
কালিঘাট। কলিকাতা।"[১৫]

১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে-'র অফিস স্থানান্তরিত হয় ৪৬নং ধর্মতলা স্ট্রীটে। সেই সঙ্গে ৪৬ নম্বরে উঠে আসে 'সোভিয়েত সুহৃদ্ সমিতি'রও অফিস। 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ' এবং 'পরিচয়' মাসিক পত্রিকার অফিস রূপেও ব্যবহৃত হয় এই ৪৬ নম্বর ঠিকানাটি। বস্তুত, এরপর থেকেই ৪৬ নম্বর ধর্মতলা স্ট্রীটের বাড়িটি হয়ে ওঠে চল্লিশের দশকে বাঙলার প্রগতি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী লেখক ও শিল্পীদের সত্যিকার মিলনক্ষেত্র। এই ঐতিহাসিক বাড়ির প্রসঙ্গেই চিন্মোহন সেহানবীশ রচনা করেন একটি অনবদ্য পুস্তিকা—'৪৬ নং'।[১৬]

অতিশয়োক্তি না করেই বলা যায়, ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের আন্দোলনে এই বাড়িটির ভূমিকা ছিল ঐতিহাসিক। ৪৬ নম্বরে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের উদ্যোগে প্রতি সপ্তাহে সাহিত্য-বৈঠকের আয়োজন করা হতো। প্রতি বুধবার আয়োজিত এই বৈঠকে শুধু সাহিত্য নয়, আলোচিত হতো অর্থনীতি, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব ও সঙ্গীতবিদ্যার প্রসঙ্গও। নবীন ও প্রবীণ কবি

এবং গল্প-লেখকেরা এই বৈঠকে তাঁদের রচনাদি পাঠ করতেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, হিরণকুমার সান্যাল, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ রায়, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, রাধারমণ মিত্র, অরুণ মিত্র, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, বিনয় ঘোষ, গোপাল হালদার, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, বিমলচন্দ্র ঘোষ, সুকান্ত ভট্টাচার্য, সরোজ দত্ত, বিজন ভট্টাচার্য, অনিল কাঞ্জিলাল, তুলসী লাহিড়ী, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শম্ভু মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, বিনয় রায়, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, গোলাম কুদ্দুস, ননী ভৌমিক, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, রবীন্দ্র মজুমদার, সুশীল জানা, নীহার দাশগুপ্ত, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, অবন্তী সান্যাল প্রমুখ বহু প্রবীণ ও নবীন লেখককে প্রায়ই ৪৬ নম্বর ধর্মতলা স্ট্রীটে দেখতে পাওয়া যেত। এঁদের সঙ্গেই আবার মাঝে মাঝে মিলিত হতেন ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, রাহুল সাংকৃত্যায়ন, ডঃ মহম্মদ আশ্রফ, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, ডঃ সুকুমার সেন, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী প্রমুখ পণ্ডিতদের। ভিন্ন ভাষাভাষী প্রগতিশীল লেখকেরাও আসতেন এখানে, যেমন এসেছেন—উর্দু সাহিত্যিক জোশ মালিহাবাদী, সাগর নিজামী, পারভেজ শাহেদী, কাইফি আজমী, সজ্জাদ জহীর, পঞ্জাবী সাহিত্যিক গুরুবক্স সিং প্রমুখ। মুসলিম সাহিত্যিক আবুল মনসুর আমেদ, হবিবুল্লাহ বাহার, আহসান হাবীব, শওকত ওসমান এবং ইংরেজ কবি লুই ম্যাকনীসও মাঝে মাঝে ৪৬ নম্বরে আসতেন, তাঁরা বিভিন্ন আলোচনায় অংশগ্রহণ করতেন অথবা স্বরচিত রচনাও পাঠ করতেন।[১৭]

৪৬নং ধর্মতলা স্ট্রীটের এই আড্ডা এবং আলোচনা সভাগুলি জমজমাট হয়ে ওঠে প্রধানত ১৯৪৩ সাল থেকেই, অর্থাৎ 'ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে'-র প্রথম সম্মেলনের (ডিসেম্বর, ১৯৪২) পরবর্তী কালে।

৩. ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের প্রথম সম্মেলন :

যতদূর জানা যায়, ১৯৪২ সালের ৪ঠা অক্টোবর একটি ঘরোয়া সভায় মিলিত হয়ে (আহ্বায়ক ছিলেন বিষ্ণু দে ও সুভাষ মুখার্জি) লেখক ও শিল্পীরা স্থির করেন যে, ডিসেম্বরেই তাঁরা 'ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক সংঘে'র প্রথম সম্মেলনটি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করবেন। এই সভায় মুসলিম লেখকদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য। যেমন, উপস্থিত হয়েছিলেন কাজী আব্দুল ওদুদ, আবু রুশদ, আয়নুল খাঁ, আব্দুল কাদির, আবুল হোসেন, গোলাম কুদ্দুস প্রমুখ অনেকেই। প্রসিদ্ধ হিন্দী কবি ভারতভূষণ আগরওয়ালও সভায় উপস্থিত ছিলেন।[১৮]

ইতিমধ্যে জুলাই মাসে (১৯৪২) ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ার ফলে বাঙলাদেশে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলন আরো দ্রুত বিস্তার লাভ করতে থাকে। নভেম্বর মাসে ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে রজনী পাম দত্ত ভারতের কমিউনিস্টদের কাছে একখানা পত্র প্রেরণ করেন। এই পত্রের পরিপ্রেক্ষিতেই বাঙলার কমিউনিস্টরা ফ্যাসিস্ত-বিরোধী

নানা গণসংগঠন গড়ার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এই পত্রের অংশবিশেষ নীচে উদ্ধৃত হলো :

"......আপনারা এক গভীর সংকটের সম্মুখীন। আপনাদের উপর বিরাট দায়িত্ব পড়েছে। এমন দিনে আপনারা আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ করুন। আপনাদের খুব সামান্য সংবাদই আমরা পাই। তবু তারই উপর নির্ভর করে খুব মনোযোগ ও সহানুভূতির সঙ্গে আপনাদের সংগ্রাম লক্ষ্য করছি। আমাদের ধারণা আপনারা সঠিক পথ বুঝতে পেরেছেন। বর্তমান শাসকদের উদ্দেশ্য যাই থাকুক না কেন, ভারতের জনসাধারণের মূল স্বার্থেই সম্মিলিত জাতিসমূহের যুদ্ধে কার্যকরী সাহায্য করার প্রয়োজনীয় নীতি আপনারা গ্রহণ করেছেন। বিশেষ করে বর্তমান বছরের প্রথম দিকে নিখিল ভারত ছাত্র সম্মেলনে যে প্রস্তাব পাস করা হয়েছে এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে আপনারা যে নীতি নিয়েছিলেন তার ছোট্ট সংবাদ পেয়ে আমাদের বেশ ভালো ধারণাই জন্মেছে। ...ক্রীপস্ আলোচনার সময় আমরা বিলাতে কংগ্রেসের সাধারণ দাবী সম্পূর্ণ সমর্থন করেছি। ভারতে কোয়ালিশন সরকার চাই। একজনের পর একজন আলাদাভাবে ক্রীপ্সের সঙ্গে দেখা করার ফলে ভুল বোঝাবুঝি বাড়ছে।...যাইহোক আমরা জোর দিয়েছি—ভারতে জাতীয় গভর্নমেণ্ট দাও যাতে সম্মিলিত জাতিসমূহের সঙ্গে একযোগে ভারতবাসীরা ভারতরক্ষা করতে পারে।...ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে বৃহত্তম সমাবেশ, রাজনীতিক মতনির্বিশেষে সমস্ত ফ্যাসিস্ত-বিরোধীদের সঙ্গে কার্যক্ষেত্রে পূর্ণ সহযোগিতা —বর্তমান শাসকদল যতদিন ফ্যাসিজম্‌কে রুখবে এবং যুক্তফ্রণ্টে থাকবে ততদিন এদের কোনো কাজই আমাদের এই পথ থেকে বিচ্যুত করবে না। কারণ এই পথ শুধু বিশ্বফ্রণ্টের জনগণের স্বার্থেই নয়, ভারতের জনগণের স্বার্থেও। বিশ্বফ্রণ্টের জনগণের ভাগ্য ও ভারতবাসীর ভাগ্য আলাদা নয়। ভারতের স্বাধীনতার পথ ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে কার্যকরীভাবে লড়বার ভিতর দিয়েই চলবে। আজ এই মহাসঙ্কটের সামনে, আক্রমণ বা রাজনীতিক বিচ্ছিন্নতার ঝোঁকের মুখে, আপনারা অগ্রণী রাজনীতিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারেন; জনপ্রতিরোধের শক্তিকে সমবেত করতে পারেন; মিলিত জাতীয় প্রতিরোধ ও গণসংঠনে অগ্রণী হতে পারেন। এই গণসংগ্রামে সকল দেশের কমরেডদের আদর্শ আপনাদের অনুপ্রাণিত করবে।"[১৯]...

বস্তুত, ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে রজনী পাম দত্তই কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সঙ্গে তখন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। এক্ষেত্রে ভারতীয় কমিউনিস্টদের উপর রজনী পাম দত্ত-র পরোক্ষ প্রভাবের কথা অনস্বীকার্য। তাঁর ঐ পত্র পাওয়ার পরেই বাঙলার কমিউনিস্টরা বিভিন্ন প্রকার ফ্যাসিস্ত-বিরোধী গণসংগঠন গড়ে তোলার কাজে তৎপর হয়ে ওঠেন এবং পার্টি থেকেও সেই নির্দেশই দেওয়া হয়েছিল বলে সরোজ মুখার্জির স্মৃতিকথা থেকে

জানা যায়।[২০]

এই পটভূমিকাতেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল 'ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে'-র প্রথম সম্মেলন। হীরেন মুখার্জি লিখিত '**Rally to Fight Fascism : Bengal's Best Writers and Artists Unite**'[২১] ও 'ফ্যাসিজমকে রুখিতে—হাতুড়ি, কাস্তে, হাতিয়ারের পাশে তুলি-লেখনীর স্থান'[২২] শীর্ষক প্রতিবেদন দুটি থেকে এই সম্মেলন (১৯-২০শে ডিসেম্বর'৪২) সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানা যায়। ১৯শে ও ২০শে ডিসেম্বর কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুট হলে লেখক, সাহিত্যিক, কবি, শিল্পী ও বিপুল জনসমাবেশের মধ্যেই এই প্রথম সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় :

"...শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (মূল সভাপতি), মিঃ হবিবুল্লাহ বাহার, মিঃ আবু সয়ীদ আইয়ুব, শ্রী বুদ্ধদেব বসু ও শ্রী বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়—এই পাঁচজনকে লইয়া সভাপতিমণ্ডলী গঠিত হয়। সম্মেলন উদ্বোধন করেন শ্রী অতুলচন্দ্র গুপ্ত। শ্রী হিরণকুমার সান্যাল অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ পাঠ করেন। মহাপণ্ডিত শ্রী রাহুল সাংকৃত্যায়ন, শিল্পী শ্রী যামিনী রায়, কমরেড সজ্জাদ জহীর, বিখ্যাত 'এশিয়া' পত্রিকার ভারতীয় সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা গারট্রুড এমারসন্ সেন, খ্যাতনামা তেলেগু কবি ও নাট্যকার অধ্যাপক শ্রী আবুরি রামাকৃষ্ণ রাও, যুক্তপ্রদেশের প্রগতিশীল লেখক আন্দোলনের অন্যতম নেতা শ্রী প্রকাশচন্দ্র গুপ্ত ও বেনারসের 'দুনিয়া' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীনন্দলাল রায় সম্মেলনের সাফল্য কামনা করিয়া বাণী প্রেরণ করেন। ঢাকা, নদীয়া, ময়মনসিংহ, বহরমপুর, বাঁকুড়া, খুলনা প্রভৃতি জেলা হইতে এমনকি বিহার, উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ ও পঞ্জাব হইতেও প্রতিনিধিবৃন্দ সম্মেলনে যোগদান করেন।... ...'ফ্যাসিস্ট-বিরোধী মুসলিম লেখক সংঘ' ও অন্যান্য লেখক-শিল্পী সংঘ, কৃষক, মজুর ও ছাত্রদের তরফ হইতে সম্মেলনকে অভিনন্দন জানান হয়।...প্রতিক্রিয়াশীলতার চরম ও জঘন্য রূপ—ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করিতে লেখক ও শিল্পীদের আহ্বান করিয়া মূল প্রস্তাবটি রচিত হয়।"[২৩]......

'ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'-র এই প্রথম সম্মেলনে প্রদত্ত বিভিন্ন বক্তার বক্তৃতার যে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল তার অংশবিশেষ নিম্নরূপ :

"সম্মেলনের মূল সুরটি সভাপতি শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতায় পরিস্ফুট। ফ্যাসিজমের শত্রুতা যে কয়েকটি উর্বর মস্তিষ্কের খেয়ালমাত্র নয়—সত্যকার দেশপ্রেমের সহিত যে ইহার নাড়ীর যোগ আছে তারাশঙ্করবাবু ব্যক্তিগত জীবনের পৃষ্ঠপটে তাহা প্রমাণ করেন। বুদ্ধদেব বসু মহাশয় স্বাধিকার রক্ষার জন্যই ফ্যাসিস্ট নাগপাশের বিরুদ্ধে লেখকমাত্রেরই বিদ্বেষ ঘোষণা করেন। মিঃ হবিবুল্লাহ বাহার 'চট্টগ্রামে ও আসামে, প্রশান্ত মহাসাগরে ও আটলান্টিক মহাসাগরে যে সব বাঙালী ফ্যাসিবাদের হাত হইতে মানব-

সভ্যতাকে রক্ষা করিতে গিয়া বুকের রক্ত ঢালিতেছে তাহাদের দুঃখবেদনা, হাসিকান্না, আমাদের গল্প, উপন্যাস, কবিতায় ফুটাইয়া তুলিতে পারি নাই' বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন। এবং আশা করেন যে, 'নতুন করিয়া বাংলা সাহিত্য গড়িয়া উঠিবে।' 'যুগান্তর' সম্পাদক ও কবি শ্রী বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁহার অভিভাষণে জিজ্ঞাসা করেন, 'রাষ্ট্র ও সমাজের অন্তর্গত এই মনুষ্যত্ব যখন লাঞ্ছিত, অপমানিত এবং পদদলিত হয় তখন মনুষ্যত্বের উত্তরসাধক যারা, সেই শিল্পী ও সাহিত্য সেবকগণ কোন্ যুক্তিতে আপন আপন গৃহকক্ষে উদাসীন জড়ত্বের মধ্যে দিন যাপন করিবেন?"[২৪]

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, এই সংঘের মধ্যে দলমত-নির্বিশেষে সকল লেখক-শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীকে টেনে আনতে উদ্যোক্তারা যথেষ্ট সফল হয়েছিলেন। যদিও কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে একটি বিশেষ সেল (যার প্রথম তিনজন সদস্য ছিলেন চিন্মোহন সেহানবীশ, সুধী প্রধান ও বিনয় রায়)[২৫] এই সংঘের অধিকাংশ কার্যকলাপ তত্ত্বাবধান করত তবু এটা লক্ষণীয় যে, পূর্বোক্ত সভাপতিমণ্ডলীর একজন সদস্যও কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। মূল সভাপতি তারাশঙ্কর তো ছিলেন একজন নিবেদিতপ্রাণ কংগ্রেসকর্মী। পরবর্তী-কালে তিনি অবশ্য 'ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' এবং 'প্রগতি লেখক সংঘ' পরিত্যাগ করে 'কংগ্রেস সাহিত্য সংঘে' যোগ দেন এবং উৎকট কমিউনিস্ট বিরোধিতায় অবতীর্ণ হন। [দ্র. 'তারাশঙ্করের কমিউনিস্ট বিরোধী কুৎসার উৎস সন্ধানে' / সুধী প্রধান][২৬]

পরবর্তীকালে যাই ঘটুক না কেন, একথা আজ নির্দ্বিধায় বলা যায়, অন্তত ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলন চলাকালে কমিউনিস্ট পার্টি কোনো সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অগ্রসর হয়নি কিংবা কেবলমাত্র কমিউনিস্ট লেখক ও শিল্পীদের নিয়েই তাদের সংঘ বা সমিতি গড়ে তোলেনি। বরঞ্চ দেখা যাচ্ছে, 'ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে'-র যাঁরা প্রধান ব্যক্তিত্ব, তাঁদের অধিকাংশই রাজনৈতিক মতামতের দিক থেকে ছিলেন কমিউনিজম্-বিরোধী। তবুও কিছুই আটকায় নি। এখানেই ছিলি তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির কৃতিত্ব ও উদারতা। এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন চিন্মোহন সেহানবীশও।[২৭]

যাহোক, এই সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হয়েছিলেন 'পরিচয়' পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক হিরণকুমার সান্যাল এবং উদ্বোধক ছিলেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত (রাহুল সাংকৃত্যায়নের অনুপস্থিতিতে)। সভাপতির আসন থেকে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ঐতিহাসিক ফ্যাসিস্ত-বিরোধী ভাষণে প্রকারান্তরে কমিউনিস্ট পার্টির 'জনযুদ্ধ' নীতিকেই সমর্থন জানান। তারাশঙ্করের লিখিত অভিভাষণের অংশবিশেষ ছিল নিম্নরূপ :

"ভারতবর্ষের জনশক্তি, তার নেতৃবৃন্দ, তার বুদ্ধিজীবীগণ, তার সংবাদপত্র কোনোদিনই তার সত্য কর্তব্য করতে বিস্মৃত হয়নি। তার শ্রেষ্ঠ জাতীয়

প্রতিষ্ঠান ফ্যাসিবাদের উদ্ভবকাল থেকেই ওই আদর্শকে হীন বলে ঘোষণা করে এসেছে। ভারতের জাতীয় সংবাদপত্র ফ্যাসিবিরোধী নীতি এবং আদর্শকে জনসাধারণের মধ্যে আন্তরিকতার সঙ্গে প্রচার করে এসেছেন। ভারতের জনসাধারণ, তার শ্রেষ্ঠ জাতীয় প্রতিষ্ঠান, তার সংবাদপত্র, তার সাহিত্যিক, তার মনীষীবর্গ কেউই চায় না ফ্যাসিবাদী জার্মানীকে, জাপানকে অথবা ইটালিকে। কিন্তু তবু আমাদের সম্মুখে এক অদ্ভুত সমস্যা। ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের দমননীতি, ভেদনীতি, কূটনীতি ভারতে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে উত্তোলিত জনশক্তির উদ্যত হাত পঙ্গু করে দিয়েছে। ভারতের শ্রেষ্ঠ জাতীয় প্রতিষ্ঠান আজ বিপর্যস্ত, নেতারা বন্দী। উন্মত্ত জনসাধারণ সমগ্র দেশে তাণ্ডব শুরু করে দিয়েছে—তার ফলে জনশক্তির ব্যর্থ অপচয় হয়ে চলেছে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে।···

"ভারতের জনসাধারণ একটা শিকল খসাবার জন্য আর একটা শিকল পরতে চায় না এবং চাইবে না। ভারতের ইতিহাসে এই ভুলের বহু পুনরাবৃত্তি হয়েছে। সে-ভুলের মাশুল দিতে দিতে আবার সেই ভুল আমরা করব না। একদল লোক মুষ্টিমেয় হলেও আছে, যারা বলে—আমরা তো গোলামী করতে আছিই, গোলামী আমরা করব। হয় এর নয় ওর। তাদের আমি বলি ক্লীব। এই ক্লীব জাতির মধ্য হতে বিলুপ্ত হোক। এদেরই সমগোত্রীয় একদল সুবিধান্বেষী কৌশলতান্ত্রিক আছে, তারা বলে ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মারছে। প্রদীপের নিচেই অন্ধকারের মতো এই অতি বুদ্ধিমানদের বিষয়-বুদ্ধির মধ্যে প্রকাণ্ড বোকামির ফাঁক রয়েছে, সেটা তারা বুঝতেই পারে না। ষাঁড়ের শত্রুকে বাঘে যদি মেরেই ফেলে তবে ষাঁড় আশ্বস্ত হয় কোন্ আনন্দে কোন্ আশ্বাসে? কারণ বাঘের চেয়ে বড় শত্রু ষাঁড়ের আর কে আছে? এই ফ্যাসিবাদের স্বরূপ তারা বোধ করি কল্পনা করতে পারে না।···

"এ বিষয়ে আমি এই সাহিত্যিক এবং শিল্পী সংঘেরই মুখের দিকে চেয়ে আছি। আপনাদের কণ্ঠোচ্চারিত বাণীর সঙ্গে আমিও আমার কণ্ঠস্বর মিশিয়ে দেব। ভারতের জনগণকে বুঝতে হবে—এ সংগ্রাম শুধু তোমার মুক্তি-সংগ্রাম নয়, সমগ্র বিশ্বের জনগণের মুক্তি-সংগ্রাম।"[২৮]

সাহিত্যিক ও শিল্পী মহলে যথেষ্ট চাঞ্চল্য সৃষ্টি হলেও 'ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' কিন্তু তখনও পর্যন্ত সাংগঠনিক দিক থেকে ছিল বেশ দুর্বল। সেই সময়কার অন্যতম প্রধান সংগঠক চিন্মোহন সেহানবীশের মতে—শিল্পীদের কাছ থেকে যথেষ্ট সাড়া পাওয়া যায়নি। অভিজ্ঞ ও সুদক্ষ কর্মীর অভাব যথেষ্টই ছিল। অবশ্য শহরের বুদ্ধিজীবী পরিবেষ্টিত আবহাওয়া ও স্বতঃস্ফূর্তি থেকে সংঘকে জনমুখী করে গড়ে তোলার প্রচেষ্টাও সেই সময় কমিউনিস্ট পার্টি শুরু করে।[২৯] 'ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে'-র প্রথম সম্মেলনে তাই দেখা যায় বাঁকুড়া, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, যশোহর, খুলনা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলা থেকে প্রতিনিধিগণ যোগদান করেছেন। তাছাড়া নৈহাটি, রঙপুর, দিনাজপুর, হাওড়া প্রভৃতি স্থানে

ও জেলায় সংঘের শাখা স্থাপনের জন্য প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায় ১৯৪৩ সালের প্রারম্ভেই। চিন্মোহন সেহানবীশের লিখিত রিপোর্ট থেকে আরো জানা যায় যে, "গান ও অভিনয়ের দুটি স্থায়ী দল দ্রুত গড়ে উঠেছে। বোম্বাইতে আগামী 'প্রগতি লেখক সম্মেলনে' যোগদানের জন্য প্রায় পনেরো জন প্রতিনিধি যাবেন। ঐ সম্মেলনে সভাপতিমণ্ডলীর জন্য সংঘ থেকে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের নাম মনোনীত হয়েছে।"[৩০]

৪. ফ্যাসিবাদ-বিরোধী গ্রন্থমালা ও প্রচার-সাহিত্য :

'ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' গঠনের কিছুকাল পূর্ব থেকেই ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে শিক্ষিত ও সচেতন করার এবং আক্রান্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে জনমত গড়ে তোলার জন্য 'সোভিয়েত সুহৃদ্ সমিতি (F.S.U)'-র পক্ষ থেকে 'প্রচার-সাহিত্য' রচনার ও প্রকাশনার কাজ শুরু হয়ে যায়। কিন্তু 'ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' গঠন ও সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার সম্পাদিত 'অরণি' পত্রিকা প্রকাশের পরই ফ্যাসিবাদ-বিরোধী গ্রন্থমালা ও প্রচার-পুস্তিকা প্রকাশনার বিষয়টি বেশি গুরুত্ব পেতে থাকে। ১৯৪১-৪২ সালের মধ্যেই আমরা এইসব কাজগুলি বাস্তবায়িত হতে দেখি।

'সোভিয়েত সুহৃদ্ সমিতি (F.S.U)'-র উদ্যোগে সোভিয়েত আক্রান্ত হওয়ার কিছু পরেই 'সোভিয়েত সিরিজের' চারটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। এর একটির লেখিকা ছিলেন বিপ্লবী বীণা দাস ('সোভিয়েত নারী') এবং অপর তিনটির লেখক হলেন গোপাল হালদার [১. সোভিয়েত যুদ্ধের তিনমাস ; ২. সোভিয়েত যুদ্ধ ও ভারতবর্ষ ; ৩. সোভিয়েত কী লড়াই ঔর হামারা কর্তব্য (হিন্দী)] এছাড়াও F.S.U প্রকাশ করে সোভিয়েতের এগারোটি বিষয়-সম্বলিত এগারোজন বাঙালী লেখকের রচনায় সমৃদ্ধ গ্রন্থ—'সোভিয়েট দেশ' (বাংলা) এবং 'The Land of Soviets' (ইংরাজী)।

'অরণি'র প্রখ্যাত সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'আন্তর্জাতিক গ্রন্থমালা' (১লা জুন, ১৯৪২)। এই পর্যায়ে প্রকাশিত হয় চারটি পুস্তিকা। সেগুলি হলো : ১) জাপানীসমাজ ও শাসন / বিনয় ঘোষ , ২) জাপানের স্বাক্ষর / হিরণকুমার সান্যাল ; ৩) ভারত ও চীন / বিনয় ঘোষ এবং ৪) জাপ সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ / সুধী প্রধান।

পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক গ্রন্থমালার পঞ্চম ও ষষ্ঠ পুস্তিকা প্রকাশিত হয় 'ফ্যাসিবিরোধী জনসংঘ' নামক গণসংগঠনের উদ্যোগে। এই দুটি পুস্তিকা হলো : ৫) স্বাধীনতার শত্রু জাপান / হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও ৬) জাপানী মেয়েরা / মণিকুন্তলা সেন।

এছাড়াও 'ফ্যাসিবিরোধী জনসংঘ' কর্তৃক প্রকাশিত আরো তিনটি উল্লেখযোগ্য প্রচার-পুস্তিকা ছিল : ১) দেশরক্ষী বাহিনী/মনোরঞ্জন রায় ; ২) আজকের

কর্তব্য / স্নেহাংশু আচার্য ; ৩) CHINA CALLING / Hiren Mukherjee।

'ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'র অন্যান্য প্রচার-পুস্তিকাগুলি হলো : ১) জাপানী শাসনের আসল রূপ / বিজন রায় (অধ্যাপক সুশোভন সরকারের ছদ্মনাম) ; ২) সভ্যতা ও ফ্যাসিজম্ / বুদ্ধদেব বসু ; ৩) ফ্যাসিজম্ ও নারী / প্রতিভা বসু ; ৪) সোভিয়েত রাশিয়ার শিল্প ও সংস্কৃতি/বুদ্ধদেব বসু ; ৫) Europe Against Hitler / R.P. Dutt.

এইসব পুস্তিকার বিজ্ঞাপনীতে জানানো হয় যে, বিক্রয়লব্ধ অর্থ সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্যার্থে এবং ফ্যাসিবাদ-বিরোধী প্রচারকার্যে ব্যয়িত হবে। সাধারণত এই সব প্রচার-পুস্তিকার মূল্য ধার্য হতো এক আনা থেকে চার আনার মধ্যেই। পুস্তিকাগুলির বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল খুবই ভালো। কোনো কোনো পুস্তিকার একাধিক সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছিল। পাঠকবর্গ অত্যন্ত আগ্রহভরে (শহরের শিক্ষিতসম্প্রদায়ই তার মধ্যে সর্বাধিক) এইসব পুস্তিকা পাঠ করে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি জানবার চেষ্টা করতেন। অবশ্য এই প্রচার-সাহিত্যের প্রধান পাঠক ছিলেন ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনের কর্মী ও নেতৃবৃন্দ। কারণ, এই সব রচনা থেকেই তাঁরা প্রচারের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতেন।[৩১]

এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ করা যায় F. S. U. প্রকাশিত 'সোভিয়েত দেশ' এবং 'The Land of Soviets' নামক গ্রন্থ দুটির কথা। সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হওয়ার তিন মাসের মধ্যে সদ্যপ্রতিষ্ঠিত 'সোভিয়েত সুহৃদ্ সমিতি' গোপাল হালদার ও সুকুমার মিত্র সম্পাদিত প্রবন্ধ-সংকলন 'সোভিয়েট দেশ' প্রকাশ করে। সম্ভবত এই গ্রন্থই ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে শুধুমাত্র বাঙলা ভাষায় নয়, যে-কোনো ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত প্রথম প্রবন্ধ সংকলন। বস্তুতই বিষয়-বিন্যাস, লেখক-নির্বাচন ও রচনার গুণগত উৎকর্ষে 'সোভিয়েট দেশ' ছিল অসাধারণ। বিভিন্ন লেখক সোভিয়েতের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এই সংকলনে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। লেখকদের মধ্যে ছিলেন : হীরেন মুখার্জি, সুকুমার মিত্র, বিনয় ঘোষ, গোপাল হালদার, সরোজকুমার দত্ত, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, মন্মথনাথ সান্যাল, বিষ্ণু দে, শিবশঙ্কর মিত্র, অরুণ মিত্র। সোভিয়েট দেশ'-এর প্রকাশকাল ভাদ্র, ১৩৪৮, (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯৪১)। বইটি উৎসর্গ করা হয়েছিল সদ্য-লোকান্তরিত 'রবীন্দ্রনাথের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে'। উৎসর্গলিপির নিচেই ছিল রবীন্দ্রনাথের 'নাগিনীরা চারিদিকে···প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে'—কবিতাংশটির উদ্ধৃতি। বইয়ের চতুর্থ কভারে 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি' প্রকাশিত 'দি ল্যাণ্ড অফ সোভিয়েটস' গ্রন্থের ইংরাজি ও বাংলা বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হয়েছিল। সবশেষে ছিল এই আবেদনটি : "সোভিয়েট সুহৃদ সমিতিতে যোগদান করুন—/মানুষের নবজন্মের মুক্তিসংগ্রামে অগ্রসর হউন।" প্রচ্ছদপটে ছিল 'লাল ফৌজের সৈনিক'-এর একটি চমৎকার ছবি (এক বিখ্যাত সোভিয়েত ভাস্কর্য)। বইটির দাম ছিল—দেড় টাকা, পৃষ্ঠা সংখ্যা—৮+১২৫।

'The Land of Soviets' নামীয় প্রবন্ধ সংকলনটিও প্রকাশিত হয় সেপ্টেম্বর,

১৯৪১ সালে। সম্পাদক ছিলেন হীরেন মুখার্জি ও স্নেহাংশু আচার্য। লেখকদের মধ্যে ছিলেন : গোপাল হালদার, জ্যোতি বসু, স্টেলা ব্রাউন, অনিলা ব্যানার্জী, এলা সেন, এস. উপাধ্যায়, এস. কে. আচার্য, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, চিত্রা সেন, মণিকুন্তলা সেন, হীরেন্দ্রনাথ মুখার্জি। সংকলনের শেষে চুয়াত্তর জন বুদ্ধিজীবীর স্বাক্ষরসহ একটি বিবৃতিও ছিল।

বস্তুত, এই দুটি প্রবন্ধ সংকলন থেকেই সর্বপ্রথম বাঙলা তথা ভারতবর্ষের সাধারণ শিক্ষিত মানুষ ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় সোভিয়েত ইউনিয়নের উন্নতি-সংক্রান্ত প্রকৃত সংবাদ ও তথ্য জানতে পারে। তারাশঙ্কর, বুদ্ধদেব এবং সজনীকান্ত-র মতো কমিউনিজম্ বিরোধীদের পরবর্তীকালে 'ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে' সামিল করার ক্ষেত্রেও এই দুটি সংকলন হয়তো কিছুটা ভূমিকা পালন করেছিল।

ফ্যাসিবাদ-বিরোধী প্রচার-পুস্তিকার মধ্যে আর একটি উল্লেখযোগ্য পুস্তিকা হলো—বুদ্ধদেব বসু-রচিত 'সভ্যতা ও ফ্যাসিজম'। এটিরও অন্য এক তাৎপর্য রয়েছে। কারণ, রাজনীতির শত যোজন দূরে যাঁর অবস্থান, বিশুদ্ধ সাহিত্যের যিনি উপাসক, সেই উন্নাসিক ও অভিজাত সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু কিভাবে নিঃসঙ্গতার গজদন্তমিনার থেকে অন্তত কিছুদিনের জন্যেও নেমে এসে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী ঐতিহাসিক এক আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন এই রচনাটি তারই সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। এই চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী প্রচার-পুস্তিকায় সেদিন বুদ্ধদেববাবু লিখেছিলেন :

> "রাজনীতি আমার জীবনে কখনো আলোচ্য বিষয় ছিল না। বাল্যকাল থেকে জেনেছি আমি কবি, আমি সাহিত্যিক, আমার মধ্যে যা-কিছু খাঁটি তা রচনাচর্চাতেই একান্তে প্রয়োগ করেছি।...
>
> "একদিকে জার্মানি ইটালিতে মনুষ্যত্বের অবমাননা ও সভ্যতার বিনাশ, অন্য-দিকে রাশিয়াতে মনুষ্যত্বের পূর্ণ মর্যাদা দান ও সভ্যতার পূর্ণ বিকাশের সাধনা। এই জুড়ি দৃশ্য যখন দেখলুম তখন রাজনীতির বড়রকমের একটা অর্থ মনে ধরা দিল। তখন বুঝলুম রাজনীতি শুধু অ্যাসেমব্লি হলের বক্তৃতা নয়, মাছ ও পাঁউরুটি বিতরণ নিয়ে নোংরা কলহ নয়, আমাদের প্রত্যেকের জীবন যাপন, ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ রাজনীতির উপর নির্ভরশীল, এবং সেইজন্য তার আলোচনায় আমাদের সকলেরই প্রয়োজন। শান্তির সময়, সুখের সময় নির্লিপ্ত থাকা সম্ভব, হয়তো সে অবস্থাই স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল, কিন্তু চারদিকে যখন অশান্তির আগুন লেলিহান হয়ে জ্বলে ওঠে তখন কবি বলো শিল্পী বলো ভাবুক বলো কারো পক্ষেই মনের মধুর প্রশান্তি অক্ষুণ্ণ রাখা আর সম্ভব হয় না, যার প্রাণ আছে তার প্রাণেই ঘা লাগে।...
>
> "বর্বরতার বিরুদ্ধাচরণ মনুষ্যধর্ম মাত্র, কিন্তু লেখকদের পক্ষে এর বিশেষ একটু তাৎপর্য আছে। পশুত্বের বিরুদ্ধে আমাদের দাঁড়াতেই হবে, নয়তো আমাদের

অস্তিত্বই যে থাকে না। জার্মানি থেকে মনীষীরা যখন একে একে বিতাড়িত হতে লাগলেন, জাপানের বোমাবর্ষণে চীনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যখন বিধ্বস্ত হতে লাগল, তখন ঘৃণায় শিহরিত হয়ে এ-কথাই ভাবলুম যে দু'দিন পরে এইরকম কোনো পৈশাচিক শক্তি যদি ভারতবর্ষের দিকে বিষাক্ত ফণা উদ্যত করে তাহলে আমরা যারা কবি শিল্পী বিদ্যানুরাগী আমরা আমাদের স্বাধিকার থেকে সকলের আগে বঞ্চিত হবো···যা-না থাকলে আমাদের জীবনের কোনো মানে থাকে না সব একেবারে ছারখার হয়ে যাবে। স্প্যানিশ যুদ্ধে, চীন-জাপানের যুদ্ধে এটুকু আমাদের শিক্ষা, বৃহত্তর রাজনীতিতে সেই প্রথম দীক্ষা।

"তারপর সেদিন যুদ্ধ বাধল। বর্বরতার শেষ সূক্ষ্ম মুখোস খ'সে পড়ল, ভণ্ডামির ভদ্রতাটুকু পর্যন্ত কোনোখানে আর রইল না। জলে-স্থলে-আকাশে হত্যা আজ স্বেচ্ছাচারী, শুধু যোদ্ধহত্যা নয়, নারীহত্যা, শিশুহত্যা, জনতার সামগ্রিক বিনাশ, তাছাড়া সত্যের, সুন্দরের সমস্ত আদর্শের হত্যা।···

"এরই নাম ফ্যাসিজম্। অর্থনীতি ও রাজনীতির দিক থেকে ফ্যাসিজমের ব্যাখ্যার মধ্যে আমি যাবো না, আমি দেখতে পাচ্ছি এটা সংস্কৃতির প্রতিশ্রুত শত্রু, সভ্যতার ইতিহাসে এ-একটা তীব্র বিষাক্ত প্রতিক্রিয়া। সেইজন্যে আমরা যারা সংস্কৃতিতে বিশ্বমানবের ঐতিহাসিক প্রগতিতে আস্থাবান, আমাদের এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতেই হবে।"[৩২]

প্রকৃতপক্ষে, শুধু তারাশঙ্কর বা বুদ্ধদেব বসুই নন, 'ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে'র কর্মযজ্ঞে সামিল হয়েছিলেন রবীন্দ্র-পরবর্তী যুগের আরও অনেক প্রধান লেখক-কবি ও সাহিত্যিক। এঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। একদা ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনে আসক্ত মানিকবাবু সংঘের প্রভাবে শুধু কমিউনিস্ট মতাদর্শই গ্রহণ করেননি, একজন সক্রিয় ও উদ্যোগী কর্মীরূপে 'ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' এবং 'প্রগতি লেখক সংঘ'কেও দীর্ঘদিন নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন। হিরণকুমার সান্যাল ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় এই সময় প্রগতিশীল লেখকদের জবানবন্দীরূপে 'কেন লিখি?' শিরোনামে একটি বই প্রকাশিত হয় (সংঘের পক্ষে ১৯৪৪ সালের জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত, এবং তারাশঙ্কর, প্রেমেন্দ্র, জীবনানন্দ, অন্নদাশঙ্কর, বিষ্ণু দে প্রমুখ ১৫ জন লেখকের লেখা সম্বলিত)। এতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন:

"কলমপেষার পেশা নিয়ে প্রশংসায় আনন্দ পাই বলে দুঃখ নেই, এখনো মাঝে মাঝে অন্যমনস্কতার দুর্বল মুহূর্তে অহংকার বোধ হলে আপশোষ জাগে যে খাঁটি লেখক কবে হব।"[৩৩]

নামী লেখক হয়েও মানিকবাবুর এই বিনয় প্রকাশ সেই সময়কার সংঘ-আন্দোলনেরই ফলশ্রুতি বলা যেতে পারে। মানিকবাবু বা সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-র পাশাপাশি সাময়িকভাবে হলেও বিমলচন্দ্র সিংহ, সজনীকান্ত দাস, বুদ্ধদেব বসু,

অমিয় চক্রবর্তী, প্রতিভা বসু প্রমুখের নামও সংঘের সভ্যতালিকাভুক্ত হয়েছিল। এছাড়াও 'পরিচয়-গোষ্ঠী'-র নীরেন্দ্রনাথ রায় চল্লিশের দশকের প্রারম্ভেই মার্কস-বাদকেই তাঁর জীবনাদর্শ রূপে গ্রহণ করলেন। অধ্যাপক সুশোভন সরকার, হিরণকুমার সান্যাল, গিরিজাপতি ভট্টাচার্য প্রমুখ বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবীগণও সহযোগিতা করতে এগিয়ে এলেন 'ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী-সংঘে'র আন্দোলনকে। মোটকথা, এই সময় ৪৬ নম্বর ধর্মতলা স্ট্রীটে পূর্বোক্ত লেখকদের সঙ্গে ক্রমশ মিলিত হতে থাকেন আরও অনেক খ্যাতিমান ও প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন কবি-সাহিত্যিক এবং সাংস্কৃতিক কর্মী।[৩৪] এ-প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনে নিবেদিতপ্রাণ কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য-র নাম। ১৯৪৩ সালের প্রথম থেকেই সুকান্ত '৪৬ নম্বরে' আসা-যাওয়া শুরু করেন। এ সম্পর্কে চিন্মোহন সেহানবীশ তাঁর স্মৃতিচারণে বলেছেন :

"মনে পড়ে আমাদের সেই বিখ্যাত ৪৬ নম্বর ধর্মতলা স্ট্রীটের আসরে একজন প্রধান লেখকের গল্প পাঠের পরই সুকান্তর সেই নরম, কাঁপা কাঁপা গলায় তার সদ্যরচিত কবিতা পাঠ—

'এখনো তোমার গানে সহসা উদ্বেল হয়ে উঠি
নির্ভয়ে উপেক্ষা করি জঠরের নিঃশব্দ ভ্রূকুটি।
আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায়
আমার বিনিদ্র রাতে সতর্ক সাইরেন ডেকে যায়।'

তারাশঙ্করবাবুই সেদিন তাঁর লেখা পড়েছিলেন কিনা, মনে নেই। কিন্তু স্পষ্ট মনে আছে তিনি আসরে উপস্থিত ছিলেন আর সুকান্তর কবিতাপাঠ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উঠে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন।"[৩৫]

নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের (মে, ১৯৪৩), বোম্বাই সম্মেলনের পরে, ১৯৪৪ সালের জানুয়ারি মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয় 'ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে'র দ্বিতীয় রাজ্য সম্মেলন। ইতিমধ্যে 'ভারত-ছাড়ো আন্দোলন', যুদ্ধাতঙ্ক, দেশজোড়া মন্বন্তর, জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র এবং ফ্যাসিস্ত সমর্থক দলগুলির কমিউনিস্ট-বিদ্বেষ—এর সবকিছুই সেদিন দৃঢভাবে মোকাবিলা করেছিলেন মার্কস-বাদী শিল্পী-সাহিত্যিক আর বুদ্ধিজীবীরা। গবেষক শ্রী ধনঞ্জয় দাশ উল্লেখ করেছেন যে, একমাত্র পার্টির সাধারণ সম্পাদক পি. সি. যোশীর ব্যক্তিগত উদ্যোগ ছাড়া ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টি ফ্যাসিস্ত-বিরোধী সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন পরিচালনার জন্য কোনো ফ্রাকশান বা কেন্দ্রীয় সেল তৈরি করেননি।

১৯৪৩ সালে বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেসের সময় কমিউনিস্ট নেতাদের সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট সম্পর্কে মনোভাবের কথা উল্লেখ করে ধনঞ্জয় দাশ লিখেছেন :

"...পার্টি-কংগ্রেসে আগত সর্বভারতীয় কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ এই সময় বোম্বাইতে উপস্থিত থেকেও প্রগতি লেখক এবং গণনাট্য সংঘ-র সম্মেলনের

বিভিন্ন অধিবেশনে অনেকে ব্যক্তিগতভাবে যোগদান করেও পার্টির প্রথম কংগ্রেসের সুদীর্ঘ অধিবেশন চলাকালে তাঁদের কেউ-ই কিন্তু সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট সম্পর্কে কোনো আলোচনা করলেন না কিংবা সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট পরিচালনার জন্য কোনো নির্দেশক প্রস্তাবও গ্রহণ করলেন না।"[৩৬]

এর ফলেই কেন্দ্রীয় স্তরে প্রগতি-সংস্কৃতি আন্দোলন কিংবা ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী আন্দোলন বাঙলার মতো অত সক্রিয়ভাবে আত্মপ্রকাশ করেনি। কেন্দ্রীয় পার্টি-নেতৃত্বের তুলনায় কমিউনিস্ট পার্টির বাঙলা কমিটির নেতৃত্ব, বিশেষ করে ভবানী সেন, সোমনাথ লাহিড়ী ও বঙ্কিম মুখার্জি এ বিষয়ে অনেক সক্রিয় ও যোগ্যতর ভূমিকা পালন করেছিলেন। বাঙলায় ফ্যাসিস্ত-বিরোধী সাংস্কৃতিক আন্দোলন সংগঠিতভাবে পরিচালনার জন্য কমিউনিস্ট পার্টির শিল্পী ও সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী সদস্যদের নিয়ে এই সময় গঠিত হয় গণনাট্য সেল, লেখক ও সাংবাদিক সেল, 'পরিচয়' সেল প্রভৃতি। এতগুলি সেলের মধ্যে যোগাযোগ আর সমন্বয়-সাধন এবং সাধারণভাবে আন্দোলনকে নির্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত করার জন্য একটি সাংস্কৃতিক ফ্রাকশানও সেইসময় গঠন করা হয়েছিল।[৩৭]

এইভাবে বাঙলায় ফ্যাসিস্ত-বিরোধী সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রসার যেমন একদিকে ঘটতে থাকে, অন্যদিকে তেমনি পূর্ববর্তীকালে সামিল হওয়া বেশ কয়েকজন লেখকও সংঘ পরিত্যাগ করে চলে যান। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, সজনীকান্ত দাস ও সুবোধ ঘোষ। প্রধানত সংঘের আরোপিত নিয়ম ও অনুশাসন মেনে চলায় অক্ষমতা, নিজেদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ ও আত্মকেন্দ্রিক মানসিকতা এবং প্রচ্ছন্ন কমিউনিস্ট-বিরোধী ধ্যান-ধারণাই ছিল এই সব সাহিত্যিকদের সংঘ পরিত্যাগের মূল কারণ। অবশ্য খ্যাতিমান সাহিত্যিকবৃন্দের একাংশ যেমন প্রগতি-সংস্কৃতির ফ্রন্ট ত্যাগ করেছিলেন, তেমনি তাঁদের তুলনায় সংখ্যায় অনেক বেশি ফ্যাসিস্ত-বিরোধী ও মানবপ্রেমিক প্রবীণ এবং নবীন শিল্পী-সাহিত্যিকরা এসে হাত মিলিয়েছিলেন প্রগতি-সংস্কৃতির সৃষ্টিমুখর কর্মযজ্ঞে।

এরি প্রতিফলন দেখা গেল 'ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে'র দ্বিতীয় সম্মেলনে (১৫-১৭ই জানুয়ারি, ১৯৪৪)। এই সম্মেলনের মূল সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং সভাপতিমণ্ডলীর সদস্যরূপে সম্মেলনের কার্যসূচী পরিচালনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অতুল বসু, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, আবুল মনসুর আহ্‌মদ, গোপাল হালদার ও শচীন দেববর্মন-এর মতো বাঙলার সাংস্কৃতিক জগতের অগ্রগণ্য প্রতিনিধিবৃন্দ। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সম্মেলন থেকেই প্রেমেন্দ্র মিত্রকে সভাপতি এবং জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ও গোলাম কুদ্দুসকে যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত করে গঠিত হয় সংঘের নতুন কমিটি। 'জনযুদ্ধ'-তে প্রকাশিত এই সম্মেলনের রিপোর্টে বলা হয়:

"…১৫ই জানুয়ারি ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন হলে সম্মেলন আরম্ভ হইল। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অভিভাষণে বললেন, আমরা মানবজাতির পক্ষে। যে শক্তি মানুষকে পদানত করার জন্য উদ্যত হইয়াছে, ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ তারই বিরুদ্ধে। আজ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের মধ্যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা নানাভাবে ভাষা পাইয়াছে—দেশের এই সংকটেও বাংলা সাহিত্যকে যথেষ্ট নাড়া দিয়াছে। আমরা ভুলি নাই যে যখন গত কয়েক মাস ধরিয়া লক্ষ লক্ষ লোক অন্নহীন ও বস্ত্রহীন অবস্থায় পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে তখন অনেকগুলি দেশী মিল কাপড় ও চাউলের ব্যবসায় লক্ষ লক্ষ টাকা সুপার ইনকাম ট্যাক্স নিয়াছে। এই সমস্ত মুনাফাখোরদের বিরুদ্ধে আমরা আমাদের সাহিত্যিক কর্তব্য পালন করিব আর এই সংকটের মধ্যে আমাদের দুঃস্থ দেশকর্মীকে সান্ত্বনা, আশা ও নূতন জীবনের ভরসা শুনাইব। অনাগত মুক্তির বাণী বহন করিবার ভার লইয়াছে এই লেখক ও শিল্পী সংঘ।

"যুক্ত প্রদেশ প্রগতি লেখক সংঘের শিবদাস সিং চৌহান, নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের যুক্ত সম্পাদক বিষ্ণু দে, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার আবদুল্লাহ রসুল সম্মেলনকে অভিনন্দন জানান। ইহার পর সংঘের বিদায়ী সম্পাদক চিন্মোহন সেহানবীশ[৩৮] গত বছরের কাজের বিবরণী পাঠ করেন।…

"মূল সভাপতি প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর অভিভাষণে বলেন, অন্য সাহিত্য সভাগুলি হইতে এই সভার বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে সাহিত্যিকেরা জনগণের সম্পর্কে আসেন, দেশের সমস্যার সঙ্গে পরিচিত হন, তাহাদের কি কর্তব্য আছে, কি তাহারা দিতে পারে তাহাই জানিয়া যান। এই জন্যই তিনি এই সভায় আসিয়াছেন। যুগে যুগে মানুষের কল্যাণ, মঙ্গলের বিরুদ্ধে শত্রুরা বিভিন্ন ভাবে মাথা তুলিয়াছে, শিল্পীরাও তাহা বাধা দিয়াছে। আজ সেই শক্তি নতুন নাম নিয়াছে তাই তাহার বিরুদ্ধেও আমাদের নতুন নামে অভিযান ঘোষিত হইবে। ফ্যাসিস্ত-বিরোধী নামের সার্থকতা এইখানে। ফ্যাসিজম মানুষের চিন্তা ও সংস্কৃতি জগতের শত্রু। দেশব্যাপী দুঃখ ও বিপদের মধ্যে আর সকলের সঙ্গে সাহিত্যিক ও শিল্পীদেরও কাজ করিবার আছে। ইহা স্মরণ করিয়াই এই সংঘবদ্ধতা। অত্যাচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সমবেত হওয়া সাহিত্যিক ও শিল্পীর স্বধর্ম।…

"আবুল মনসুর আহম্মদ বলেন, লেখক ও শিল্পী আকাশচারী হইতে পারে না, দেশবাসীর চিন্তা ও কল্যাণবোধই শিল্পীর চিন্তাধারাকে রূপায়িত করিয়া তোলে। ভারতের হিন্দু ও মুসলমানের জীবনাদর্শের এবং ঐতিহাসিক শিক্ষা ফ্যাসিজমের বিরোধী। কাজেই ভারতের লেখক ও শিল্পীদের ফ্যাসিস্ট-বিরোধিতা একটা নেতিবাচক ভাববিলাসিতা নহে। ইহার মধ্যে আমাদের জীবনের যোগ আছে।

"সভায় শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দেবী সরস্বতী সোভিয়েট, চীন ও অপরাপর ফ্যাসিস্ট পদানত দেশগুলির নির্যাতিত সাহিত্যিক ও শিল্পীদের অভিনন্দন জানাইয়া প্রস্তাব আনেন। অধ্যাপক শ্রী নীরেন্দ্রনাথ রায় ও চীন-প্রত্যাগত ডাঃ বিজয়কৃষ্ণ বসু এই প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তৃতা দেন। অপর একটি প্রস্তাবে সিনেমা, থিয়েটার রেডিও প্রভৃতির ভিতর দিয়া একটি প্রগতিমূলক ভাবধারা প্রচারের দাবি জানাইয়া অধ্যাপক নীহার সরকার একটি প্রস্তাব আনেন, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য এই প্রস্তাব সমর্থন করেন।

"তারপর দেশের মধ্যে অচল অবস্থা অবসানের জন্য দেশের মধ্যে বিরাট ঐক্য গড়িয়া তোলার কাজে লেখক ও শিল্পীদের অহ্বান জানাইয়া মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন হিরণকুমার সান্যাল। সমর্থক: হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। সবশেষে সাংগঠনিক প্রস্তাবটি তোলেন ঢাকার রণেশ দাশগুপ্ত। সমর্থনে বলেন মুর্শিদাবাদের সুশান্ত পাঠক।"[৩৯]

'ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে'র এই দ্বিতীয় সম্মেলনের সব থেকে উল্লেখযোগ্য দিক ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। শ্রদ্ধানন্দ পার্ক ও মিনার্ভা থিয়েটারে কলকাতার নাগরিকসমাজ এই প্রথম এত ব্যাপকভাবে সমৃদ্ধশালী লোকসংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হন। এই প্রসঙ্গটি পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হবে। কিন্তু সম্মেলনের ব্যাপক সাফল্য সত্ত্বেও কলকাতার প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকদের এক উল্লেখযোগ্য অংশ এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেননি, যা 'অরণি' পত্রিকায় স্বর্ণ-কমল ভট্টাচার্যের লেখায় অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে।[৪০] বস্তুত, তখন থেকেই সাহিত্যে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা ও বিশুদ্ধ সাহিত্য সৃষ্টি এবং মার্কসবাদী ও কলাকৈবল্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি-সংক্রান্ত বিতর্কেরও সূচনা হতে থাকে। একদল অকমিউনিস্ট সাহিত্যিকও নানা কারণে 'প্রগতি লেখক সংঘ' (যার বাঙলা শাখা ছিল 'ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ') থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নেন। এঁদের অনেকেরই উপজীব্য ছিল অবশ্য অন্ধ কমিউনিস্ট-বিদ্বেষ। এমনকি 'ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে'-র বিরোধী সাহিত্য সংঘও তাঁরা গঠন করেছিলেন। এ-প্রসঙ্গে প্রগতি-সাহিত্য আন্দোলনের গবেষক ধনঞ্জয় দাশ লিখেছেন:

"...১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলনের পর যে উগ্র জাতীয়তাবাদ শিক্ষিত মধ্য-বিত্তের একাংশকে কমিউনিস্ট-বিদ্বেষী করে তোলে সেই জাতীয়তাবাদই জন্ম দেয় এক ধরনের বিকৃত সাহিত্যের। এই সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল প্রধানত সেদিনের তথাকথিত জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র এবং সজনীকান্ত দাস পরিচালিত ও সম্পাদিত 'শনিবারের চিঠি'। হুমায়ুন কবীর-এর 'চতুরঙ্গ' এবং সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'পূর্বাশা' পত্রিকার কিছু পৃষ্ঠাও এই বিকৃতির ফসল সানন্দে ধারণ করে আছে। আজ ভাবতে আশ্চর্য লাগে, সেদিন মার্কসবাদকে হেয় প্রতিপন্ন করার কাজে কিংবা কমিউনিস্ট-চরিত্রকে হীন এবং ঘৃণ্যভাবে আঁকবার জন্য বাঙলাদেশের প্রধান এবং খ্যাতিমান শিল্পী-সাহিত্যিক

বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তেমন বেশি সাড়া মেলেনি। কংগ্রেস নেতা কিরণশঙ্কর রায়-এর পৃষ্ঠপোষকতায়, সজনীকান্ত দাস-এর অধিনায়কত্বে এবং নিষ্ঠাবান কংগ্রেসকর্মী শচীন্দ্রনাথ মিত্র ও স্মৃতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর উদ্যোগে, সম্ভবত ১৯৪৪ সালে গড়ে ওঠে 'কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ'। সৃজনশীল সাহিত্যিকদের মধ্যে বনফুল আর সুবোধ ঘোষ ঐ সময় কিংবা এর কিছু আগে-পরে রচনা করেন কমিউনিস্ট-বিদ্বেষ ও মিথ্যাচারে পরিপূর্ণ তাঁদের সেই কুৎসামূলক প্রচারধর্মী উপন্যাস 'অগ্নি' ও 'তিলাঞ্জলি'। মোহিতলাল ও ড. বটকৃষ্ণ ঘোষ-এর মতো খ্যাতিমান পণ্ডিতকেও সজনীকান্ত এই সময় ব্যবহার করেন মার্কসবাদ ও মার্কসীয় সাহিত্যের অন্তঃসারশূন্যতা প্রমাণের কাজে।"[৪১]

৫. কয়েকটি ফ্যাসিস্ত-বিরোধী প্রকাশনা ও কাব্যসংকলন :

যাহোক, সজনীকান্ত দাস তথা 'কংগ্রেস সাহিত্য সংঘে'-র কমিউনিস্ট-বিদ্বেষী উগ্র জাতীয়তাবাদী প্রচার 'ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে'-র সজীব কর্ম-প্রচেষ্টাকে সেদিন একটুও ম্লান করতে পারেনি। এই সময়পর্বে ফ্যাসিজমের ভয়ঙ্কর বীভৎসতা সম্পর্কে দেশবাসীকে সচেতন করার জন্য বিনয় ঘোষ-এর কলম থেকে বেরিয়ে এলো—'সংস্কৃতির দুর্দিন', প্রকাশিত হলো গোপাল হালদারের 'সংস্কৃতির রূপান্তর'; লেখক সংঘের উদ্যোগে 'জনযুদ্ধের গান', দক্ষিণ কলকাতার ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে 'প্রাচীর' কাব্যসংকলন (সোমেন চন্দ-কে উৎসর্গীকৃত) ; বিষ্ণু দে-র কাব্যপুস্তিকা 'বাইশে জুন'; সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও গোলাম কুদ্দুস-এর সম্পাদনায় 'একসূত্রে' কাব্যসংকলন ; হিরণকুমার সান্যাল ও সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত প্রগতিশীল লেখকদের জবানবন্দী 'কেন লিখি', সুধী প্রধান সম্পাদিত 'কয়েকজন লোককবি'; সুকান্ত ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'আকাল'; এবং বিজন ভট্টাচার্য লিখিত দুটি যুগান্তকারী নাটক 'জবানবন্দী' ও 'নবান্ন' ('অরণি'-তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত)। এর মধ্য থেকে কয়েকটি বই সম্পর্কে কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য অতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

'প্রাচীর' (কাব্যসংকলন) :

'প্রাচীর' ছিল শহীদ-কমরেড সোমেন চন্দকে নিবেদিত ফ্যাসিস্ত-বিরোধী প্রথম কাব্যসংকলন। এটি প্রকাশিত হয় ২৮শে মার্চ (১৯৪২)-এ ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সম্মেলনের ঠিক প্রাক্-মুহূর্তে। অবশ্য অন্য একটি তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে যে, এটি প্রকাশিত হয় ২-৩ এপ্রিল নাগাদ।[৪২] দক্ষিণ কলকাতা জেলা ছাত্র ফেডারেশন প্রকাশিত এই কাব্যসংকলনটিতে জ্বালাময়ী কয়েকটি কবিতা রচনা করেন কবি অমিয় চক্রবর্তী, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, সমর সেন প্রমুখ কবিরা। সুভাষ মুখোপাধ্যায় রচিত সম্পাদকীয় (নো পাসারন) পরবর্তীকালে 'একটি বুলেট : একটি ফ্যাসিস্ট' রূপে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। জানা যায়, কবি অমিয় চক্রবর্তী 'প্রাচীর' কাব্যসংকলনের আর্থিক দায়-

দায়িত্ব পালন করা থেকে প্রুফ দেখা পর্যন্ত সমস্ত কাজই হাসিমুখে ও উৎসাহভরে করে দেন। যদিও এই কাব্যসংকলনে সম্পাদকরূপে মিহির বসু ও অজয় দাশগুপ্ত-র নাম মুদ্রিত ছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি সম্পাদনা করেন ছাত্র-ফেডারেশনের সংস্কৃতি-সম্পাদক কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়।[৪৩] সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সেই স্বাক্ষরবিহীন ভূমিকা 'নো পাসারন'-এর অংশবিশেষ ছিল নিম্নরূপ :

"সোভিয়েটের রক্তিম ভূগোলে ফ্যাসিস্টদের উন্মত্ত চীৎকার শোনা গেল। কিন্তু আহত সে ঢেউ দগ্ধ মেদিনীর চিহ্ন নিয়ে ফিরে গেল। মুক্ত জনপদগুলি নাৎসীদের কঙ্কালে স্তূপীকৃত হয়ে থাকলো। বিশ্বমুক্তির দুর্গ বিপন্ন—দেশে দেশে মুক্তিকামীর দল শপথ নিলো : 'একটি বুলেট, একটি ফ্যাসিস্ট।'

"ভারতবর্ষে সেই প্রতিরোধের প্রাচীর উঠছে। তার তলায় খোঁড়া হচ্ছে বিশ্বশৃঙ্খলের কবর। মিছিলে, প্রাচীরপত্রে ধ্বনিত হচ্ছে বিপন্ন ভারতের আকাঙ্ক্ষা : 'হাতিয়ার চাই'।"

'প্রাচীর' কাব্যসংকলন প্রকাশের পর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তা নিয়ে এক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। কবি-সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু তাঁর সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকায় (আষাঢ়, ১৩৪৯) এক সম্পাদকীয়তে লেখেন :

"...সম্প্রতি ছাত্রসমাজ একই সঙ্গে নিহতের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা ও হত্যাকারীর প্রতি তাঁদের ঘৃণা প্রকাশ করেছেন 'প্রাচীর' নামক কবিতার সংগ্রহটি সোমেন চন্দের স্মৃতিতে উৎসর্গ করে। এ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অত্যন্ত শোভন হয়েছে, কারণ 'প্রাচী'র বইটিতে বাংলার অনেক কবি তারই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন, যে মনোভাব সংস্কৃতি ও প্রগতির শত্রু। আমরা আশা করি ঢাকা থেকে সোমেন চন্দের বন্ধুরা তাঁর সম্বন্ধে একটি স্মৃতিগ্রন্থ প্রকাশ করবেন, তাতে তাঁর নিজের কিছু কিছু রচনা ও তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে বন্ধুদের প্রীতিতর্পণ সংগৃহীত হতে পারে। বইটি আকারে যদি ক্ষুদ্র হয় তবু আজকের দিনে তার মূল্য হবে প্রচুর।"

জনযুদ্ধের গান (গীতি-সংকলন) :

'জনযুদ্ধের গান' ছিল 'ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' কর্তৃক প্রকাশিত সব থেকে জনপ্রিয় ফ্যাসিবাদ-বিরোধী গানের একটি অসামান্য সংকলন। ১৯৪২-এর জুলাই মাসে প্রকাশিত এই সংকলনটির দু'হাজার কপি শেষ যায় মাত্র দু'মাসের মধ্যে। সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় সংস্করণ। মে, ১৯৪৩-এ প্রকাশিত হয় গীতি-সংকলনটির তৃতীয় সংস্করণ।

প্রথম সংস্করণে মোট ১২টি গান অন্তর্ভুক্ত ছিল। যার মধ্যে মোহিত বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত 'সোভিয়েট জাতীয় সঙ্গীত' (সোভিয়েত ভূমি বিশ্ব শ্রমিক-প্রিয়) ও 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক-সঙ্গীত' (জাগো জাগো সর্বহারা) ছাড়া বাকি ১০টি গানই ছিল জাপবিরোধী। তার মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হয় এবং সেই

সময় লোকের মুখে মুখে ঘুরতে থাকে ছুটি গান। একটি হলদরজী রচিত ভোজপুরী গান 'কেকরা, কেকরা নাম বাতাও। জগমে বড়া লুটেরা কৌন' এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায় রচিত 'বজ্রকণ্ঠে তোল আওয়াজ / রুখবো দস্যুদলকে আজ / দেবে না জাপানী উড়োজাহাজ / ভারতে ছুঁড়ে স্বরাজ।' এছাড়া অন্য গানগুলির রচয়িতা ছিলেন মূলত বিনয় রায়, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, প্রভাত বসু প্রমুখ শিল্পীরা।

দ্বিতীয় সংস্করণে ও তৃতীয় সংস্করণে আরো কয়েকটি গান অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এগুলির রচয়িতা ছিলেন—জলি কাউল, ভারতভূষণ আগরওয়াল, বিষ্ণু দে, হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, মণীন্দ্র রায়, অবন্তী সান্যাল ও হেমাঙ্গ বিশ্বাস। মৈমনসিংহ-র কৃষক-কবি নিবারণ পণ্ডিত ও ট্রাম-শ্রমিক রহমানের রচিত লোকগীতি ও কাওয়ালি গানও এই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

১৯৪৩-এর মে মাসে 'জনযুদ্ধের গান'-এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। মূল্য ছিল তিন আনা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২+৩৪। মলাটের জন্য আলাদা কভার পেপার আছে কিন্তু কোনো ব্লক ছাপা হয় নি। প্রথম ও চতুর্থ কভারে 'এক সূত্রে বাঁধা আছি সহস্রটি মন' (ভুলভাবে উদ্ধৃত) গানটির কয়েক স্তবক উদ্ধৃত এবং দ্বিতীয় কভারে রবীন্দ্রনাথেরই আর একটি উদ্ধৃতি 'হে মোর চিত্ত……'। তৃতীয় কভারটি সাদা। বিনয় রায়ের দু'পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকায় সংস্করণটি সমৃদ্ধ। তাছাড়া এই তৃতীয় সংস্করণে পূর্ববর্তী অনেকগুলি গান বর্জিত ও বেশ কয়েকটি নতুন গান গৃহীত হয়েছে। কোনো কোনো গানের মাথায় সুরনির্দেশ (যেমন, 'সুর ভাটিয়ালী জেয়ালো ঝোঁক' কিংবা 'বাউল সুর' ইত্যাদি) বা কৌতূহলোদ্দীপক পরিচিতি আছে, যেমন 'বজ্রকণ্ঠে তোলো আওয়াজ' গানটির ওপর লেখা হয়েছে 'প্রথম জাপ-বিরোধী গান' কিংবা 'চাষী গেরিলার গান'-এর ওপর লেখা হয়েছে 'গত বৎসর ডোমার (রংপুর জেলা) প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনে গাওয়া হয়' ইত্যাদি।

'জনযুদ্ধের গান-'এর তৃতীয় সংস্করণে (মে, ১৯৪৩) বিনয় রায় যে-মূল্যবান ভূমিকাটি লেখেন তার অংশবিশেষ এক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন :

"জনযুদ্ধের গান-এর দু'হাজার কপি অল্প কিছুদিনের মধ্যে শেষ হয়ে যাবার পর বাঙলাদেশের চারদিক থেকে তাগিদ আসতে থাকে নতুন গানের বইয়ের জন্য। এর মধ্যে অনেক নতুন গান রচিত হয়েছে। সেগুলি যোগ করে আর আগের কিছু গান বাদ দিয়ে তৃতীয় সংস্করণ বের করা গেল।

"দ্বিতীয় সংস্করণের সময় প্রায় সবকটাই ছিল জাপ-বিরোধী গান। হলদরজীর 'কেকরা কেকরা' ছাড়া বাকি সবই ছিল মধ্যবিত্তশ্রেণীর লেখকদের রচনা। সে গানগুলোর সহজ আবেদন, সহজ অথচ জোরালো সুর, হাজার হাজার মানুষকে অনুপ্রাণিত করে। সভায়, মিছিলে, হাটে, গঞ্জে সর্বত্রই লোকের মুখে মুখে এই গানগুলো ফেরে। জাপবিরোধী আন্দোলনের পাশাপাশি এইভাবে জনযুদ্ধের গানের আন্দোলনও বেড়ে উঠতে থাকে। ফলে শ্রমিক, কৃষক ও জনসাধারণের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসেন নতুন নতুন গায়ক ও গান

রচয়িতা। তাঁরা গান লেখা শুরু করেন তাঁদের সুখ-দুঃখ, অভাব-অভিযোগ ও তার প্রতিকারের উপায় নিয়ে। বিভিন্ন জেলায় নিজ নিজ ভাষাতেও গান লেখা শুরু হয় এর ফলে। এই গানগুলোর মধ্য দিয়ে লোকে পায় তাদের হতাশ ও দুর্দশাগ্রস্ত জীবনে আশা ও আলোর সন্ধান। নূতন উৎসাহে তারা এই গানগুলোকে গ্রহণ করে, মনে ফিরে পায় বল—জনযুদ্ধের গান সত্যিকারের জনসঙ্গীতের পথে কয়েক ধাপ এগোয়। তৃতীয় সংস্করণে এই জাতীয় কিছু গান যোগ করা হল।"

একসূত্রে (কাব্যসংকলন):

'ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে-'র প্রথম সম্মেলন উপলক্ষে সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও গোলাম কুদ্দুস সম্পাদিত ফ্যাসিস্ত-বিরোধী কাব্যসংকলন 'এক-সূত্রে' ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়। সংঘের নতুন কার্যালয় ৪৬নং ধর্মতলা স্ট্রীট থেকে সুভাষ মুখোপাধ্যায় এই সংকলন প্রকাশ করেন। 'একসূত্রে'-র দাম ছিল এক টাকা। এইটিই ছিল সংঘের সর্বাধিক মূল্যের প্রকাশন। সংকলন-টির পৃষ্ঠা সংখ্যা মোট ৭২। প্রচ্ছদ সবুজ রঙের। সংকলন ও সংগঠনের নাম দুটি প্রেস টাইপে ছাপা। টাইটেলের প্রথম পৃষ্ঠায় "…একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্র জীবন / এককাজে সঁপিয়াছি সহস্রটি মন…" রবীন্দ্রগীতির এই দুটি বিখ্যাত পংক্তি উদ্ধৃত হয়েছে।

সংকলনটিতে মোট ৫৫ জন প্রবীণ ও নবীন কবির কবিতা সংকলিত হয়েছে। কবিদের নামের বর্ণানুক্রম অনুযায়ী সংকলনে প্রথম কবি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ও শেষ কবি হরপ্রসাদ মিত্র। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য যেসব কবির কবিতা সংকলিত হয়েছিল তাঁরা হলেন: অন্নদাশঙ্কর রায়, অজয় ভট্টাচার্য, অজিত দত্ত, অবন্তী সান্যাল, অশোকবিজয় রাহা, আহসান হাবীব, গোলাম কুদ্দুস, দক্ষিণারঞ্জন বসু, দিনেশ দাশ, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, সরোজ দত্ত, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ মিত্র, অরুণ মিত্র, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী, নীহার দাশগুপ্ত, নবেন্দু রায়, (ছদ্মনামে অনিল কাঞ্জিলাল), সুকান্ত ভট্টাচার্য, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

গোলাম কুদ্দুস লিখিত 'একসূত্রে-'র দ্বিতীয় ভূমিকাটির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হলো:

"বিদেশী আক্রমণ, বোমাবর্ষণ এবং ফ্যাসিস্ট শাসনের ভয় একটা জিনিস স্পষ্ট করেছে, নিষ্ক্রিয় এবং পক্ষপাতশূন্য থাকাই নিরাপদ নয়।…জীবন যখন এতই অনিশ্চিত তখন বাঁচতে হয় তো মানুষের মতো বাঁচা উচিত। মৃত্যু যদি এতই অনিবার্য তাহলে একটা আদর্শের জন্য মৃত্যুবরণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। কে জানে হয়তো সেই মৃত্যুর মধ্যেই জীবন প্রচ্ছন্ন আছে। এমনি

করেই চরম বিপদের দিনে নির্জীব জাতির বাঁকা মেরুদণ্ডটা সোজা হয়ে আসে। সাম্প্রতিক কাব্যে এই সুস্থ জীবনভঙ্গিমায় লক্ষণ সুস্পষ্ট।[৪৪]..."

৬. ফ্যাসিস্ত-বিরোধী সাময়িক পত্র-পত্রিকা :

চল্লিশের দশকের সূচনাকাল থেকে এবং 'সোভিয়েত সুহৃদ্ সমিতি' গঠিত হবার পরেই বাঙলার জেলায় জেলায় বহু পত্র-পত্রিকা ফ্যাসিস্ত-বিরোধী চরিত্র নিয়ে উপস্থিত হয়। এর অনেকগুলিই একদিকে যেমন ছিল সাহিত্যপত্র, তেমনি অপরদিকে সেগুলি ফ্যাসিস্ত-বিরোধী সংবাদ-দর্পণ রূপেও দায়িত্ব পালন করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বাঁকুড়ার 'জাগরণ' বরিশালের 'সপ্তক', কুমিল্লার 'নবযুগ', শ্রীহট্টের 'বলাকা' ও 'সংহতি', হাওড়ার 'অভিবাদন' প্রভৃতি[৪৫] পত্র-পত্রিকা। ফ্যাসিবাদ-বিরোধী অন্যান্য কয়েকটি প্রধান সাময়িক পত্র-পত্রিকার কথাও এই প্রসঙ্গে নীচে তুলে ধরা হচ্ছে।

পরিচয় :

কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'পরিচয়' পত্রিকাটি যদিও বহুপূর্বেই ফ্যাসিবাদ-বিরোধিতায় সামিল হয়েছিল, তাসত্ত্বেও হিরণকুমার সান্যালের সম্পাদনায় ও বিশেষ করে মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীদের পরিচালনাধীনে আসার পর 'পরিচয়'-এর ফ্যাসিস্ত-বিরোধী চরিত্র আরো ইতিবাচক হয়ে ওঠে। সবিশেষ উল্লেখ্য যে, 'পরিচয়ে'র প্রায় প্রতিটি সংখ্যায় ছদ্মনামে প্রকাশিত অধ্যাপক সুশোভন সরকারের রচনাগুলি ছিল ফ্যাসিস্ত-বিরোধিতার তাত্ত্বিক ভিত্তিস্বরূপ। ১৯৪৪ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে 'পরিচয়' পত্রিকার দপ্তর ৪৬ নম্বর ধর্মতলা স্ট্রীটে উঠে আসে এবং প্রায় বছর তিনেক এখান থেকেই পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকা সম্পাদনার ব্যাপারে তখন বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন নীরেন্দ্রনাথ রায়, গোপাল হালদার ও রবীন্দ্র মজুমদার।

চিন্মোহন সেহানবীশ মনে করেন যে, ৪৬ নম্বরে অধিষ্ঠান 'পরিচয়' পরিচালনার ক্ষেত্রে নীতি পরিবর্তনেরও সূচনা করে। 'পরিচয়' আরো বেশি কমিউনিস্ট-ঘেঁষা হয়ে ওঠে। তবে 'পরিচয়-গোষ্ঠী'র 'শুক্রবারের আড্ডার' পুরাতন ঐতিহ্য তখনও সযত্নে লালন করে চলা হতো। শুধু ৪৬ নম্বরেই নয়, 'পরিচয়ে'র আড্ডা সবথেকে বেশি জমতো এর আদিপর্বের চারজন বিশিষ্ট সদস্য সুধীন দত্ত, সুশোভন সরকার, শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ ও গিরিজাপতি ভট্টাচার্যের বাড়িতে। দেশী-বিদেশী সাহিত্যিক, লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের সমাবেশে এই আড্ডা অনেক সময়েই একটা আন্তর্জাতিক চরিত্র পেত। ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনের ইতিহাসে 'পরিচয়ের আড্ডা'র গুরুত্ব অবশ্যই উল্লেখযোগ্য।[৪৬]

'পরিচয়' পত্রিকার মতো 'ঢাকা প্রগতি লেখক সংঘ' কর্তৃক প্রকাশিত (১৯৪০) প্রগতিশীল সাহিত্য-সংকলন 'ক্রান্তি'ও এই সময় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

তবে প্রত্যক্ষ ফ্যাসিবাদ-বিরোধী ও জনযুদ্ধের নীতিতে বিশ্বাসী যে-দুটি সাময়িক পত্র কলকাতা ও ঢাকা থেকে প্রকাশিত হতো সে দুটি হলো যথাক্রমে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার সম্পাদিত 'অরণি' এবং ঢাকা প্রগতি লেখক সংঘের সম্পাদক রণেশ দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'প্রতিরোধ'। এই দুটি সাময়িক পত্রিকা ছিল সেই সময়ে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী সাহিত্য-আন্দোলনের দুই প্রধান স্তম্ভ।

অরণি :

কার্তিক লাহিড়ীর একটি গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ থেকে আমরা 'অরণি' সম্পর্কে বেশ বিস্তারিত তথ্যই জানতে পারি।[৪৭] এছাড়া কিছুটা জানা যায় ধনঞ্জয় দাশ-এর গবেষণা থেকেও।[৪৮]

'অরণি' সাপ্তাহিক পত্রিকারূপে প্রকাশিত হয় ২২শে আগস্ট, ১৯৪১ সালে। প্রখ্যাত সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের কমিউনিস্টধর্মী প্রগতিশীল চিন্তা-ভাবনা 'আনন্দবাজার' কর্তৃপক্ষের পছন্দ না হওয়ার ফলে তিনি আনন্দবাজারের সম্পাদনা পরিত্যাগ করে 'অরণি' প্রকাশ করতে শুরু করেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভেই প্রগতিশীল পত্রিকা 'অগ্রণী' বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর বাঙলার প্রগতিপন্থী প্রকাশনার ক্ষেত্রে যে-শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল তা পূরণ করতে অগ্রসর হয় 'অরণি'। প্রথম থেকেই 'অরণি' একটি কমিটেড পত্রিকা রূপে আত্ম-প্রকাশ করে। এমনকি বহুক্ষেত্রেই এটি কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র-রূপেও কাজ করেছে। 'পরিচয়'-এর সঙ্গে 'অরণি'-র পার্থক্য ছিল এখানেই। 'অরণি'-র তৃতীয় বর্ষ ৪৭ সংখ্যাব (শুক্রবার, ২৮ জুলাই, ১৯৪৪) সম্পাদকীয় থেকেই আমরা এই পত্রিকার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে জানতে পারি :

> "গত চার বৎসর পূর্বে বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া আমরা 'অরণি' প্রকাশ করি। প্রগতিশীল রাজনৈতিক মতবাদের দিক হইতে জাপ-জার্মান ফ্যাশিস্ত বর্বরতার প্রতিবাদ, গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার এবং সমাজতান্ত্রিক উপায়ে অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রতিকার আমাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল। ভীরু দুর্বল মানুষের মন যখন ফ্যাশিস্ত ডিক্টেটরীর দাপটে অভিভূত ও আচ্ছন্ন, সেই সময় সমষ্টি মানবের কল্যাণের দিক হইতে দেশের বুদ্ধিমান যুবক সম্প্রদায়কে চিন্তা করিবার জন্য আমরা আহ্বান করিয়াছি। সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে আমরা প্রগতিশীল ভাবধারা বহন করিয়াছি।..."

প্রকৃতপক্ষেই 'ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' গঠিত হওয়ার পর থেকেই 'অরণি' তার অলিখিত মুখপত্ররূপে কাজ করতে থাকে। সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের সঙ্গে 'অরণি' পত্রিকার সম্পাদনার কাজে প্রথম থেকেই যুক্ত হয়েছিলেন স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, অরুণ মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য, বিনয় ঘোষ, সরোজ দত্ত, অনিল কাঞ্জিলাল প্রমুখ প্রগতি-সংস্কৃতি আন্দোলনের তৎকালীন প্রধান ও অগ্রগণ্য বুদ্ধিজীবীদের একাংশ। চিন্মোহন সেহানবীশ এবং সুধী প্রধানও এঁদের সঙ্গে কোনো না কোনো

ভাবে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। কিছুকাল পরে সাহিত্যিক প্রভাত গো স্বামী, সুশীল জানা এবং নিখিল সেনও এসে যোগ দেন 'অরণি'র আসরে। কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'জনযুদ্ধ' প্রকাশের আগে এই 'অরণি' পত্রিকা একদিকে যেমন ছিল বাঙলায় কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক মতবাদ প্রচারের অঘোষিত মুখপত্র, অন্যদিকে তেমনি 'অরণি'র পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ও পরিবেশিত হতো ফ্যাসিস্ত-বিরোধী সাহিত্যিকদের নানা রচনা। সুকান্ত ভট্টাচার্য-র মতো অনেক তরুণ সাহিত্যিক-প্রতিভাও 'অরণি'-র পৃষ্ঠাতেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন।[৪৯]

সুলেখক ও সাংবাদিক স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য 'অনামী' ছদ্মনামের আড়ালে 'কথা প্রসঙ্গে' নামক একটি নিয়মিত 'ফিচার' লিখতেন 'অরণি' পত্রিকায়। এরই মাধ্যমে তিনি নিপুণভাবে এবং সরসভঙ্গিতে নানা সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গের মার্কসবাদী পর্যালোচনা তুলে ধরতেন পাঠকদের সম্মুখে।

যেসব লেখক 'অরণি' পত্রিকায় ফ্যাসিবাদ-বিরোধী রচনা প্রায় নিয়মিত লিখতেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন: অরুণ মিত্র, আবদুল হালিম, গোপাল হালদার, জ্যোতি বসু, চিন্মোহন সেহানবীশ, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ধরণী গোস্বামী, বিনয় ঘোষ, সুধী প্রধান, মণিকুন্তলা সেন, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রাহুল সাংকৃত্যায়ন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, অনিল কাঞ্জিলাল, সরোজ দত্ত, বিষ্ণু দে, ভূপেশ গুপ্ত প্রমুখ।

তাছাড়া ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলন ও সম্মেলনের রিপোর্ট যেমন 'অরণি'তে প্রকাশিত হতো তেমনি বিদেশী বিখ্যাত লেখকদের বহু অনুবাদও নিয়মিত 'অরণি'র পাতাকে সমৃদ্ধ করেছে।

প্রতিরোধ:

'প্রতিরোধ' পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৯ বঙ্গাব্দে (১৯৪২)। প্রচ্ছদে লেখা ছিল: 'মার্কসবাদী ও ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সাহিত্যের পাক্ষিক পত্র।' দাম এক আনা, বার্ষিক সডাক দেড় টাকা। পত্রিকাটি ছিল ঢাকা জেলা প্রগতি লেখক সংঘের মুখপত্র। প্রথম দু'বছর সম্পাদক হয়েছিলেন রণেশ দাশগুপ্ত ও অজিতকুমার গুহ। 'প্রতিরোধ' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন মুনীর চৌধুরীও। এঁদের প্রচেষ্টায় এবং প্রভাবে তখনকার তরুণ মুসলিম ছাত্রসমাজ ও একদল তরুণ লেখক ঢাকাসহ পূর্ববঙ্গে প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের শরিক হন। কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত সঠিকভাবেই মন্তব্য করেছেন যে, "পূর্ববঙ্গ থেকে প্রকাশিত নানা পত্র-পত্রিকাগুলোর অধিকাংশই এই সময় হয় সাম্প্রদায়িক নয়তো স্থিতাবস্থার সমর্থক মনোভাবের পরিচয় দিতে শুরু করেছিল। এই সময় মাথা ঠিক রেখে প্রগতি লেখক সংঘের সঙ্গে যুক্ত হিন্দু-মুসলিম তরুণ লেখকরাই লেখা ও বক্তৃতার মাধ্যমে প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাধারার প্রসার রোধে এগিয়ে এসেছিলেন।"[৫০]

'প্রতিরোধ' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত সম্পাদকীয় থেকে আমরা এই পত্রিকাটি প্রকাশের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য কিঞ্চিৎ অনুধাবন করতে পারি। উক্ত সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয় :

> "....আমাদের দেশে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যে আবার আজকে ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে যুদ্ধ। ধীরে-সুস্থে লাভ-লোকসানের কথা বিচার করে, কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর দিন আজকে নয়। আজকের পদ্ধতি হল 'ব্লীজক্রিগ' উৎগতি। কাজেই যখন আমরা জানলাম, জাপযুদ্ধ আরম্ভের পরে এক এক করে তিন চারটে মাস কেটে গেল, তবু প্রকাশমান সাহিত্য সাময়িক পত্রগুলির মধ্যে মানবতাকে পরিহার করার চেষ্টা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে; সংস্কৃতিধ্বংসী জাতীয়তাবাদকে রুখবার জন্য না আছে সত্যিকারের সময়কালীন দায়িত্ব পালনের চেষ্টা, না আছে হতভম্ব বুদ্ধিজীবী এবং জনসাধারণের মধ্যে একটা সহজ অনুপ্রেরণা সৃষ্টির পরিকল্পনা, তখন হঠাৎ একটা গুরুতর দায়িত্ব গ্রহণ করা ছাড়া আর আমরা কোনো উপায়ান্তর দেখতে পেলাম না।...নতুন সভ্যতার জন্য অবশ্যম্ভাবী যে সংগ্রাম, আমরা তো চিরদিনই তাকে আহ্বান করে এসেছি।"

'প্রতিরোধ' পত্রিকার কার্যালয় ছিল ঢাকার তখনকার ২১ নং কোর্ট হাউস স্ট্রীটের ঠিকানায়। এটি ছিল অচ্যুত গোস্বামীর বাসা-বাড়ি। অবশ্য ঢাকা প্রগতি লেখক সংঘের অফিস ও 'প্রতিরোধ পাবলিশার্স'-এর ঠিকানা ছিল ১নং জি. ঘোষ লেন, ঢাকা।

'প্রতিরোধ' পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল সোমেন চন্দ-র গল্প 'দাঙ্গা'। এই সংখ্যায় দুটি উল্লেখযোগ্য কবিতা লিখেছিলেন সঞ্জয় ভট্টাচার্য এবং মণীন্দ্র রায়। এছাড়া এই সংখ্যাতেই ছিল শহীদ সোমেন চন্দকে নিবেদিত 'প্রাচীর' কবিতা-সংকলনের উপর আলোচনা। কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত লিখেছেন :

> "গোড়া থেকেই 'প্রতিরোধ' পত্রিকার চেষ্টা ছিল সারা বাংলাদেশের প্রবীণ ও নবীন লেখক সমাজকে দেশের দুর্দিনে তাঁদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তোলা। এই কারণে সম্পাদকরা কলকাতার বিশিষ্ট লেখকদের সঙ্গেও যোগাযোগ রক্ষা করে চলছিলেন। ফলে তখনকার বিশুদ্ধ শিল্পের সমর্থক অনেক লেখকও সমাজমুখী তৎকালীন প্রগতিশীল চিন্তাধারার সমর্থক রচনা সৃষ্টিতে উৎসাহী হয়েছিলেন।"[৫১]

'প্রতিরোধ' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় এই পত্রিকায় ভবিষ্যতে যাঁরা নিয়মিত লিখবেন সেইসব লেখকদের নামের তালিকা ঘোষণা করা হয়েছিল। ঐ তালিকায় ছিলেন : ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, হুমায়ুন কবীর, বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী, সমর সেন, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নির্মল ঘোষ, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অজিত দত্ত, রণেশ দাশগুপ্ত, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, দক্ষিণারঞ্জন বসু, সুধী

প্রধান, বিনয় ঘোষ, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, হিরণকুমার সান্যাল, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, সুবোধ ঘোষ প্রমুখ লেখকবৃন্দ। এঁদের মধ্যে দু-চারজন ছাড়া বাকী সবাই 'প্রতিরোধ'-এর কোনো-না-কোনো সংখ্যায় লিখেছিলেন। সবচেয়ে সমৃদ্ধ হয়েছিল 'প্রতিরোধ' পত্রিকার ১৯৪২ সালের শারদীয় সংখ্যাটি।

১৯৪৩-এ বাঙলায় মন্বন্তর শুরু হলে 'প্রতিরোধ' পত্রিকা অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে পড়েছিল। এই সময়ে যিনি প্রায় এক বছরের জন্য পূর্ণ পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপন মঞ্জুর করে 'প্রতিরোধ'কে টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করেছিলেন, তিনি হলেন ভারতীয় চা-সংস্থার তখনকার ভারপ্রাপ্ত অফিসার প্রভু গুহঠাকুরতা।[৫২]

'প্রতিরোধ'-এর বিশেষ সাফল্য এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ছাত্রসমাজের অনেককেই সৃজনশীল সাহিত্য-রচনায় এই পত্রিকাটি যথেষ্ট পরিমাণে উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিল। ঢাকা শহরে সেই সময়ে বিরাজিত সাম্প্রদায়িক পরিবেশেও কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন গুণী মুসলিম ছাত্র 'প্রগতি লেখক সংঘ' ও 'প্রতিরোধ' পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে সানাউল হক্, মুনীর চৌধুরী, মহম্মদ সফিউল্লা, ফজলুল করিম, কবীর চৌধুরী, সৈয়দ নুরুদ্দীন প্রমুখদের নাম সত্যিই উল্লেখযোগ্য।

১৯৪৩-এর মে মাসে 'প্রতিরোধ'কে মাসিক পত্রিকায় রূপান্তরিত করা হবে বলে বিজ্ঞাপিত হয়েছিল। আষাঢ় মাস থেকেই 'প্রতিরোধ' মাসিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়। শেষের দিকে 'প্রতিরোধ' অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৪২ থেকে ১৯৪৪—মোটামুটি এই দুই বছর 'প্রতিরোধ' প্রকাশিত হয়েছিল।

'জনযুদ্ধ' পত্রিকা ঃ

কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র রূপে প্রকাশিত হলেও ফ্যাসিস্ত-বিরোধী সংগ্রামে 'জনযুদ্ধ'-র ভূমিকাকে কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। ১লা এপ্রিল, ১৯৪২-এ পাক্ষিক রূপে আত্মপ্রকাশ করলেও মাত্র দুটি সংখ্যা পরে, অর্থাৎ ১লা মে থেকেই 'জনযুদ্ধ' সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্রিকা রূপে প্রকাশিত হতে থাকে। ২৪৯ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট থেকে প্রকাশিত ও বঙ্কিম মুখার্জী (এম. এল. এ.) কর্তৃক সম্পাদিত (যদিও জানা যায় যে, প্রকৃত সম্পাদনার দায়িত্ব ছিল সোমনাথ লাহিড়ীর হাতে, কিন্তু আইনগত সুবিধার জন্য বঙ্কিম মুখার্জীর নাম ছাপা হতো), 'জনযুদ্ধ' মে থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত 'জনসাধারণের রাজনৈতিক সাপ্তাহিক' রূপে প্রকাশিত হয়েছে এবং তারপরই 'কমিউনিস্ট পার্টির বাংলা কমিটির সাপ্তাহিক পত্র'রূপে প্রকাশিত হতে থাকে (প্রথম বর্ষ, অষ্টাদশ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ থেকে)।

'জনযুদ্ধ' প্রথম থেকেই ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আক্রমণেই শুধু সামিল হয় না, ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনকে বাঙলাদেশে সংগঠিত করার ক্ষেত্রেও এক প্রধান দায়িত্ব পালন করতে থাকে। 'জনযুদ্ধ'-র প্রথম সংখ্যায় 'স্বাধীনতার যুদ্ধে অগ্রসর হও' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে লেখা হয়ঃ

'জাপানী দস্যুদের রুখিবার জন্য সকল বাঙালী একত্র হও, স্বাধীনতার শেষ যুদ্ধের জন্য রণসাজে সাজো।"

'জনযুদ্ধ' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় অন্যান্য যেসব রচনা ছিল তা হলো : 'ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে' (হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়); 'চীনের সংগ্রাম ভারতের আদর্শ' (বিনয় ঘোষ); 'বন্দীদের মুক্তি চাই' (সুধী প্রধান); 'মুনাফা না দেশরক্ষা' (গোপাল হালদার); 'সোভিয়েতের যুদ্ধ আমাদের যুদ্ধ' (সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার)।

১লা মে, ১৯৪২, শুক্রবার থেকে 'জনযুদ্ধ' সাপ্তাহিক পত্রে পরিণত হয়। এই সংখ্যাটি ছিল মে-দিবস সংখ্যা। এই সংখ্যায় যেসব রচনা প্রকাশিত হয় তা হলো : 'সোভিয়েট দেশে যুদ্ধ ব্যবস্থা', (সিরাজুল ইসলাম); 'জাপানী দস্যুর বিরুদ্ধে পোড়ামাটির কৌশল' (গোপাল হালদার); 'বন্দীমুক্তি' (সুধী প্রধান); 'এ-আর-পি / বাংলাকে রেঙ্গুন হইতে দিব না' (জ্যোতি বসু), 'একতা আগে হাতিয়ার পরে' (বিনয় ঘোষ) ইত্যাদি।

বস্তুত, বাঙলা সাংবাদিকতার ইতিহাসে 'জনযুদ্ধ' নানা কারণে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। সংবাদপত্রে নিয়মিত 'রিপোর্টাজ' রচনার রেওয়াজ এই 'জনযুদ্ধ'ই চালু করে। একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্রকে কেন্দ্র করে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলন এত ব্যাপকভাবে অন্য কোনো দেশে সংগঠিত হয়েছে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় সোমনাথ লাহিড়ীর নেতৃত্বে অপরিসীম দক্ষতার সঙ্গে 'জনযুদ্ধ' যে-ভূমিকা পালন করে তা পৃথিবীর যে-কোনো ভাষার সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে গর্বের বস্তু। ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনে চল্লিশের দশকে বাঙলার শিল্পী-সাহিত্যিকেরা যে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করেন, কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'জনযুদ্ধ' পত্রিকাই তাকে জননীর স্নেহে এবং মমতায় লালন করে। সর্বোপরি জাতীয় মুক্তিআন্দোলনেও 'জনযুদ্ধ'-র গৌরবোজ্জল ভূমিকা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। 'জনযুদ্ধ'-র প্রায় প্রতিটি সংখ্যায় জাতীয় নেতাদের মুক্তি এবং জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার দাবী বারংবার ধ্বনিত হয়েছে। সমাজমানসকে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে দীক্ষিত করার ক্ষেত্রে, ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীর পক্ষে এবং সাম্প্রদায়িকতার মতো অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে 'জনযুদ্ধ' নিরন্তর নিরবচ্ছিন্নভাবে তার দায়িত্ব পালন করেছে।

সৃজনশীল সাহিত্য :

ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনে বাঙলার সাময়িক পত্র-পত্রিকা এবং সংবাদপত্রের পাশাপাশি সৃজনশীল সাহিত্যিকদের রচিত নাটক-গল্প-উপন্যাসও কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রচারকের ভূমিকা পালন করেছে। বিশেষত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং পঞ্চাশের মন্বন্তরের পটভূমিকায় রচিত কথা-সাহিত্যে পরোক্ষভাবে হলেও ফ্যাসিবাদ-বিরোধিতার একটা ঝোঁক সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। ছোট গল্পের ক্ষেত্রে সোমেন চন্দ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্র ঘোষ, সুশীল জানা, ননী ভৌমিক,

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, অচ্যুত গোস্বামী, সোমনাথ লাহিড়ী প্রমুখ, নাটকের ক্ষেত্রে বিজন ভট্টাচার্য ('নবান্ন' ও 'জবানবন্দী'), দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসী লাহিড়ী প্রমুখ এবং উপন্যাসের ক্ষেত্রে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (মন্বন্তর), গোপাল হালদার ('ঊনপঞ্চাশী', 'পঞ্চাশের পথ', 'তেরশ পঞ্চাশ'), নবেন্দু ঘোষ (ডাক দিয়ে যাই) প্রমুখ লেখকদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে কবিতাই ছিল নিঃসন্দেহে ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সাহিত্য আন্দোলনের সব থেকে জনপ্রিয় মাধ্যম।

ষষ্ঠ অধ্যায়

জনযুদ্ধ-পর্যায় : ফ্যাসিস্ত-বিরোধী সাংস্কৃতিক আন্দোলন

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল 'ইয়ুথ কালচারাল ইনস্টিট্যুট (Y.C.I)'-এর সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে। কিন্তু ব্যাপকতা ও প্রসারের দিক থেকে এই আন্দোলন ছিল খুবই সীমাবদ্ধ এবং মূলত কলকাতাকেন্দ্রিক। বাঙলার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে 'ওয়াই. সি. আই'-এর সাংস্কৃতিক আন্দোলন তাই কিছুটা তরঙ্গ তুললেও, যুগান্তর সৃষ্টিকারী কোনো পরিবর্তন তার দ্বারা ঘটেনি। প্রকৃতপক্ষে, বাঙলা তথা ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নতুন যুগের সৃষ্টি হয় গণনাট্য সংঘের সংগঠিত সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাধ্যমেই। ১৯৪৩ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত বাঙলায় 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ' 'ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে-'র শাখা রূপেই মূলত ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সাংস্কৃতিক আন্দোলন পরিচালনা করেছিল। ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে তাই দুটি পর্যায়ে ভাগ করা যায় : ১) গণনাট্য সংঘের পূর্ববর্তী পর্যায়, ২) গণনাট্য সংঘের পর্যায়। জনযুদ্ধের যুগে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পর্যালোচনায় আমরা তাই গণনাট্য সংঘের পর্যায়টিকেই প্রধান আলোচ্য রূপে গ্রহণ করা কর্তব্য বলে মনে করছি।

১. ভারতীয় গণনাট্য সংঘ গঠন (১৯৪৩) :

গণনাট্য সংঘের জন্ম হয়েছিল ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনের এক উত্তাল পর্বে, আর তা দানা বেঁধেছিল নানাবিধ সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে—দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলে। গণনাট্য সংঘের মুখপত্র 'লোকনাট্য'-র এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে (প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা) এ-প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল :

> "...ইউরোপ জুড়ে ফ্যাসিস্ট-দস্যু হিটলারের তাণ্ডবলীলা চলেছে। এশিয়ায় তার সাকরেদ তোজোর দল স্ত্রী-পুরুষ, শিশু-নির্বিশেষে লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের রক্তে স্নান করে, একটার পর একটা দেশ গ্রাস করে বাংলার দুয়ারে উপস্থিত। আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত ও উচ্চশ্রেণীর মধ্যে তখন দারুণ বিভ্রান্তি।......সেই দারুণ বিভ্রান্তির মাঝে পথ দেখালো এক অভিনব বলিষ্ঠ সাংস্কৃতিক অভিযান। মাঠের চাষী, কলের মজুর আর বিপ্লবী ছাত্রের কণ্ঠে গর্জে উঠলো ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও সংগ্রামের গান। সে গানের সুর ও কথা লক্ষ লক্ষ নিচের তলার মানুষের একান্ত আপনার। তাই লক্ষ কণ্ঠে সে গান ছড়িয়ে গেল কারখানা থেকে বস্তিতে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে,

হাটে-মাঠে-বাজারে, স্কুল-কলেজে। গানের পাশে এসে জমলো যাত্রা, পাঁচালী, নাটক, লোকনৃত্য আরো কত বিচিত্র সাস্কৃতিক রূপ। শ্রমিক, কৃষক, কবি ও শিল্পী রূপ দিলেন তাঁদের দৈনন্দিন জীবনকে, তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সংগ্রামকে। বিভ্রান্ত দেশকে তাঁরাই দেখালেন পথ, তাঁরাই দিলেন নতুন সংস্কৃতি, যাঁরা যুগ যুগ ধরে পদানত, যাঁদের শিল্পজ্ঞান সম্বন্ধে অবজ্ঞা-মিশ্রিত করুণা ও অবিশ্বাসই তথাকথিত সার্থক শিল্পী ও সাহিত্যিক মহল পোষণ করে থাকেন। সংস্কৃতিকে নিপীড়িত মানুষের জীবন-সংগ্রাম ও মানব-মুক্তিসংগ্রামের অন্যতম বিপ্লবী হাতিয়ারে রূপান্তরিত করে জন্ম নিল 'গণনাট্য সংঘ'।"[১]

'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ'-র অন্তরালবর্তী সংগঠক ও প্রাণপুরুষ নিঃসন্দেহে ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক পূরণচাঁদ যোশী। শিল্প-সংস্কৃতিকে গণআন্দোলনের হাতিয়ার রূপে সার্থকভাবে ব্যবহার করার কাজ তিনিই বোধহয় ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম শুরু করেন। কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেসের প্রায় পাশা-পাশি প্রধানত যোশীরই উদ্যোগে বোম্বে-তে (২৫মে, ১৯৪৩) 'অল ইণ্ডিয়া পিপলস্ থিয়েটার এ্যাসোসিয়েশন'-এর যে সম্মেলন হয় তার সর্বভারতীয় কমিটিতে বাঙলা থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন ৯ জন প্রতিনিধি। এঁরা হলেন—বিনয় রায় (সর্ব-ভারতীয় যুগ্ম-সম্পাদক), সুনীল চ্যাটার্জি, স্নেহাংশু আচার্য, বিষ্ণু দে, শম্ভু মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, সুজাতা মুখার্জি ও দিলীপ রায়।[২]

১৯৪৩ সালের জুলাই মাসে আই. পি. টি. এ-র সর্বভারতীয় সম্পাদক অনিল ডি-সিলভা 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘে'র যে-বাঙলা কমিটি অনুমোদন করেন তার নেতৃত্বে ছিলেন: সুধী প্রধান (সর্বক্ষণের সংগঠক), শম্ভু মিত্র (প্রযোজনা সম্পাদক), হেমন্ত মুখোপাধ্যায় (সঙ্গীত সম্পাদক), চিন্মোহন সেহানবীশ (কোষাধ্যক্ষ), চিত্তপ্রসাদ ও মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য।[৩]

এই সময়ই স্থির করা হয় যে, 'ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' এবং 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ'—নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের বাঙলা শাখা-রূপেই অতঃপর কাজ করে যাবে।[৪]

All India People's Theatre Conference-এর ২৫শে মে-র (১৯৪৩) উক্ত অধিবেশনে (নট ও নাট্যপরিচালক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য-র অনুপস্থিতিতে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক হীরেন মুখার্জি) যে 'খসড়া প্রস্তাব' স্নেহাংশু আচার্য কর্তৃক উত্থাপিত এবং সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় তার অংশ বিশেষ উল্লেখ করা প্রয়োজন। নিম্ন-উদ্ধৃত অংশ থেকে 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘে'র উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও কর্মসূচী সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যাবে:

"All India People's Theatre Conference Draft Resolution

"This Conference held under the auspices of the Indian People's Theatre Association recognises the urgency of

organising a people's theatre movement throughout the whole India as the means of revitalizing the stage and the traditional art and making them at once the expression and organiser of our people's struggle for freedom, cultural progress and economic justice.

"The immediate problems facing the people are external aggression by the Fascist hordes who are the deadliest enemies of freedom and culture, internal repression by an alien Government which seeks to hold our people in subjection and prevent them from organizing an effective defence of their own home land ; rapid disintegration of the entire economic life of our people and particularly the havoc wrought on the morale and the health of our people by the shortage of food and other essential articles ; and lastly the absence of sufficient unity among the people's forces which alone can compel the imperialists to retire, stop the economic disintegration of the country and defeat the Fascist aggressors.

"It is therefore, the task of the Indian People's Theatre Movement at present to portray vividly and memorably through the medium of the stage and other traditional arts the human details of these important facts of our people's rights and enlighten them about their rights and the nature and solution of the problems facing them...

"For the achievement of these aims it is necessary that not only the themes of our songs, ballads, plays etc. be suited to the purpose in view, but it is also essential that our productions should be simple and direct so that the masses can easily appreciate and understand and also participate in the creation and production of these. A revival of the folk arts, mass singing and open air stage are specially desirable for this purpose.

"In this connection we are greatly encouraged to find that under the stress of the present situation there has been developing spontaneously from among the masses, particularly the militant kisans, workers and students, a movement of songs, recitations and dances rousing the people to action

against the Fascist aggressors and the food hoarders and for the release of national leaders and the achievement of a national Government. It is essential that this spontaneous movement should be organised and co-ordinated into an all-India People's Theatre Movement."[৫]

১৯৪৩ সালে 'গণনাট্য সংঘ' যখন তার কাজ শুরু করে তখন বাঙলাদেশে দুই ধরনের সঙ্কট বিদ্যমান। প্রথমটি রাজনৈতিক। অর্থাৎ, ১৯৪২-এর 'আগস্ট আন্দোলনে'র রেশ তখনও কাটে নি। গ্রামে-গঞ্জে বিচ্ছিন্নভাবে জাতীয়তাবাদী জনতার এক বিরাট অংশ সে-সময় ব্রিটিশ সরকারের প্রশাসনকে কার্যত চ্যালেঞ্জ জানিয়ে প্রায়-সশস্ত্র আন্দোলন শুরু করে দিয়েছে। জাপান থেকে পরিচালিত সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজের অগ্রগতিও জনমানসে তীব্র আলোড়ন তুলেছে। এর বিপরীত স্রোতে দাঁড়িয়ে সেই সময় কমিউনিস্ট পার্টি ও ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনের সংগঠকেরা প্রতিদিনই সম্মুখীন হচ্ছিলেন জাতীয়তাবাদী শক্তির প্রচণ্ড বিরোধিতার, এমনকি শারীরিক নির্যাতনেরও শিকার হচ্ছিলেন তাঁরা।

দ্বিতীয় সংকটটি ছিল অর্থনৈতিক। অর্থাৎ, ১৯৪৩-এর বাঙলায় মনুষ্যসৃষ্ট দুর্ভিক্ষ, যা 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' নামেই পরিচিত, তার মোকাবিলায় সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল ফ্যাসিস্ত বিরোধী প্রায় সকল কর্মী এবং বাঙলার কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যেরা। মন্বন্তরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও ফ্যাসিস্ত-বিরোধিতা তখন সমার্থক হয়ে উঠেছিল। একদিকে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলন এবং অপর দিকে মন্বন্তর ও মহামারীর বিরুদ্ধে জনসাধারণকে সর্বতোভাবে সাহায্য ও সেবা করার যে ইতিহাস গড়ে তুলেছিল তৎকালীন গণসংগঠনগুলির (কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালনায়) কর্মীরা, তা আজও স্মরণীয় হয়ে আছে। বস্তুত, মন্বন্তরের বিরুদ্ধে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের তুলনায় কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা ছিল সেই সময় অনেক বেশি উজ্জ্বল। এর ফলেই তৎকালীন মূল জাতীয় স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েও কমিউনিস্টরা আপামর জনসাধারণের অন্তরে এক শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল।

'গণনাট্য সংঘে'-র ভূমিকা এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সীমিত আর্থিক ও অন্যান্য ক্ষমতার মধ্যেই একদল প্রগতিশীল ও প্রতিভাধর শিল্পী 'গণনাট্য সংঘে'র মঞ্চ থেকে একই সঙ্গে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী ও দুর্ভিক্ষ-বিরোধী ভূমিকা পালন করে চলেছিলেন। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন লড়াই ছিল 'গণনাট্য সংঘে-'র মূল ভিত্তি। এ-প্রসঙ্গে চিন্মোহন সেহানবীশ লিখেছেন :

"...কিন্তু মন্বন্তরের বিরুদ্ধে ৪৬নং-এর প্রাণপাত সংগ্রামের যে দিকটি সেদিন দেশের লোকের মন সব থেকে বেশী টানে সেটি হচ্ছে 'গণনাট্য সংঘ'-র কাজ। গণনাট্যের উন্মেষ ও জন্মের কাহিনী আগেই বলেছি। কিন্তু তার সত্যকার স্ফুরণ হয় এই পর্বে, মন্বন্তরের সঙ্গে যুঝতে গিয়ে। ধ্বংসকারিতার দিক থেকে বিপুল প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সঙ্গেই যার তুলনা, তার সঙ্গে নাচগান-

অভিনয়ের লড়াই হয়তো মেশিনগানের সামনে যুঁই ফুলের গান গাইবার প্রস্তাবের মতো মনে হতে পারে। কিন্তু দেশের নেতারা যখন কারান্তরালে, হতাশার পাঁকে পড়ে দেশবাসীর অবসাদ যখন চরমে পৌঁছেছে তখন সামাজিক বিবেককে জাগ্রত করে, মানুষকে যথাসাধ্য কাজে নামানোর চেষ্টার মূল্য ছিল অপরিসীম। 'গণনাট্য সংঘ' সেই দেশপ্রেমিক কাজেই কোমর বেঁধে-ছিলেন নির্ভীকভাবে। তাঁদের কাজের ফলে দেশের মানুষের কল্যাণ হবে—এই সহজ অথচ প্রবল অনুভূতি সেদিন অনুপ্রাণিত করেছিল তার প্রত্যেকটি কর্মীকেই। তাই তাঁরা অজস্র গান বেঁধেছেন, পালা লিখেছেন, আর তাই নিয়ে জল-কাদা ভেঙে যৎসামান্য সাজসরঞ্জাম ঘাড়ে করে দেশের লোককে গান শুনিয়েছেন, নাচ ও অভিনয় দেখিয়েছেন মাঠে-মাঠে, পথে-ঘাটে, হাটে-বাজারে—শুধু বাংলাদেশে নয় সুদূর পাঞ্জাব থেকেও ঐ গণনাট্যর দল সেদিন তুলে আনে লক্ষ টাকা। সে গান বা নাটক প্রত্যেকটিই খুব উঁচুদরের হয়নি নিশ্চয়ই, তবু তাদের বক্তব্য ছিল সহজ অথচ প্রত্যক্ষ ও বলিষ্ঠ। তাই সে আবেদন স্পর্শ করেছে মানুষের মনকে, গণনাট্য সংঘকে ও তার কর্মীদের তাঁরা স্থান দিয়েছেন অন্তরে। আর ছোট বড় শিল্পীরাও মানবতা ও গণসংস্কৃতির এই আবেদনে সাড়া না দিয়ে পারেননি—তাঁরাও সেদিন গণনাট্য সংঘ-র দিকে ঝুঁকেছেন দলে দলে।"[৬]

সুতরাং সুস্পষ্টভাবেই বলা চলে যে, ফ্যাসিস্ত-বিরোধী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে সেদিন 'গণনাট্য সংঘে-'র সাংস্কৃতিক কর্মসূচী কার্যত সম্পূর্ণভাবে একত্রিত হয়ে গিয়েছিল। আর, একথা বলাই বাহুল্য যে, ৪৬নং ধর্মতলা স্ট্রীটের বাড়িটিই হয়ে উঠেছিল সেই সময় এই সাংস্কৃতিক আন্দোলন পরিচালনার প্রধান কেন্দ্র ও কর্মমুখর জমজমাট এক দপ্তর।

২. ফ্যাসিস্ত-বিরোধী গানের ধারা : গণনাট্যের যুগ

'জনযুদ্ধের গান' সংকলনে সংকলিত গানগুলিই ছিল বাঙলায় ফ্যাসিস্ত-বিরোধী গানের আন্দোলনের প্রধান অবলম্বন। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গানের অংশবিশেষ নীচে উদ্ধৃত হলো :

১) "স্বাধীনতা সংগ্রাম নয় আর একলার
দেশে দেশে জনগণ ধরে আজ হাতিয়ার
কমরেড, ধরো আজ হাতিয়ার।
বিপ্লবী সোভিয়েট, বীর চীন
সাথী আজ ইংরাজ, মার্কিন
করো পণ, আছে প্রাণ যতদিন—
ভারতকে, বিশ্বকে বাঁচাবার গুরুভার
নিতে আছি প্রস্তুত, মরতেও তৈয়ার।"...

[সুভাষ মুখোপাধ্যায়]

২) বজ্রকণ্ঠে তোলো আওয়াজ
রুখবো দস্যুদলকে আজ
দেবে না জাপানী উড়োজাহাজ
ভারতে ছুঁড়ে স্বরাজ।”…

[সুভাষ মুখোপাধ্যায়]

৩) “হোই হোই হোই
জাপান ঐ
আস্যে বুঝি
হামার টারীত্
ব্যারাও গাঁওয়ের
গেরিল্লা জুয়ান।”…

[বিনয় রায়]

৪) “জাপানকে ভয় করবো না গো
ঘরের কাছে শত্রু এলো
ও দেশবাসী এবার জাগো।”…

[রামপ্রসাদী]

৫) “রইবো না আর ঘরের কোণে ওরে ও চাষী ভাই,
আয়রে ছুটে আজ লড়ায়ে যাই।
জাপানীরা বিষম ডাকাত, তুলনা তার কোথাও নাই,”…

[ভাটিয়ালি]

৬) “·· এক হয়ে আজ দাঁড়াও দেখি মজুর কিষাণ—
এক নিমেষে আসবে স্বরাজ পালাবে জাপান রে
কাস্তেটারে দিও জোরে শান।”

[হেমাঙ্গ বিশ্বাস]

৭) “…দস্যু রুখবার তরে
দস্যু রুখবার তরে, ঘরে ঘরে কৃষক সন্তান
ঐক্যবদ্ধ হইতেছিল রুখিতে জাপান।”…

[জনযুদ্ধের ডাক, নিবারণ পণ্ডিত]

৮) “কেক্‌রা কেক্‌রা নাম বতাঁউ
ইস্ জগ্‌মে বড়া লুটেরবা হো॥…
মালিক ঔর মহাজন লুটে—ঔর লুটে ঘুষখোরবা হো।
মিলওয়ালা লুটে জমিদার লুটে—মর গিয়া কিষাণ মজদুরবা হো॥…
জাপান লুটে, চীননে রোকা
রোকে হিন্দ্‌কে জনতা হো॥”

[সুর : ভোজপুরী, রচয়িতা : হলধরজী]

৯) "অব্ কোমর বান্ধ্ তৈয়ার হো
লাখ্ কোটি ভাইয়োঁ।
হাম ভুখ্‌সে মরনেবালে, কেয়া মত্ সে ডরনেবালে
আজাদীকা ডঙ্কা বাজাও
উঠাও অগ্নিধ্বজা।"...

[বিখ্যাত ফরাসী 'লা মার্সাই' গানটির সুরে
হিন্দী ভাষান্তর : হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়]

উপরোক্ত গানগুলির প্রত্যেকটিই সেই সময় দারুণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে, গানগুলির সুর ও ভাষা অনেক বেশি পরিমাণে লৌকিক ও জনবোধ্য। ওয়াই. সি. আই.-এর সময়কার গানের সঙ্গে গণনাট্য আন্দোলনকালীন এই সকল গানের একটা সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান ছিল। বাঙলার লোকসঙ্গীতের ধারাতেই সুরারোপিত হয়েছিল অধিকাংশ গান। এ-প্রসঙ্গে "জনযুদ্ধের গান'-এর তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় বিনয় রায় লিখেছিলেন :

"...বাঙলার সংস্কৃতিক্ষেত্রে প্রগতি আনবার চেষ্টা চলছিল গত একযুগ ধরে। কিন্তু সেই আন্দোলনের সঙ্গে গণজীবনের প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না; ফলে প্রচেষ্টা ক্রমে স্তিমিত হয়ে আসে। আজকের গানের আন্দোলন সংস্কৃতিকে সেই ব্যর্থতা থেকে মুক্ত করে জনসাধারণের সঙ্গে সংযুক্ত করার দায়িত্ব নিয়েছে এবং অনেকাংশে সমর্থ হয়েছে।

"মানতেই হবে ভাষা ও সুরের ক্ষেত্রে এ গানগুলোর অধিকাংশই ওস্তাদের আসরে স্থান পাবে না; কিন্তু সংস্কৃতিতে প্রগতি অর্থে যদি জনসাধারণের সাংস্কৃতিক জ্ঞান ও ধারণা বৃদ্ধি বোঝায় তবে জনযুদ্ধের গান নিঃসন্দেহে সে কাজে অনেক সাহায্য করেছে ও করছে।...

"কিন্তু এ শুধু 'স্বদেশী' আমলের স্বাদেশিকতার পুনরুজ্জীবন নয়। বলিষ্ঠ দেশ-প্রেমের সঙ্গে এই গানের মধ্যে এসে মিলেছে ফ্যাসিজমকে রুখবার দুর্জয় সংকল্প, ব্যাপক আন্তর্জাতিক দৃষ্টি আর মজুর-কিষাণের জীবন ও সংগ্রামের কথা।...তাই এই গানের সহজ ও ধারালো কথার মধ্যে দিয়ে প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে ভাবী সংস্কৃতির ইঙ্গিত।"

বিনয় রায়ের এই বক্তব্য ফ্যাসিস্ত-বিরোধী গানের ধারায় মর্মবস্তু অনুধাবনের পক্ষে সহায়ক। 'গণনাট্য সংঘ' পরিবেশিত সঙ্গীতের প্রধান বৈশিষ্ট্যই ছিল :

১) সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদ-বিরোধিতা এবং একই সঙ্গে দেশীয় জোতদার, জমিদার ও একচেটিয়া পুঁজিপতির বিরোধিতা।
২) সংঘবদ্ধ, সংগঠিত ও উদ্দেশ্যমূলক সঙ্গীত।
৩) বাঙলার বিভিন্ন লোকগোষ্ঠীর, বিচিত্র ভূখণ্ডে ছড়ানো ও বিবিধ সাঙ্গীতিক আঙ্গিকে সক্রিয় এবং কৃষকশ্রেণীর গভীরে প্রোথিত দেশীয় চেতনার প্রতিবাদী শিল্পরূপ।

বস্তুত, পরবর্তীকালে গণনাট্য সংঘের নামের সঙ্গে সংযুক্ত সুর-বাণী ও গায়ন-রীতি সমন্বিত যে সম্মেলক সঙ্গীতের ধারা বাঙলার সংস্কৃতির এক নিজস্ব সম্পদে পরিণত হয়েছে, তার সূচনাপর্বের পরিপ্রেক্ষিতে বিনয় রায়ের বক্তব্য ছিল খুবই সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট।

৩. বিনয় রায়ের নেতৃত্ব ও ফ্যাসিস্ত-বিরোধী গায়কগোষ্ঠী:

জনযুদ্ধের গান ও অন্যান্য ফ্যাসিস্ত-বিরোধী গানের প্রধান সঙ্গীত-পরিচালক ছিলেন বিনয় রায়। প্রধানত তাঁরই উদ্যোগে ও প্রচেষ্টাতেই জনযুদ্ধের যুগে এক নতুন সঙ্গীত-আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। এ-প্রসঙ্গে দেবেশ রায়ের লেখা একটি নিবন্ধ থেকে এই আন্দোলন ও বিনয় রায়ের ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানা যায়। দেবেশ রায় লিখেছেন:

"...গানের ক্ষেত্রে এই নেতৃত্ব দেন বিনয় রায়। তিনি প্রচলিত অর্থে গায়ক ছিলেন না, কিন্তু গান গাইবার একটা স্বাভাবিক শক্তি তাঁর ছিল, আর ছিল অসামান্য কণ্ঠসম্পদ। চল্লিশের দশকের গোড়ায় তিনি ট্রেড ইউনিয়ন করতেন। শ্রমিক সভায় গানও গাইতেন। নতুন সংস্কৃতি আন্দোলনে বিনয় রায়ের ডাক পড়ল। তাঁকে নিয়ে তখনকার দিনের ট্রেড ইউনিয়ন এবং লেখক ও শিল্পী সংঘের ভেতর বেশ কিছুদিন টানাটানি হয়। শেষে পাকাপাকি তিনি সংঘে যোগ দেন।

"এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে প্রধানত বিনয় রায়ের নেতৃত্বগুণেই সংঘের গানের দল স্বাতন্ত্র্য পেয়ে বেড়ে উঠতে থাকে, সংঘের ভেতরই এই গানের দল ও নাটকের দলের স্বাধীন বিকাশ ঘটতে থাকে।

"বিনয় রায়ের টানে আর ফ্যাসিস্তবিরোধী আন্দোলনের জোয়ারে বাদল খাঁ-ভীষ্মদেবের ঘরানা এবং ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণীর সঙ্গীতাসর থেকে সংঘে এসে পৌঁছে যান জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র—বিশ্ববিদ্যালয়ের ভালো ছাত্র, কবি। আর সংঘে এসে তিনি হয়ে উঠলেন প্রধান গীতিকার, প্রধান সুরকার, প্রধান গায়ক। 'নবজীবনের গান' রচনার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল।

"এলেন শিল্পী দেবব্রত বিশ্বাস। শুধুমাত্র নতুন নতুন গণসঙ্গীতই নয়, রবীন্দ্র-সঙ্গীতেরও নতুন গায়ন আবিষ্কার করলেন এই শিল্পীরা। বহুসংখ্যক গায়কের উদাত্ত কোরাসে কোরাসে কোথায় উবে গেল শান্তিনিকেতন আর ব্রাহ্ম-সমাজের অচলায়তনের নীরক্ত রবীন্দ্রনাথ, মিছিলে-মিটিঙে-গঞ্জে-ময়দানে জন্ম নিল লড়াইয়ের, বিদ্রোহের, ভাঙনের রবীন্দ্রনাথ। আর রবীন্দ্রনাথের গান নতুন গীতিকারদের গানের সঙ্গে ও বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষকদের গানের সঙ্গে মিশে এক নতুন আয়তন পেয়ে গেল।

"সিলেট থেকে গান আর সুরের ঝাঁপি নিয়ে এলেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস, বাঙলার গণসঙ্গীত আন্দোলনের ইতিহাসে যাঁর অবদানও অবিস্মরণীয়। শচীন দেব-বর্মন, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, পঙ্কজকুমার মল্লিক, সন্তোষ সেনগুপ্ত প্রমুখ প্রতিষ্ঠিত

প্রবীণ এসে সংঘের কেন্দ্র ৪৬ নং ধর্মতলার সতরঞ্চিতে বিনয় রায়, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, দেবব্রত বিশ্বাস, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সুজাতা ও সুপ্রিয়া মুখোপাধ্যায়, প্রীতি সরকার, সাধনা রায়চৌধুরী, ভূপতি ও সুরপতি নন্দী, দিলীপ রায় প্রমুখের পাশে বসলেন। আর শ্রদ্ধানন্দ পার্ক ও মহম্মদ আলি পার্কে এসে পৌছলেন নানা আঞ্চলিক স্কোয়াড এবং টগর অধিকারী, রমেশ শীল ও শেখ গোমানি প্রমুখ।

"বাঙলা গানের ঐতিহ্য, নতুন রচিত গান ও গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত লোক-সঙ্গীত —বাংলাদেশের আন্দোলনের গানের এই তিনটি হচ্ছে প্রধান উপাদান। এই গান গাইবার ও শোনার আসরেও এক গুণগত পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। গান কোনো স্বতন্ত্র অবসরের বিষয় নয়—গান রোজকার জীবনের অঙ্গ। গান কোনো অবসরভোগী শ্রেণীর উপভোগের বিষয় নয়—যারা খাটে, গড়ে, বানায় তাদের শ্রমের স্ফূর্তি, তাদের লড়াইয়ের আবেগ ও হাতিয়ার।"[৭]

বিনয় রায়ের নেতৃত্বে গণনাট্যের সঙ্গীত-গোষ্ঠী জনযুদ্ধের যুগে এইভাবেই গানকে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনের হাতিয়ারে পরিণত করতে পেরেছিলেন। এ-প্রসঙ্গে প্রবীণ কমিউনিস্ট নেত্রী কনক মুখোপাধ্যায় লিখেছেন:

"চল্লিশের দশকে লোকসংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে কমরেড বিনয় রায়ের অবদান অবিস্মরণীয়। তাঁর সহজ সুরে গাওয়া অতি সাধারণ কথার গানগুলিও খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠত। আর পার্টি ও গণ-সংগঠনের নেতা ও কর্মীদের নাচগানের আসরে তিনি বেশ নামাতেও পারতেন। এই সময় নানা আন্দোলন উপলক্ষে আমি বেশ কয়েকটা ছড়া গান লিখে তাঁকে দিয়েছিলাম ('দেশরক্ষার ডাক' নামে ১৯৪৩ সালে ন্যাশনাল বুক এজেন্সী তা প্রকাশ করে। দাম: দশ পয়সা। ভূমিকা লিখেছিলেন কমিউনিস্ট নেতা ভবানী সেন ও বিনয় রায়।—লেখক)।

"একবার মনে পড়ে করপোরেশনের ধাঙড়দের (বোধহয় ধর্মঘট উপলক্ষে) কলকাতা টাউন হলে একটা মিটিং হয়। সেই মিটিং-এর জন্যও গান বেঁধে দিতে হল। বিনয় রায়ের নেতৃত্বে করপোরেশনের কাউন্সিলর কমরেড ধীরেন ধর ও কলকাতা জেলার অন্যান্য নেতা ও কর্মীরা ধাঙড়দের একটা ময়লা ঠেলার গাড়ী স্টেজের উপর ঠেলে নিয়ে সকলে গোল হয়ে নেচে গান করেছিলেন। ···মহিলা সমিতির জন্য তো অনেকেই অনেক গান নাটক তৈরি করেছিলাম আমরা। রিলিফের কাজের জন্য ও ফ্যাসিস্তবিরোধী প্রচার-আন্দোলনের জন্য মহিলা সমিতির কর্মীরা 'ফুডকিউ' 'আত্ম-রক্ষার ডাক' প্রভৃতি নাটিকা অভিনয় করতেন। গ্রামে গ্রামে কৃষকমেয়েদের মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিতে আনবার জন্য নাচ গানের অনুষ্ঠান হত। যেমন সমিতির নেত্রী ও কর্মীরা গোল হয়ে নেচে নেচে ভাটিয়ালি সুরে গান করতেন:

"ওরে ও বীরের মায়ের দল
তোর সোনার ধানে বর্গি এল দেখরে চাহিয়া
আর কতকাল রইবি ঘুমে ওঠরে জাগিয়া—"

[দেশরক্ষার ডাক]

"১৯৪৩ সালে জুট ক্যাম্পেনের সময় চটকলের নারী শ্রমিকদের মধ্যে গিয়ে আমাদের মেয়েরা গান করত :

"আগে বড়ী জা মাইজী আগে বড়ী জা
কারখানামে মজদুর নীতু, ঘরমে তু হ্যায় মা,
এক হাতমে কারখানামে পয়দা বাড়ানা,
দুসরে হাতসে মাইজী তুমহার ঘরকো সম্ভালনা।"

[দেশরক্ষার ডাক]

মহিলাদের মধ্যে এরকম নাচগানের জোয়ারের নেতৃত্বে ছিলেন রেবা রায় (রায়চৌধুরী, বিনয় রায়ের ছোট বোন) উষা দত্ত, সাধনা সেন, প্রীতি ব্যানার্জী প্রমুখ। আর বিনয় রায় ছিলেন সবারই শিক্ষক।"[৮]

বিনয় রায় ছাড়াও ৪৬ নম্বরের অপর সঙ্গীত-প্রতিভা ছিলেন 'নবজীবনের গান' (এগুলিও জনপ্রিয়তম ফ্যাসিস্ত-বিরোধী গীতিমালা, যদিও তা সংকলনরূপে প্রকাশিত হয় ১৯৪৫-এর সেপ্টেম্বরে)-এর স্রষ্টা জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র। প্রাক-জনযুদ্ধ যুগে তাঁর সঙ্গীত-সাধনা ছিল ভারতীয় ধ্রুপদী সঙ্গীত ও রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ১৯৪২ সালে হঠাৎ তাঁর সঙ্গে আলাপ হলো বিনয় রায়ের। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের সঙ্গীতের ধারাটাই এরপর গেল আমূল বদলে। এই প্রসঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র লিখেছেন :

"...আমার বাড়িতেই বিনয়ের আড্ডা হল। বিনয় আমাকে বলত—আপনি তো প্রসিদ্ধ কবি-সুরকার রবীন্দ্রসঙ্গীত-শিল্পী। রবীন্দ্রনাথের নামে এই যে একটা এলানো, আমায় ধরো ধরো গোছের ব্যাপার চলছে—মানে রবীন্দ্রনাথকে বিকৃত করা, অংশকেই সমগ্র বলে দেখানো—একে ঠেকানো যায় না? আসুন কিছু শক্ত শক্ত জোরদার রবীন্দ্রসঙ্গীত বাছি এবং তাকে পপুলার করি। 'গীতবিতান' দেখে অর্গান বাজিয়ে শুরু হল সেই চেষ্টা। কয়েকটা গানের কথা বড্ড মনে পড়ে :

" 'বাধা দিলে বাধবে লড়াই, মরতে হবে।' 'আমি ভয় করব না ভয় করব না।' 'বাঁধ ভেঙে দাও', 'একসূত্রে বাঁধিয়াছি।'...তখন এইসব গান আমরা খুব গাইতাম। পার্টি মিটিঙেও গাইতাম। একদা বঙ্গভঙ্গের সময়, বাঙলাদেশের মাঠেঘাটে রবীন্দ্রনাথের গান ছড়িয়ে পড়েছিল। ভারতের মাটিতে যখন জাপানী বোমা পড়ছে, কোহিমায় আসামে যখন জাপানী উড়োজাহাজের হামলা শুরু হয়েছে—সেই অসম্ভব দিনগুলোয় রবীন্দ্রনাথের গান আবার এদেশের মাঠেঘাটে গাওয়া হয়েছিল। অন্যান্য গীতিকারদের প্রায়-বিস্মৃত বা

স্বল্প-পরিচিত কিছু গানও আমরা এই সময় গাইতাম। "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে..." গানটিতে আমি সুর দিয়েছিলাম।

"হেমাঙ্গ বিশ্বাসের নাম এই সময় খুব শুনতাম, বিনয়ের মুখেই বেশি শুনতাম। সাক্ষাৎ আলাপের আগেই হেমাঙ্গের অনেক ক'টা গান আমার মনে গেঁথে গিয়েছিল। তার একটা ঐ "ওরে ও চাষী ভাই তোমার কাস্তেটারে জোরে দিও শান'...

"একদিন বিনয় বলল—আমাদের আড্ডা আছে বৌবাজারে আর ছেচল্লিশ ধর্মতলায়। চলো না। সেই যাতায়াত শুরু। ছেচল্লিশ নম্বরের চারতলায় তখন ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের জমজমাট ব্যাপার। গিয়ে দেখলাম এক মহাসঙ্গমে গিয়ে হাজির হয়েছি।...ছেচল্লিশ নম্বর তখন প্রকৃত অর্থেই কমিটমেণ্টে বিশ্বাসী শিল্প-সাহিত্যের মহাযজ্ঞ ও কর্মশালা।

"গানে ছিল বিনয়, হেমাঙ্গ, জর্জ (দেবব্রত বিশ্বাস), হেমন্ত, সুজাতা-সুপ্রিয়া —সুচিত্রার দুই দিদি। তৃপ্তি আর সাধনাও তখন গান গাইত। মাঝে মাঝে শচীনদেব বর্মন এবং জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ আসতেন।...

"আমাদের কাজকর্মে আকৃষ্ট হয়ে হরীন্দ্রনাথ (চট্টোপাধ্যায়) মাঝে মাঝে কলকাতায় আসতেন, ছেচল্লিশের আড্ডায় বসে সকলকে গান শেখাতেন।

'সূরিয় অস্ত্ হো গয়া/গগন মস্ত্ হো গয়া...'

'অব্ নভমে পতাকা/নাচত হ্যায় নাচত হ্যায়...'

এসব গান তাঁরই কাছে শিখেছি। জর্জ আর হেমন্তর দৌলতে একসময় মানুষ তো "সূরিয় অস্ত্ হো গয়া" গানটি পথেঘাটে গেয়ে বেড়াত।...

"আর ছিল ইণ্টারন্যাশনাল। মোহিত ব্যানার্জির বাংলা তরজমা—'জাগো জাগো জাগো সর্বহারা' হরীনদার হিন্দী অনুবাদ 'উঠো জাগো ভুখে বন্দী অব খেঁচো লাল তল্ওয়ার', উর্দু'তে 'কেয়া থাক্ হ্যায় তেরি জিন্দেগানী উঠ্ এয় গরিব বেনোয়া'...হরীনদার কাছে শেখা বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের এই অনুবাদগুলি আমরা গাইতাম সভায়, স্ট্রীট কর্নারে, এমনকি দল বেঁধে উঠলে ট্রামে বাসে ট্রেনে। গাইতাম ছেচল্লিশ নম্বরে।...

"জাপান কোহিমা আক্রমণ করলে আমি একটা কাব্য ও গান লিখি যার ধুয়াটা ছিল—'আর দেবো না আর দেবো না সোনার মণিপুর।' এই সময়ই মিনার্ভা স্টেজে একটা অনুষ্ঠান হয়েছিল। তখন হেমাঙ্গ আমার অন্তরঙ্গদের একজন। মনে পড়ে তার—

'কি শুনি কি শুনি সই লো/কি শুনি কি শুনি
হরিতে রমনী মন/আইলো জাপানী সই/আইলো জাপানী।'

গানটি ধামাইলের সুরে সাধনা গাইছে আর হেমাঙ্গ, আমি, রোগা ডিগডিগে নির্মলেন্দু চৌধুরী এবং ভূপতি কি সুরপতি খালি গায়ে কোমরে গামছা বেঁধে নেচে নেচে সাধনার সঙ্গে গলা মেলাচ্ছি।...

"আমার গানের কতকগুলো সৃষ্টিভূমি ছিল। প্রথমেই মনে পড়ে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের কথা। আমাদের গ্রেট সত্যেন দা। তাঁর বাড়ির তেতলা। সেখানে তখন অরুণ মিত্রও থাকত। ··

"আর ছিল দেবব্রত বিশ্বাসের ঘরের একতলা। তার হারমোনিয়াম এবং তার সাহচর্য 'নবজীবনের গান'কে পূর্ণ রূপ দিতে অনেক সাহায্য করেছে। জর্জকে সহযোগী হিসেবে পেয়ে নিজেকে বহু সময়ই ধন্য মনে হয়েছে। তাছাড়া, ছেচল্লিশ নম্বরকে প্রায় ল্যাবরেটরির মতো ব্যবহার করা হত।...

"রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে গান মনে আসত। এক-একদিন দুটো-তিনটে গানও আসত। যার বাড়ি হোক গিয়ে শোনাতাম, হারমোনিয়ম বাজিয়ে ঠিকমতো তুলে নিতাম। আবার মাঝে মাঝে দীর্ঘ ছেদ পড়ত। প্রকৃতপক্ষে, গোটা তেরশো পঞ্চাশ সাল জুড়েই 'নবজীবনের গান' সৃষ্টির পালা চলেছিল।···

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পর্যায়ে নানা জন 'নবজীবনের গান' গেয়েছেন। আমরা তো ছিলামই—হেমাঙ্গ, জর্জ, সুচিত্রা, হেমন্ত প্রমুখও নানা সময়ে এ গান গেয়েছেন। 'নবজীবনের গান' গ্রন্থে প্রকাশকের ভূমিকায় বলা হয়েছিল:

"এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত (জ্ঞানপ্রকাশ) ঘোষকে অশেষ ধন্যবাদ গণনাট্য সংঘের পক্ষ থেকে জানাই। তাঁর মত গুণীব্যক্তি যেরকম ধৈর্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে একাজ অত্যন্ত দ্রুত সম্পন্ন করেছেন তাতে আমাদের আন্দোলনের প্রতি তাঁর অপরিসীম স্নেহ প্রকাশ পেয়েছে। তাছাড়া শ্রীযুক্ত পঙ্কজকুমার মল্লিক, সন্তোষ সেনগুপ্ত, হেমন্ত মুখার্জি ও দেবব্রত বিশ্বাসের কাছে যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছি।"[৯]

৪. পঞ্চাশের মর্মান্তিক মন্বন্তর মোকাবিলায় গণনাট্য সঙ্ঘ:

ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনে গণনাট্য সংঘের ভূমিকা যখন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে, তখন ১৯৪৩ সালে বাঙলায় দেখা দিল ভয়াবহ মহা মন্বন্তর। মনুষ্যসৃষ্ট এই মন্বন্তর ছিল যুদ্ধেরই অনিবার্য পরিণতি। কমিউনিস্ট পার্টি ও তার সকল গণসংগঠন একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল দুর্ভিক্ষ-প্রতিরোধে। ফ্যাসিস্ত-বিরোধী সংগ্রাম আর মন্বন্তর-প্রতিরোধের লড়াই তখন সত্যিই সমার্থক হয়ে উঠেছিল। এই সময়ে সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে সংগঠিত ও পরিচালিত করার জন্য বাঙলায় কমিউনিস্ট পার্টি সর্বপ্রথম পার্টিগতভাবে কিছুটা সচেতন ও সক্রিয় উদ্যোগ নিয়ে গঠন করলেন একটি প্রাদেশিক সাংস্কৃতিক ইউনিট। এই ইউনিটে ছিলেন বিনয় রায়, চিন্মোহন সেহানবীশ, সুধী প্রধান, অনিল কাঞ্জিলাল ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়।[১০] পরবর্তীকালে ১৯৪৩ সালে পার্টির সাংস্কৃতিক সেলে ষোল-সতের জন সদস্য ছিলেন। পূর্বোক্তারা ছাড়াও ছিলেন স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, অরুণ মিত্র, রবীন্দ্র মজুমদার, বিজন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, মণি রায়, অনিল সিংহ প্রমুখ।[১১]

মন্বন্তর-এর বিরুদ্ধে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত, ক্ষুধার্ত বাঙলাকে বাঁচাবার জন্য সেদিন

অন্যান্য গণসংগঠনগুলির মতো সাংস্কৃতিক সেলের কর্মীরাও যোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। 'নবজীবনের গান'-এর মতো সঙ্গীত, 'নবান্ন'র মতো নাটক, 'ভুখা হ্যায় বঙ্গাল' বা 'Spirit of India'-র মতো ব্যালে নৃত্যের অবিস্মরণীয় উৎস ছিল এই মন্বন্তরের যন্ত্রণা। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র এ-প্রসঙ্গে তাঁর ঐতিহাসিক স্মৃতি-চারণায় বলেছেন :

"...তারপর এল ১৯৪৩ সাল, বাঙলায় ১৩৫০। গোটা বাঙলাদেশ জুড়ে বিশেষ করে কলকাতায়, মহামন্বন্তরের করাল ছায়া চারদিক অন্ধকার করে দিল। আর ঘরে থাকা যাচ্ছিল না। জমাট সাহিত্যিক আড্ডা ও রিহার্সাল ছেড়ে আমরা সবাই রাস্তায় নেমে পড়লাম। চরম বিপর্যয় ও বীভৎস মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ালাম।

"রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতাম। চৌরঙ্গী, কালিঘাট, লেক মার্কেটের মোড়, বালিগঞ্জ ...ওদিকে শেয়ালদা, শ্যামবাজারের মোড়। সর্বত্র এক দৃশ্য—শত সহস্র কঙ্কাল ফ্যান দাও, ফ্যান দাও বলে চিৎকার করছে। পেটের জ্বালায় গ্রাম উৎখাত করে শহরে এসে অন্নদাতা কৃষক ও জগদ্ধাত্রী কৃষাণী দু-মুঠো অন্ন ভিক্ষা চাইতেও সাহস পায় না—বলে ফ্যান দাও।

"মনুষ্যত্বের কী অবমাননা! গোরু ছাগলের খাদ্য নিয়ে মানুষে মানুষে কাড়াকাড়ি। ডাস্টবিনের পচা এঁটোকাটা নিয়ে কুকুরে-মানুষে মারামারি। আর দেখলাম মৃত্যু—অমৃতের সন্তানরা মরছে যেন পোকামাকড়। একদিন দেখলাম মা মরে পড়ে আছে। তার স্তন ধরে অবোধ ক্ষুধার্ত শিশু টানাটানি করছে আর হেঁচকি তুলে কাঁদছে।

"এর প্রচণ্ড অভিঘাত আমার গোটা অস্তিত্বকে কাঁপিয়ে দিল। আমি চিৎকার করে বলে উঠলাম—না-না-না। অস্থির পায়ে দৌড়তে দৌড়তে হেঁটে চলেছি আর মনে মনে বলছি—**We won't allow people to die**—মানুষের তৈরি এই দুর্ভিক্ষ মানবো না, প্রতিরোধ করব, উত্তীর্ণ হব।...

"এই হল শুরু।...সুর আর কথা মনের বেদনা ও যন্ত্রণার রুদ্ধ উৎসমুখ থেকে ঝর্নার মতো বেরিয়ে এল। শুরু হল 'নবজীবনের গান' :

'না না না
মানবো না মানবো না
কোটি মৃত্যুরে কিনে নেবো প্রাণপণে
ভয়ের রাজ্যে থাকবো না।'...

"রোজই রাস্তায় মরণ দেখতাম। একদিন একটি বৃদ্ধকে দেখলাম খাদ্য চাইতে চাইতে মুখ থুবড়ে পড়ল, আর কথা নেই। কিছুক্ষণ বাদে পুলিশের লোক এসে লাঠি দিয়ে ঠেলে তাকে রাস্তার ধারে সরিয়ে দিল।

'পথে পথে শঙ্কা
মোড়ে মোড়ে বাজে মৃত্যুর জয়-ডঙ্কা।

ধনগৌরবে মাথা যুদ্ধের অঙ্গ।
আমরা তো সৈনিক, বুভুক্ষু দৈনিক
আমরা কি দেবো রণে ভঙ্গ।"

"মনের বেদনা ও যন্ত্রণার রুদ্ধ উৎস মুখ থেকে ঝর্নার মতো বেরিয়ে আসতে লাগল একটার পর একটা গান—নবজীবনের গান।"[১২]

এই সময়কালেই রচিত জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র-র অবিস্মরণীয় কবিতা 'মধুবংশীর গলি' শম্ভু মিত্র-র কণ্ঠে বারংবার আবৃত্ত হতো শত শত সভা-সমাবেশে, হাটে-বাজারে সর্বত্র। 'স্বপ্ন জেগে উঠছে, উঠেছে/স্টালিনগ্রাদে, মস্কোভায়/টিউনিসিয়ায়, মহাচীনে। মহা আশ্বাসের প্রবল নিঃশ্বাসে / দুর্দমনীয় ঝড় উঠেছে সৃষ্টির ঈশান কোণে।' এই সব পংক্তি আজ ইতিহাস।

১৯৪৩-৪৪ সালে মন্বন্তর-বিরোধী কর্মোদ্যোগ ও ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলন এবং সংগ্রাম গণনাট্য সংঘের সাংস্কৃতিক কর্মীরা একযোগেই পরিচালনা করতে শুরু করেন। একদিকে দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের জন্য আর্থিক সাহায্য সংগ্রহ, অন্যদিকে মন্বন্তর সৃষ্টিকারী জোতদার-জমিদার ও ব্যবসায়ী এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অশুভ আঁতাতের মুখোশ উন্মোচন, এই উভয়বিধ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সাংস্কৃতিক কর্মীরা গণনাট্য সংঘের নেতৃত্বে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য শিল্পানুষ্ঠান পরিচালনা করেন।

যাহোক, বাঙলা থেকে একটি সাংস্কৃতিক স্কোয়াড প্রথম বম্বে পৌঁছায় ১৯৪৩ সালের এপ্রিল মাসে। 'ভয়েস অফ বেঙ্গল' নামেই তা বম্বেতে সংবাদ-মাধ্যমগুলির কল্যাণে সব থেকে বেশি মাত্রায় পরিচিত হয়ে উঠেছিল। বাঙলা থেকে এই সাংস্কৃতিক টিমকে বোম্বে প্রেরণ করার পশ্চাতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক পি. সি. যোশীর 'উদ্যোগ ও সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা'কে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন,[১৩] যদিও 'ভয়েস অফ বেঙ্গল'-এর আনুষ্ঠানিক নেতা ছিলেন হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও বিনয় রায়।

সবথেকে আশ্চর্যের বিষয়, যে-সাংস্কৃতিক টিম অনুষ্ঠান করে বাঙলার দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে বম্বে গেল তাতে একমাত্র শম্ভু মিত্র ছাড়া সম্ভবত আর কোনো পেশাদার শিল্পীই ছিলেন না। তৃপ্তি মিত্র (তখন ভাদুড়ি) সেই সময় সদ্য টিমে এসেছেন। কেবলমাত্র রাজশাহী থেকে প্রীতি সরকার (পরে ব্যানার্জি)-কে আনা হয়েছিল তাঁর অসম্ভব মিষ্টি কণ্ঠস্বরের কথা শুনে। এছাড়া উত্তর ভারত সফরের জন্য অবাঙলাভাষী কয়েকজনকেও টিমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এঁদের মধ্যে ছিলেন ঢোলকবাদক ট্রাম শ্রমিক দশরথ লাল, প্রেম ধাওয়ান, নেমী চাঁদ ও রেখা জৈন প্রমুখ। তাছাড়া পুরনো আর পূর্বোল্লিখিত শিল্পী ও সংস্কৃতি-কর্মীরা তো ছিলেনই।

বোম্বেতে ও পরবর্তীকালে উত্তর ভারতে 'ভয়েস অফ বেঙ্গল' যে সমস্ত অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিনয় রায়-এর একাঙ্ক হিন্দী নাটিকা 'ম্যঁায় ভুখা হুঁ', পানু পাল-এর 'মহামারী নৃত্য' এবং 'ভারতের মর্মবাণী' বা 'স্পিরিট

অফ ইণ্ডিয়া' নামক সঙ্গীতনৃত্য আলেখ্য (ব্যালে) প্রভৃতি। এছাড়া ছিল ফ্যাসিবাদ-বিরোধী ও দুর্ভিক্ষ-বিরোধী সম্মেলক সঙ্গীত।

বাঙলার দুর্ভিক্ষের ব্যাপকতা ও ভয়াবহতা সম্পর্কে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের জনসাধারণ প্রায় অনবহিতই ছিলেন। তাই 'ভয়েস অফ বেঙ্গল'-এর অনুষ্ঠান বোম্বে ও পঞ্জাবসহ উত্তর ভারতে বিশেষভাবে সাড়া জাগায়। তাছাড়া নাটক-গান-নৃত্য প্রভৃতি শিল্পকলার বিভিন্ন মাধ্যমের এক নতুন ধরনের গণভিত্তিক আঙ্গিকের সঙ্গেও উত্তর ভারতের বুদ্ধিজীবী শিক্ষিত সম্প্রদায় ও সাধারণ মানুষ পরিচিত হন। বিষয়-বৈচিত্র্যে, আঙ্গিক-নৈপুণ্যে, গণআবেদন সৃষ্টিতে ও আন্তরিকতায় 'ভয়েস অফ বেঙ্গল'-এর অনুষ্ঠানগুলি এক নতুন সৃষ্টির দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। বাঙলার এই সাংস্কৃতিক টিমের উত্তর ভারত পরিক্রমাকে যাঁরা কমিউনিস্ট প্রচার-কৌশল মনে করতেন তাঁরাও 'ভয়েস অফ বেঙ্গল'-এর অনুষ্ঠানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন। ২১শে এপ্রিল বোম্বে শহরে বাঙলার শিল্পীরা সর্বপ্রথম একটি 'প্রেস শো' করেন। ১লা মে, মে-দিবস উপলক্ষে পূর্ণাঙ্গ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। শ্রমিক মহল্লাগুলিতে গিয়ে 'বাঙলা ট্রুপ' ছয়টি অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন এবং তা বিপুল সাড়া জাগায়। বোম্বের কংগ্রেস-সোস্যালিস্ট পার্টির অপপ্রচার ও অসহ-যোগিতা সত্ত্বেও (কংগ্রেস-সোস্যালিস্ট নেতা মিনু মাসানী তখন বোম্বে শহরের মেয়র) প্রায় ৭৫ হাজার বোম্বেবাসী 'ভয়েস অফ বেঙ্গল'-এর অনুষ্ঠান দেখে অনু-প্রাণিত হন। বোম্বের অনুষ্ঠান থেকে বাঙলার অজ্ঞাত ও অখ্যাত শিল্পীগোষ্ঠী প্রায় ২৫ হাজার টাকা সংগ্রহ করেন। তার মধ্যে ৭ হাজার টাকা অনুষ্ঠানের টিকিট বিক্রী করে, বাকিটা দান হিসেবে সংগৃহীত হয়। উল্লেখযোগ্য অর্থ সাহায্য-কারীদের মধ্যে ছিলেন: পৃথ্বীরাজ কাপুর, ভি শান্তারাম, মারাঠী নাট্যকার মামা ওয়ারেরকার, কে. এল. সায়গল, সরোজিনী নাইডু, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।[২৪] সবথেকে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল—প্রতিষ্ঠিত চলচ্চিত্র-তারকা কে. এল. সায়গল কমিউনিস্ট পার্টির পাঁচ লাখ টাকার তহবিলে সাহায্য সংগ্রহের জন্য 'ভিক্ষাঝুলি' নিয়ে পথে নামেন। কারণ, তাঁর মতে 'কমিউনিস্ট পার্টির মানবহিতৈষী কাজ তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে।'[২৫]

'ভয়েস অফ বেঙ্গল'-এর অনুষ্ঠান বোম্বের সংবাদপত্র মহলে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা অর্জন করে। 'বম্বে ক্রনিকল্', 'বম্বে সেন্টিনেল্' 'দি টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়া' প্রভৃতি ইংরাজী সংবাদপত্র বাঙলার শিল্পীগোষ্ঠীর নাটক, ব্যালে ও সঙ্গীতকে ভারতীয় সংস্কৃতির এক দিকনির্দেশক ধারা বলে যেমন চিহ্নিত করে তেমনি একে একটি বাস্তব ও শিক্ষামূলক শিল্প-প্রচেষ্টা রূপেও বর্ণনা করে। বলা হয়, এই নতুন ধরনের সাংস্কৃতিক আন্দোলন একটি জাতীয় আন্দোলন এবং জনসাধারণের অকুণ্ঠ সমর্থন এই আন্দোলনের পেছনে থাকা উচিত। এমনকি যে-গুজরাটি সংবাদপত্রগোষ্ঠী কমিউনিস্টদের সঙ্গে যুক্ত থাকা যে-কোনো কাজকেই বয়কট করে এসেছে এতদিন ধরে, তারাও পর্যন্ত তাদের পত্রিকায় লিখেছিল:

"বাঙলা থেকে আগত যুবগোষ্ঠী প্রকৃত শিল্পের রূপ আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। এই শিল্পীগোষ্ঠী হল এমন কর্মী মানুষ যাঁরা মানুষের মঙ্গলার্থে জীবনের সবকিছুই পরিত্যাগ করেছেন। এঁদের মধ্যে একমাত্র শম্ভু মিত্র-রই মঞ্চাভিনয়ের অভিজ্ঞতা রয়েছে। কিন্তু যখন আমরা বিনয় রায়, উষা দত্ত ও রেবা রায়কে মঞ্চে দেখি, তখনই উপলব্ধি করতে পারি যে, শিল্পের সঙ্গে জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িত।...এঁদের অনুষ্ঠান পরিবেশন করে এঁরা হাজার হাজার মানুষের হৃদয় জয় করে নিয়েছেন।...এঁদের পরিবেশিত সঙ্গীত শুধু মাত্র কণ্ঠনিঃসৃত ধ্বনি মাত্র নয়, এর উৎস হল এক অনুপ্রেরণার আগুন।"

এইসব কথাই লেখা হয়েছিল সেদিন 'জন্মভূমি', 'নূতন গুজরাট' ও 'বন্দেমাতরম্' প্রভৃতি সংবাদপত্রে।[১৬]

এরপর বোম্বেতে মে মাসে (১৯৪৩) আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয় ভারতীয় গণনাট্য সংঘের কেন্দ্রীয় ট্রুপ। পি. সি. যোশীর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় বোম্বের 'রেড ফ্লাগ হল'-এ শুরু হলো গণনাট্য সংঘের সংস্কৃতি-কর্মীদের একত্রিত 'কমিউন জীবন'। গণসংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারে সূচিত হলো নতুনতর পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

ইতিমধ্যে 'ভয়েস অফ বেঙ্গল' দুর্ভিক্ষপীড়িত বাঙলার জন্য অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে পঞ্জাব সফর করেছে। সুধী প্রধানের বিবরণ থেকে জানা যাচ্ছে যে, ১৭ই নভেম্বর (১৯৪৩) থেকে ১৩ই ডিসেম্বর (১৯৪৩) পর্যন্ত পঞ্জাবের ১০টি জেলা সফর করে 'ভয়েস অফ বেঙ্গল'। তাছাড়া দুটি দেশীয় রাজ্য, নিউ দিল্লী ও আগ্রা, এই ট্রুপ সফর করেছিল। প্রায় ১ লক্ষ ৭৫০ জন দর্শক এঁদের অনুষ্ঠান পর্যবেক্ষণ করেন। নগদ অর্থ সংগৃহীত হয়েছিল ৩২ হাজার ৪৭২ টাকা। এছাড়া গ্রামের মানুষও খাদ্যশস্য এবং অলঙ্কারাদি বাঙলার এই সাংস্কৃতিক ট্রুপের হাতে তুলে দেন।[১৭] সমগ্র উত্তর ভারত থেকে 'ভয়েস অফ বেঙ্গল' সর্বমোট সংগ্রহ করে প্রায় ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা, যা তখনকার বিচারে ছিল এক অকল্পনীয় ঘটনা।[১৮] এই পর্যায়ে সবথেকে জনপ্রিয় অনুষ্ঠান দুটি ছিল : উষা দত্ত-র 'ভুখা নৃত্য' এবং শান্তি বর্ধনের 'স্পিরিট অব ইণ্ডিয়া' বা 'ভারতের মর্মবাণী' এবং 'ইমমরটাল ইণ্ডিয়া' বা 'অমর ভারত' নামক ব্যালে। 'নবজীবনের গান'-এর খানিকটা এবং গম্ভীরা ধরনের 'গাজন' গানও ছিল এই ব্যালের অন্তর্ভুক্ত। গাজনের শিব সাজতেন শচীনশঙ্কর আর পার্বতী সাজতেন রেখা জৈন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আলমোড়া সেণ্টার (উদয়শঙ্করের ওয়ার্কশপ) ভেঙে যেতেই প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্কর বোম্বে চলে আসেন। অবশ্য এর পূর্বে ২৪ ডিসেম্বর (১৯৪৩) বিনয় রায় তাঁর সাংস্কৃতিক ট্রুপ নিয়ে দিল্লীতে উদয়শঙ্করের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তিনি 'ভয়েস অফ বেঙ্গল'-এর অনুষ্ঠানের উচ্চ প্রশংসা করেন। উদয়শঙ্কর বোম্বে আসার পর জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে 'প্রগতি লেখক সংঘ' ও 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ'-র পক্ষ থেকে তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হয়।

৩০শে জানুয়ারি উদয়শঙ্কর বাঙলার দুর্ভিক্ষে অর্থ সাহায্যের জন্য একটি অনুষ্ঠানসহ (যার উদ্বোধন করেন বোম্বের কংগ্রেস নেতা ভুলাভাই দেশাই) মোট দুটি অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন।[১৯] এরজন্য উদয়শঙ্করকে অনেক অপপ্রচারের সম্মুখীন হতে হলেও তিনি এই সময় গণনাট্য আন্দোলনের পাশেই ছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি নিজের ট্রুপের কয়েকজন শিল্পীকেও 'ভয়েস অফ বেঙ্গল' এবং 'গণনাট্য সংঘে'র সদস্য করে দিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—শচীনশঙ্কর, রবিশঙ্কর, অবনী দাশগুপ্ত (ব্যালে পরিচালক) শান্তি বর্ধন প্রমুখ বিখ্যাত শিল্পীরা।[২০] এর মধ্য দিয়ে সেই সময়ে গণনাট্য আন্দোলনের ব্যাপক গণভিত্তি ও অতুলনীয় জনপ্রিয়তা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। এমনকি কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে (প্রধানত যোশীর উৎসাহে) বোম্বের আন্ধেরীতে সেই সময় শিল্পী ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের যে 'কমিউন' ও 'ওয়ার্কশপ' ছিল তাতেও সামিল হন রবিশঙ্কর এবং শান্তি বর্ধন।

৫. জনযুদ্ধের যুগে গণনাট্য সংঘের নাট্য-আন্দোলন ঃ

'প্রগতি লেখক সংঘ' প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাঙলা ভাষায় এই সংঘের লেখকেরা যে-সমস্ত নাটক রচনা করেন, তার মধ্যে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়। সেই দৃষ্টিভঙ্গি ছিল প্রধানত শ্রেণী-সংগ্রামের দৃষ্টিভঙ্গি। বাঙলা ভাষায় সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগে, বিশেষ করে কাব্য-প্রবন্ধও গল্পে এবং কিছু কিছু উপন্যাসে, সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার প্রভাব প্রগতি লেখক সংঘ গঠনের অনেক আগেই লক্ষ্য করা গেছে। সংঘ গঠনের সূচনাপর্বে শ্রমিক-মালিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত লেখেন 'ভাঙা চাকা' নাটক (মে, ১৯৩৬)। ১৯৩৬ থেকে ১৯৪৩ সালের মধ্যে তিনি পরপর অনেকগুলি নাটক লিখেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'ভাঙা চাকা' ও 'চালের দর' (১৯৪৩)। সম্ভবত জ্যোতির্ময় সেনগুপ্তই আমাদের দেশে মার্কসবাদী শ্রেণীদৃষ্টিতে প্রথম নাটক লেখার চেষ্টা করেন। ১৯৩৮ সালে হুগলীর দয়ালকুমার রচনা করেন 'মুক্তির অভিযান' ও 'আলোর পথে' নামক সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদ-বিরোধী দুটি নাটক। হুগলী ও বর্ধমান জেলার বহু স্থানে উক্ত নাটক দুটি অভিনীত হয়।[২১]

তবে সংগঠিতভাবে ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী নাটক পরিবেশনের কৃতিত্ব 'গণনাট্য সংঘে'র পূর্বে অবশ্যই দাবি করতে পারে 'ইয়ুথ কালচারাল ইনস্টিট্যুট'। ১৯৪০-৪১ সালে সুনীল চট্টোপাধ্যায়, জলি কল ও দেবব্রত বসুর লেখা নাটকের অভিনয়ই গণনাট্য সংঘের নাট্য পরিবেশনার প্রাথমিক ভিত্তি রচনা করতে নিঃসন্দেহে সাহায্য করেছিল। এ বিষয়ে আমি ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি।

ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনের প্রচারমাধ্যম রূপে নাটককে ব্যবহার করার জন্য 'ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে'-র পক্ষ থেকে 'জনযুদ্ধ' পত্রিকায় (১৬ইমে, ১৯৪২) নতুন নাটক চেয়ে পুরস্কার ঘোষণা করে একটি বিজ্ঞাপন দেওয়া

হয়। সেই বিজ্ঞাপনে সাড়া দিয়ে অনেক নাটকই জমা পড়ে। তার মধ্যে বনস্পতি গুপ্ত-রচিত 'দেশ রক্ষার ডাক' নাটকটি শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়। এই বনস্পতি গুপ্ত-র প্রকৃত পরিচয় দীর্ঘকালই অজ্ঞাত ছিল। প্রগতি-সংস্কৃতি আন্দোলনের গবেষক ধনঞ্জয় দাশ আমাকে জানিয়েছেন যে, ঐ নামটি প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা সোমনাথ লাহিড়ীরই ছদ্মনাম। সত্তরের দশকের শেষ দিকে শ্রীলাহিড়ী একদিন শ্রীদাশকে তাঁর লেখা একটি কবিতা পড়তে দেন। সেই কবিতাটিতে নাম স্বাক্ষর করতে বলায় শ্রীলাহিড়ী 'বনস্পতি গুপ্ত'—এই ছদ্মনাম লিখে দেন। শ্রীদাশ গবেষণাসূত্রে ঐ নাটকটির কথা জানতেন। ফলে, ধনঞ্জয় দাশ সত্য ঘটনা উদ্ঘাটনের জন্য শ্রী লাহিড়ীকে চেপে ধরায় ঐ নাটক ছদ্মনামে লেখার কথা সোমনাথ লাহিড়ী স্বীকার করেন। যাহোক, এই সময় থেকে নতুন নতুন নাট্যকারের আগমন যেমন ঘটতে লাগল তেমনি তাঁদের রচিত নাটক গ্রাম এবং শহরেও অভিনীত হতে থাকল। ১৯৪২-৪৪ সালে অভিনীত যে-সব নাটকের সংবাদ পাওয়া যায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাটক হলো : ১) দেশরক্ষার ডাক (বনস্পতি গুপ্ত); ২) পতঙ্গের প্রতিশোধ (ঐ); ৩) কর্ণফুলির ডাক (সুবোধ ঘোষ); ৪) অভিযান (দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) এই নাটকেরই পূর্ণাঙ্গরূপ দীপশিখা; ৫) একরাত্রি (প্রভাতকুমার গোস্বামী; ৬) চালের দর (জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত); ৮) জাপানকে রুখতে হবে; ৯) রাজবন্দীদের মুক্তি চাই; ১০) প্রতিরোধ; ১১) এক হও (এইসব নাটকের রচয়িতার নাম পাওয়া যায়নি)।[২২]

১৯৪৩-৪৪ সালে গণনাট্য সংঘের উদ্যোগে যখন বাঙলা জুড়ে এবং উত্তর ভারতের নানা স্থানে দুর্ভিক্ষপীড়িত আর্তমানুষের সেবার জন্য সাহায্য সংগ্রহের আশায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হচ্ছে তখন তিনটি নাটক দর্শক মহলে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। সেই তিনটি নাটক হলো : প্রখ্যাত নট ও নাট্যপরিচালক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের (যিনি তৎকালীন গণনাট্য সংঘে-র বাঙলা শাখার সভাপতি ছিলেন এবং 'মহর্ষি' অভিধায় সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন) 'হোমিওপ্যাথী' এবং বিজন ভট্টাচার্য-রচিত 'জবানবন্দী' ও 'নবান্ন' নাটক। 'জবানবন্দী' হিন্দী ভাষায় 'অন্তিম অভিলাষ' নামে রূপান্তরিত হয়ে উত্তর ভারতে ব্যাপকভাবে অভিনীত হয়। তবে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সারা দেশে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল 'নবান্ন' নাটক। পঞ্চাশের মন্বন্তরের পটভূমিকায় রচিত এই নাটক ভারতীয় নাটকের ক্ষেত্রে এক দিকনির্দেশক ভূমিকা পালন করেছিল। ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনের শেষপর্বে এই নাটক একই সঙ্গে ফ্যাসিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় দুর্নীতির (জোতদার-জমিদার ও ব্যবসায়ীগোষ্ঠীর কালোবাজারী) বিরুদ্ধে ছিল এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদের হাতিয়ার। তাই 'নবান্ন'-প্রসঙ্গে একটু স্বতন্ত্রভাবেই আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে।

'নবান্ন' নাটকটি সাহিত্য-সমালোচকের দৃষ্টিতে হয়তো তেমন সার্থক রচনা নয়, কিন্তু এই নাটকই অত্যাধুনিক নাট্য-আন্দোলনের এবং নাট্যধারার ভিত্তি রচনা করেছিল। 'নবান্ন' সম্পর্কে চিন্মোহন সেহানবীশ লিখেছেন :

"মন্বন্তর-পর্বে গণনাট্য সংঘ-র যে কীর্তি সব থেকে বেশি দাগ কেটেছিল মানুষের মনে (বিশেষ করে নাগরিক মানসিকতায়) সেটি হল 'নবান্ন' অভিনয়। বিজ্ঞ সমালোচকের প্রখর দৃষ্টিতে নিশ্চয় কিছু ফাঁক ও ত্রুটি ধরা পড়ে ঐ নাটকের। কিন্তু সেদিন তার সমস্ত দুর্বলতা ছাপিয়ে সকলের মনে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল 'নবান্ন'-র আশ্চর্য অভিনয়-সাফল্যের কথা। ছোট-বড় প্রত্যেকটি ভূমিকাতেই গণনাট্যের শিল্পীরা অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছিলেন সেদিন"...[২৩]

'নবান্ন' নাট্যাভিনয় প্রসঙ্গে গণনাট্য আন্দোলনের একজন প্রথম সারির কর্মী ও প্রখ্যাত মঞ্চাভিনেত্রী শোভা সেন তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন :

"কলকাতায় একটি শক্তিশালী দল গড়ে উঠলো। শ্রীযুক্ত বিজন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র, সুধী প্রধান এঁরাই ছিলেন কর্ণধার। মহড়া শুরু হলো 'নবান্ন'-র। হ্যারিসন রোডের তিনতলা একটি বিরাট হল। পুরোদমে মাসখানেক মহড়া দিয়ে আমরা শ্রীরঙ্গম মঞ্চে ৭ দিন অভিনয় করলাম ১৯৪৪ সালের অক্টোবর মাসে। অনেকেই এর সাফল্য সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন। আমরাও খুব নিশ্চিন্ত ছিলাম না। কিন্তু নতুন একটা কিছু হতে যাচ্ছে এটা বুঝতে পেরেছিলাম। মহড়ার দিনে টিম ওয়ার্কের বা ঐক্যরীতির প্রয়োগ দেখে আশান্বিত হলাম। সত্যিই অসাধ্য সাধন হলো। এখানে ব্যক্তিবিশেষের মূল্য নেই।...'নবান্ন' প্রথম প্রমাণ করলো একটি নাটক মঞ্চস্থ করার পেছনে প্রতিটি শিল্পী-কুশলী ও প্রতিটি কর্মীর আছে অপরিসীম দায়িত্ব।...

"প্রথম রজনীর অভিনয়ের পরেই 'নবান্ন'-র সাফল্য সম্বন্ধে আর কারুর সন্দেহ রইল না। দর্শক বিস্মিত, সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত হয়ে গেলেন। একবাক্যে স্বীকার করে গেলেন—এ ধরনের প্রযোজনা দেখার সৌভাগ্য এর আগে হয়নি।"[২৪]

'নবান্ন' নাটক যুগ্মভাবে পরিচালনা করেছিলেন বিজন ভট্টাচার্য ও শম্ভু মিত্র। এঁদের সাহায্য করতেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ও গৌর ঘোষ। শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন—বিজন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র, সুধী প্রধান, চারুপ্রকাশ ঘোষ, গঙ্গাপদ বসু, সজল রায়চৌধুরী, রবীন্দ্র মজুমদার, গোপাল হালদার, জলদ চট্টোপাধ্যায়, শম্ভু ভট্টাচার্য, মনোরঞ্জন বড়াল, সমর রায়চৌধুরী, নীহার দাশগুপ্ত, রঞ্জিৎ বসু, সত্যজীবন ভট্টাচার্য, অমল ভট্টাচার্য প্রমুখ। মহিলা শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন শোভা সেন, তৃপ্তি ভাদুড়ী (মিত্র), মণিকুন্তলা সেন, বিভা সেন, ললিতা বিশ্বাস, কল্যাণী মুখার্জি (কুমার-মঙ্গলম)। উপদেষ্টা ছিলেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। মঞ্চাধ্যক্ষ ছিলেন তৎকালীন সম্পাদক (গণনাট্য সংঘ) চিত্ত ব্যানার্জি। আবহসঙ্গীত পরিচালনা করতেন

গৌর ঘোষ, সহযোগিতা করেছিলেন সুজিত নাথ, কমল মিত্র, বিজন দে, বরদা গুপ্ত প্রমুখ শিল্পীরা। 'নবান্ন'-র অসাধারণ মঞ্চসাফল্যের ফলে পেশাদারী ব্যবসায়ী থিয়েটারের মালিকরা এই নাটক বন্ধ করে দেওয়ার অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু 'নবান্ন'-র জনপ্রিয়তা ও গণআবেদনকে এর দ্বারা রোখা সম্ভব হয়নি। কেবলমাত্র কলকাতা শহরেই 'নবান্ন' অন্তত চল্লিশবার অভিনীত হয়।[২৫] তাছাড়া এই নাটক অভিনীত হয়েছিল বহরমপুর, যশোহর, চন্দননগর এবং হাটগোবিন্দপুর (বর্ধমান) প্রভৃতি অঞ্চলে। প্রায় পনেরো হাজার দর্শকের সামনে 'নবান্ন' অভিনীত হয় প্রাদেশিক কৃষকসভার সম্মেলন উপলক্ষে। এই অভিনয়-প্রসঙ্গে শোভা সেন বলেছেন :

> "সত্যিই সে উদ্দীপনা ভুলবার নয়। যাদের নিয়ে লেখা এই নাটক সেই কৃষকদের সামনেই করেছি অভিনয়। ঝড়-বৃষ্টিতে মঞ্চ গেল উড়ে। কিন্তু ঝড় থামলো, বৃষ্টি কমে গেল আর আমরা নূতন মঞ্চ গড়ে আমাদের অভিনয় করে এলাম। সেদিন গণনাট্য আন্দোলনের সার্থকতা সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম।"[২৬]

বাঙলার বিভিন্ন স্থানে অভিনীত 'নবান্ন' নাটকের দর্শক সংখ্যা ছিল প্রায় চল্লিশ হাজার।[২৭] সবদিক থেকেই 'নবান্ন' ছিল সাধারণ মানুষের কাছে এক নতুন অভিজ্ঞতা। নাট্যাভিনয়ের পুরনো ঐতিহ্যকে সরিয়ে দিয়ে এই নাটকের মাধ্যমে কাব্য, লোকাচার, লোকজীবন এবং সামাজিক তাৎপর্য এক নতুন ধারার নাট্যাভিনয়ে যেন মূর্ত হয়ে উঠল। গ্রামীণ ডায়ালেক্ট-নির্ভর সংলাপ এই নাটকটিকে জীবন্ত করে তোলে। 'নবান্ন' বিভিন্ন বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষিত মহলেও উচ্চ প্রশংসিত হয়। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র মতে: "দীনবন্ধু মিত্র-র নীলদর্পণ' নাটকের পর বাঙলা রঙ্গমঞ্চে এই প্রথম একটি প্রকৃত কৃষকজীবন নির্ভর নাটক পরিবেশিত হল।" 'যুগান্তর' বলে : "জনগণের জীবনের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরেছে এই নাটক।··· আগস্ট-আন্দোলন, দুর্ভিক্ষ, মহামারীর পশ্চাতে প্রকৃত কারণ কি—তা এই নাটকে প্রকাশিত।"[২৮]

এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়, 'নবান্ন' নাটক 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘে'-র মর্যাদা ও সম্মান যেমন একদিকে বাড়িয়ে দিয়েছিল তেমনি সাধারণ মানুষের কাছে কমিউনিস্ট পার্টির জনযুদ্ধ-সংক্রান্ত বক্তব্যও তুলে ধরতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।

৬. ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনে বাঙলার লোকসংস্কৃতি :

বাঙলায় ফ্যাসিস্ত-বিরোধী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পথিকৃৎ ছিল Y. C. I.-এর যুবগোষ্ঠী। তবে তাঁদের সংস্কৃতি ছিল একান্তভাবে নগরকেন্দ্রিক। বাঙলার সমৃদ্ধ লোকগীতি, লোকনৃত্য, যাত্রা, পাঁচালী, তরজা বা কবির লড়াই-এর মতো লোক-সংস্কৃতির মূল ধারাগুলি তাতে ছিল অনুপস্থিত। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে, জনযুদ্ধের যুগে, কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে সংগঠিত সাংস্কৃতিক আন্দোলন শুরু হওয়ার পর,

বিশেষ করে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পীসংঘের নাট্যশাখারূপে গণনাট্য সংঘ প্রতিষ্ঠার (১৯৪৩) পরেই বাঙলার অবহেলিত লোকসংস্কৃতিকেও ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম হাতিয়াররূপে ব্যবহার করা হয়। বিনয় রায়-ই সর্বপ্রথম বাঙলার আঞ্চলিক লোকসঙ্গীত সংগ্রহ করে তার গায়কী ও সুর-কাঠামো অবলম্বনে নতুন গণসঙ্গীত রচনা এবং পরিবেশনা শুরু করেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল—গানের মাধ্যমে যতদূর সম্ভব জনগণের মধ্যে প্রবেশ করা। বিহ্টা কিষাণ সম্মেলন থেকে তিনি কিছু হিন্দী গান সংগ্রহ করে আনেন। ভারতভূষণ আগরওয়ালের 'বড়ে চলো' গানও এইভাবে সংগৃহীত হয়। এরই সাহায্যে 'সোভিয়েট সুহৃদ সংঘে'-র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সোভিয়েত-জার্মান যুদ্ধারম্ভের বাৎসরিক অনুষ্ঠানকে তিনি মাতিয়ে তুলেছিলেন। এই প্রসঙ্গে চিন্মোহন সেহানবীশ লিখেছেন:

"এরপরে ডোমার কিষাণ সম্মেলনে তাঁর উত্তরবঙ্গের ভাষায় লেখা গেরিলা গান 'হই-হই-হই' চাষীদের মাঝে বিপুল উন্মাদনার সৃষ্টি করল। মফঃস্বল থেকেও গান আসতে লাগল কিছু কিছু।·· গানের আন্দোলন যে মধ্যবিত্তের আওতা থেকে ক্রমেই জনসাধারণের দিকে এগোচ্ছে তার আর এক প্রমাণ বিভিন্ন জেলার চলিত ভাষায় গান রচনা। মৈমনসিংহর হাজং নামক আদিম জাতির মধ্যে জনযুদ্ধের গান ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। তারা স্ত্রী-পুরুষ-শিশু একযোগে এই গান গায় ও সঙ্গে সঙ্গে নাচে। মিশনারী প্রভাবাধীন গারোদের মধ্যেও এই সুরের ছোঁয়াচ লাগছে। সম্প্রতি কমরেড বিনয় রায় উত্তর ও পূর্ববঙ্গের ১০টি জেলায় ঘুরে ১৩টি কেন্দ্রে ৯০ জনকে গান শিখিয়েছেন, স্থানে স্থানে গানের কেন্দ্র স্থাপন করে এসেছেন।"[২৯]

এরই প্রতিফলন দেখা গেল 'ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে'র দ্বিতীয় ও তৃতীয় সম্মেলনে (১৯৪৪ ও ১৯৪৫ সাল)। ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলন ও জনযুদ্ধের নীতি যদি গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে দিতে হয়, তবে লোকসংস্কৃতিকেই করতে হবে এর অন্যতম প্রধান বাহন—একথা উপলব্ধি করেই 'ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে'র সম্মেলনে লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন দিক পরিবেশন করার জন্য বিশেষ উদ্যোগ-আয়োজন চলে। ১৫ই-১৬ই জানুয়ারি (১৯৪৪) সংঘের দ্বিতীয় সম্মেলন সম্পর্কে 'জনযুদ্ধ' পত্রিকায় 'বাংলার গণশিল্পীদের সমাবেশ' এবং 'শ্রদ্ধানন্দ পার্কে সংস্কৃতি উৎসব' শীর্ষক যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল তাতে বলা হয়:

"সম্মেলন উপলক্ষে এবার রংপুর, জলপাইগুড়ি, শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ, ঢাকা, মালদহ, খুলনা, যশোহর, মুর্শিদাবাদ, হুগলী, হাওড়া, বাঁকুড়া, ২৪ পরগণা, বরিশাল প্রভৃতি জেলা হইতে প্রায় একশত প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন। প্রতিনিধি দলগুলি বিভিন্ন জেলার লেখক, সুগায়ক ও বিশিষ্ট শিল্পীদের লইয়া গঠিত হইয়াছিল। ময়মনসিংহ হইতে কবি নিবারণ পণ্ডিত, শ্রীহট্ট হইতে গীতিকার হেমাঙ্গ বিশ্বাস ও গায়ক নির্মল চৌধুরী, রংপুর হইতে নৃত্যশিল্পী পানু ও কীর্তনীয়া নগেন সা, মালদহ হইতে সতীশ মণ্ডলের নেতৃত্বে গম্ভীরা

দল, খুলনা হইতে হিমাংশু চক্রবর্তী, যশোহর হইতে কবিগায়ক নেপাল সরকার, হুগলী হইতে কবি দয়ালকুমার প্রভৃতি আরও অনেক প্রতিভাবান লেখক ও শিল্পী এই সম্মেলনে প্রতিনিধি হিসাবে আসেন।"[৩০]

শ্রদ্ধানন্দ পার্কে ১৬ই জানুয়ারি সম্মেলন উপলক্ষে যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল, সেখানে ৬ হাজার দর্শকের সামনে বাঙলার লোক-সংস্কৃতির লুপ্তধারাটি আবার সজীব হয়ে ওঠে। 'জনযুদ্ধ' পত্রিকায় লেখা হয়:

"কলিকাতায় এমন উৎসব আর হয় নাই। বিভিন্ন জেলা হইতে বিশিষ্ট শিল্পীর দল আসিয়াছেন। তাঁহারা কেহই সৌখিন গায়ক ও শিল্পী নন। শিল্প-পদ্ধতি তাঁহাদের হাতে দেশপ্রেমের অস্ত্র হইয়া দেখা দিয়াছে। জনগণের জীবনের সঙ্গে ইঁহাদের যোগ প্রত্যক্ষ। তাই ইঁহাদের শিল্পকৌশল ব্যর্থ হয় নাই।...এঁরা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ বলিয়াই ইঁহাদের শিল্প প্রকাশ এত সার্থক। দেশের সংস্কৃতি আজ ইঁহাদের আন্দোলনে নূতন জীবনের সন্ধান পাইয়াছে।"[৩১]

শ্রদ্ধানন্দ পার্কের ওই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্পর্কে যে বর্ণনা 'জনযুদ্ধ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তা নিম্নরূপ:

"কলিকাতার হরিপদ কুশারীর মর্মস্পর্শী গানে উৎসব আরম্ভ হইল। ইহার পর শুরু হইল বিভিন্ন জেলার গায়ক দলের গান। শ্রীহট্টের নির্মল চৌধুরী সদলবলে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের কয়েকখানি গান করিলেন। প্রত্যেকটি গানে দর্শকদের মধ্যে সাড়া পড়িয়া গেল। বাংলার লোকশিল্প যে খনির মতো সমৃদ্ধ—ইহার মধ্য দিয়াই যে জনগণের মধ্যে নূতন সাড়া জাগানো যায়, আমরা তার পরিচয় পাইলাম। শ্রীহট্টের চা বাগানের কর্মী সুধাংশু ঘোষের লেখা চা-কুলির গানের সঙ্গে কলিকাতার অনু দাশগুপ্ত চা-কুলির নাচ দেখাইলেন। ইহার পর মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া ও চব্বিশ পরগণার প্রতিনিধিদল গান করিলেন। খুলনার হিমাংশু চক্রবর্তীর গানে সকলেই মুগ্ধ হন। সব থেকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিল রংপুর দলের গান নাচ। পানু পাল ও রেবা রায়ের 'মহাবুভুক্ষা নৃত্য' সকলেরই প্রশংসা অর্জন করে। কলিকাতার দল পোর্ট মজুর রাজকুমার সিংহের লেখা একটি গান করে। পাঞ্জাব প্রত্যাগত প্রচারক দল বিনয় রায়ের নেতৃত্বে 'ম্যায় ভুখা হুঁ' নৃত্যনাট্য অভিনয় করেন। ইহার পর সভাপতি শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য লেখক ও শিল্পী সংঘের কাজের জন্য জনসাধারণের কাছে সাহায্যের আবেদন জানাইলেন। দু'পয়সা এক পয়সা এমনকি আধলাও পর্যন্ত সাহায্য আসিল।"[৩২]

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, পঞ্চাশের মন্বন্তরের দুঃসহ পটভূমিকায় রচিত হরিপদ কুশারীর কিছু গান সেই সময় অভূতপূর্ব প্রভাব ফেলেছিল। যেমন এই গানটি:

'মরণ শিয়রে দলাদলি করে কেমনে বাঁচিবি বল
সোনার বাঙলা হল শ্মশান একসাথে সব চল ...

মুনাফাখোর আর বিদেশী শাসন, সাথে চাউল-চোর হল গদীয়ান
আকাশে ঐ জাপানী বিমান, কে তারে রুখিবে বল॥"

নানা কারণে 'ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে'র এই দ্বিতীয় সম্মেলন অত্যন্ত তাৎপর্যবাহী। ১৯৪৪-এর জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনের গৃহীত নীতি ও কর্মসূচী এবং প্রস্তাবাদি অনুসরণ করেই পরবর্তী দেড় বৎসরকাল ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল। দ্বিতীয় সম্মেলনে গৃহীত মূল প্রস্তাবে বলা হয় (উত্থাপক: হীরেন মুখার্জি, সমর্থক: হিরণকুমার সান্যাল):

"গত এক বছরের বিপর্যয় বাঙলাদেশের কোটি কোটি মানুষের জীবনে গভীর দুর্ভোগ আনিয়াছে। বাঙলার ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পীগণ এই বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করিবার জন্য হাতিয়ার তৈরির কাজে লাগিয়াছেন এবং জনসাধারণের হাতে এখানে সেখানে কিছু হাতিয়ার তুলিয়াও দিয়াছেন।...

"কারণ জনসাধারণের মধ্যে যে হতাশা বারবার ফিরিয়া আসিতেছে এবং তাহার প্রভাব লেখক ও শিল্পীদের মনেও পড়িয়াছে, এই সম্মেলন ইহাতে গভীর আশঙ্কা প্রকাশ করিতেছে, কারণ সম্মেলনের অভিমত এই যে, সঙ্কটের বিরুদ্ধে জনগণের আত্মপ্রত্যয়েব বাঁধ নির্মাণ অত্যন্ত জরুরী। দুর্ভিক্ষের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে মহামারী এবং মহামারীর ক্ষতের মধ্যে মন্বন্তর জন্ম লইতেছে!...ভারতের পূর্ব সীমান্তে বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের শেষ ঠিকাদার ফ্যাসিস্টরা ক্ষতবিক্ষত বাঙলার দিকে লোলুপদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে এবং জনসাধারণের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পথ করিবার জন্য নির্বিচারে বোমা ফেলিতেছে। স্বার্থান্ধ সাম্রাজ্যবাদী আমলাতন্ত্র সাম্রাজ্য বজায় রাখার রঙীন স্বপ্নে ঢুলিতেছে, দেশের নেতাদের কারাগারে আটক রাখিয়া অচল অবস্থা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে। এই অচল অবস্থার সুযোগে মুষ্টিমেয় লোভী ব্যবসাদার দেশবাসীর মৃতদেহের উপর লাভের কড়ি জমাইতেছে, আর ইহার সুযোগে দেশদ্রোহী প্রতিক্রিয়াপন্থীরা বিভ্রান্ত চিন্তা ও নৈরাশ্য ছড়াইয়া দেশকে গভীরতর সঙ্কটে টানিয়া লইতে চেষ্টা করিতেছে।...এই সম্মেলন লক্ষ্য করিয়াছে যে, দেশের জনগণের মনে যে শিল্পীরা এই নিদারুণ লড়াইয়ের মধ্যে আশা ও প্রত্যয়ের সৃষ্টি করিতে পারিত, তাহারা একে একে স্তব্ধ হইয়া যাইতেছে; গ্রামের গায়ক, নট, পটুয়া ও কারুশিল্পীরা হয় গৃহত্যাগী, নয় মৃত্যুপথে। অতএব বাংলাদেশের সমগ্র শিল্পী ও সাহিত্যিকদের এখন সচেতন হইবার সময় আসিয়াছে।"[৩৩]

এই মূল প্রস্তাবের অংশবিশেষ থেকে একথা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, 'ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'কে সেইসময় একই সঙ্গে ফ্যাসিবাদ-বিরোধী, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, মন্বন্তর সৃষ্টিকারী কালোবাজারী ব্যবসাদার-বিরোধী, জোতদার-বিরোধী এবং বাঙলার লোকসংস্কৃতির রক্ষক ও প্রচারকের মিলিত ভূমিকা পালন করতে

হয়েছিল। একাজ খুব সহজ ছিল না। কারণ,উগ্রজাতীয়তাবাদী ফ্যাসিস্ত-সমর্থকেরা সংঘ-পরিচালিত আন্দোলনকে নানাভাবে বাধা দেবার প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু ব্যাপক গণভিত্তি ছিল বলেই সেই অপচেষ্টা সফল হতে পারেনি। ১৯৪৪ সালে সংঘের সম্মেলন থেকেই এই গণভিত্তি আরো প্রসারিত করার জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এজন্য যে সাংগঠনিক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় (উত্থাপক : রণেশ দাশগুপ্ত, সমর্থক : সুশান্ত পাঠক) তা হলো :

" ...বিভিন্ন জেলার সহিত সংঘের ভালরকম যোগসূত্র স্থাপিত হয় নাই। ইহার মূলে আছে সাংগঠনিক দুর্বলতা। সেই জন্য সংঘকে সজীব ও প্রাণবন্ত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত পন্থাগুলি অবলম্বন করিবার জন্য প্রস্তাব করা যাইতেছে :

১) একটি ভ্রাম্যমান 'কালচারাল স্কোয়াড' থাকিবে এবং সেই স্কোয়াড মধ্যে মধ্যে জেলাগুলিতে যাইয়া স্কোয়াডগুলিকে নির্দেশ দিবে।

২) জনসঙ্গীত এবং অন্যান্য গণসংস্কৃতিমূলক লেখাগুলিকে প্রকাশের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৩) জেলা সংঘকে দুষ্প্রাপ্য বই ধার দিবার জন্য একটি কেন্দ্রীয় পাঠাগার গঠন করিতে হইবে। সেই পাঠাগার শাখাসমূহ হইতে উপযুক্ত জমা রাখিয়া নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বই ধার দিবে।

৪) বিভিন্ন জেলার প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পীবৃন্দকে সংস্কৃতির গতি এবং ধারার সহিত ওয়াকিবহাল রাখিবার জন্য নিম্নলিখিত লেখক ও শিল্পীদের লইয়া একটি কেন্দ্রীয় 'কালচারাল ব্যুরো' গঠিত হইবে :

(১) গোপাল হালদার (২) হীরেন মুখোপাধ্যায় (৩) মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য (৪) বিষ্ণু দে (৫) সুনীল বসু (৬) বিনয় রায় (৭) মণি রায় (৮) নীরেন রায় (৯) চিন্মোহন সেহানবীশ (আহ্বায়ক)।

৫) বর্তমান অবস্থায় সংঘের মুখপত্র হিসাবে একটি সাময়িক পত্রিকা বা **P. E. N.** যেমন বুলেটিন প্রকাশ করিয়া থাকেন ঐরূপ বুলেটিন প্রকাশের ব্যবস্থা করা হইবে।

৬) বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় প্রকাশিত প্রগতিশীল রচনার সহিত যোগাযোগ রাখিবার জন্য একটি অনুবাদ বিভাগের ব্যবস্থা করিতে হইবে।"[৩৪]

এই কর্মসূচী নিয়ে অগ্রসর হওয়ার ফলে 'ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে'র তৃতীয় সম্মেলনে অভূতপূর্ব সাফল্য পাওয়া যায়। সম্মেলন উপলক্ষে মহম্মদ আলি পার্কে (৩ রা মার্চ, ১৯৪৫) যে-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল তাতে প্রাধান্য পেয়েছিল লোকসংস্কৃতির ধারাটিই। এই সম্মেলনে যেমন এসেছিলেন কবিয়াল রমেশচন্দ্র শীল (চট্টগ্রাম), শেখ গোমানী (মালদহ), তেমনি এসেছিলেন কুমিল্লার উদাসী ফকির ও লোকশিল্পী সাহেব আলি কিংবা রংপুরের অন্ধগায়ক টগর অধিকারী। এঁদের কারুর কারুর জীবনকথা সুধী প্রধান-রচিত

'কয়েকজন লোককবি' নামক পুস্তিকায় সেই সময় প্রকাশিত হয়েছিল। ফ্যাসিস্ট-বিরোধী আন্দোলনে লোকশিল্পীদের ভূমিকার কথা বলতে গিয়ে এক স্মৃতিচারণে সেই সময়কার সাংস্কৃতিক আন্দোলনের আর একজন নেতৃস্থানীয় কর্মী সাধন দাশগুপ্ত লিখেছেন :

" ...চট্টগ্রামের কৃষক নেতা বঙ্কিম সেন কৃষক সমিতির মাধ্যমে রাজনৈতিক চেতনায় সমৃদ্ধ একটি কবিয়াল-গোষ্ঠী গড়ে তুলেছিলেন। এই কবিয়ালদের মধ্যমণি ছিলেন রমেশচন্দ্র শীল। রমেশচন্দ্র শীলের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত প্রথম পরিচয় ঘটে কলকাতায় মহম্মদ আলি পার্কে অনুষ্ঠিত ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের সম্মেলন উপলক্ষে। সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশনে তাঁর কবিগান গুণীজনের সাদর সংবর্ধনা লাভ করেছিল। কবিগানের আসরে একপক্ষে ছিলেন রমেশচন্দ্র শীল এবং তাঁর সহযোগী ফণী বড়ুয়া, রাইমোহন, নির্মল দাস প্রমুখ শিল্পীরা। অপরপক্ষে ছিলেন শেখ গোমানী ও লম্বোদর চক্রবর্তী এবং অন্যান্য। গানের লড়াইতে লম্বোদর চক্রবর্তী প্রশ্ন করলেন— "কবিয়াল গোমানী আমার পিতা আর কবিয়াল রমেশচন্দ্র আমার পিতামহ। পিতামহ এবার বলুন বিশ্বব্যাপী এই মহাযুদ্ধ কেন? কেন এই মন্বন্তর? সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের স্বরূপ কি?" রমেশচন্দ্র শীল কবিগানের ভাষায় জবাব দিলেন—"কবি লম্বোদর, তুমি আমাকে পিতামহের সম্মান দিয়ে কৃতার্থ করলে। তোমার পাণ্ডিত্য অসীম। তা নাহলে এত জটিল প্রশ্নের সন্ধান তুমি কোথায় পেলে? তোমার প্রশ্নের জবাবে প্রথমেই বলছি—"নাতিরে আমার / দৈর্গার (দরিয়ার) কূলে বসত কর তুমি না জানো সাঁতার।" গানের মুখবন্ধ দিয়ে প্রথমেই তিনি উপস্থিত জনতার অন্তর জয় করে নিলেন। তারপর, কখনও ফ্যাসিবাদ তথা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ কশাঘাতে, কখনও পরাধীনতার বেদনায় নিষিক্ত হয়ে, কখনও-বা স্বাধীনতা সংগ্রামের উদাত্ত আহ্বানে বিরাট জনসমুদ্রকে তিনি একসূত্রে গেঁথে দিলেন। শেখ গোমানীও তাঁর সঙ্গে সমানভাবে পাল্লা দিয়েছিলেন।...

"সংঘের উপরোক্ত সম্মেলনে কুমিল্লার উদাসী ফকির ও লোকশিল্পী সাহেব আলি এসেছিলেন। রমেশচন্দ্র শীলের প্রসঙ্গে বঙ্কিম সেনের কথাও এসে যায়। সুকণ্ঠের অধিকারী বঙ্কিম সেন চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় গান বেঁধেছিলেন—

'শোনো ওরে দেশরবাসী শোনো যতেক নারী,
বহু দুঃখের শেষ আজুয়া জীবন যায়গো ছাড়ি॥
সাতকানিয়ায় আছিল্ যে ঘর, সোয়ামী আছিল্ চাসী,
আছিল্ চাউরগা হালর বলদ গোলায় ধান রাশি।
শোনো মা ভৈনরে॥'...

"দুর্ভিক্ষপীড়িতা এক কৃষক-রমণীর সর্বস্ব হারানোর বেদনা এই গানটিতে প্রকাশ পেয়েছে।...

"ময়মনসিংহ জেলায় গণসংস্কৃতি সংগঠনের প্রকৃত রূপকার ছিলেন কৃষক-নেতা জিতেন সেন। মার্গ সঙ্গীতেও তাঁর যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। তাঁর একটি গান সে যুগে যথেষ্ট আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল—"হাজার কণ্ঠে আওয়াজ তোলো দেশকে রক্ষা করতে চাই/দেশ নেতাদের মুক্তি চাই / জাগো জাগো দেশদরদী ভাই।'…ময়মনসিংহের নিবারণ পণ্ডিত ছিলেন একেবারে নির্ভেজাল গণশিল্পী : নিজে গান বাঁধতেন আর দোতারা বাজিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে গণসঙ্গীত প্রচার করতেন। জারিগানের অনুসরণে লেখা তাঁর গানগুলি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে কৃষকরা দল বেঁধে নাচের তালে তালে গাইতেন।…অবিভক্ত বাঙলার ময়মনসিংহ জেলার বাউল-গায়ক অখিল চক্রবর্তী সে সময়ে গণনাট্য আন্দোলনের শরিক হিসেবে গ্রামে গ্রামে বাউল গান গেয়ে বেড়াতেন, নিজেও গান রচনা করতেন।…আদিবাসী হাজংদের মধ্যে ধনেশ্বর চৌহান, চন্দ্র সরকার ও কাঙ্গাল দাস ময়মনসিংহ জেলায় গণনাট্যের গান গেয়ে ও নিজেরা গান রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

"…সারা ভারত কৃষকসভার নেত্রকোণা সম্মেলনের (মে, ১৯৪৫) প্রস্তুতিপর্বে গণসঙ্গীত ছিল এক বিরাট অবলম্বন। হাজার হাজার হাজং স্বেচ্ছাসেবক সম্মেলনের শিবির ও মঞ্চ তৈরি করার সময় মিলিত কণ্ঠে গণসঙ্গীত গাইত। আমার ওপর কমরেড মণি সিংয়ের হুকুম ছিল নেত্রকোণা শহর থেকে অমুক অমুক গ্রাম পর্যন্ত স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে অমুক অমুক দিন পায়ে হেঁটে যেতে হবে। যাওয়ার পথে পল্লীতে পল্লীতে গান করতে হবে। চাঁদা তুলতে হবে। এবং এই প্রতিদিনের দূরত্ব ছিল গড়ে প্রায় ১৯/২০ মাইল। আবার সন্ধ্যায় গ্রামে গ্রামে বৈঠক, যার একটি বিশিষ্ট সূচী ছিল গণসঙ্গীত।"[৩৫]

এছাড়াও সাধন দাশগুপ্ত তাঁর স্মৃতিচারণে আর যাঁদের কথা উল্লেখ করেছেন তাঁরা হলেন - রংপুর জেলার কৃষকসভার কর্মী ও গণশিল্পী জামসেদ আলি চাটি, রাজশাহী জেলার প্রীতি বন্দ্যোপাধ্যায় ও আলপনা গুপ্ত, রংপুরের বিখ্যাত বিনয় রায় ও তাঁর ভগিনী রেবা রায়চৌধুরী এবং শ্রীহট্ট জেলার প্রখ্যাত গণসঙ্গীত-শিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাস, সুমধুর ও দরাজগলার অধিকারী গোপাল নন্দী, লোকসঙ্গীত শিল্পী নির্মলেন্দু চৌধুরী, বর্তমান চিত্রশিল্পী খালেদ চৌধুরী (তিনি তখন ভালো কাওয়ালী গাইতেন) প্রমুখ বহু প্রতিভাধর শিল্পীদের নিয়ে গঠিত স্কোয়াডটিও তখন লোকসংস্কৃতির আন্দোলনে অগ্রণীর ভূমিকা পালন করেছিল। খুলনার হিমাংশু চক্রবর্তী ও ঢাকা জেলার রণেশ দাশগুপ্ত এবং সত্যেন সেনও গণসংস্কৃতি-আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। আর ছিলেন সঙ্গীতশিল্পী সাধন দাশগুপ্ত স্বয়ং। তিনিও গান লিখতেন, গাইতেন এবং নাটকে অভিনয় করতেন। তাঁর লেখা গান 'চাষী দে তোর লাল সেলাম তোর লাল নিশানরে' একসময় কয়েকটি প্রাদেশিক ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। ঢাকাই ছাদ-পেটানো গানের অনুসরণে লেখা তাঁর গান, 'দে দে স্ট্যালিন ভাই পায়ে পাড়ি ছাইড়া দে / আর্থ-

হিটলার মরি লাজেতে'—সেইসময় বহুল প্রচারিত হয়েছিল এবং ঢাকার 'প্রতিরোধ পাবলিশার্স' এইসব গান প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, পূর্ববঙ্গের জেলাগুলিতে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলন সংগঠিত করতে এবং একই সঙ্গে পঞ্চাশের মন্বন্তরের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে লোকসঙ্গীত ও লোকসংস্কৃতির অবদান ছিল সব থেকে বেশি। ঐ সময় বর্মার প্রাক্তন বিপ্লবী ও ঢাকার কৃষক-নেতা জিতেন ঘোষ, অগ্নিযুগের বিপ্লবী শ্রমিক-নেতা বিনয় বসু ও সাধন দাশগুপ্তকে নিয়ে একটি প্রচার-ব্রিগেড তৈরি হয়েছিল। এঁরা গণসঙ্গীত ও লোকসঙ্গীতের হাতিয়ার নিয়ে একত্রে সুদূর পল্লী অঞ্চলে ঘুরতেন কৃষক সংগঠনকে শক্তিশালী করার জন্য।

১৯৪৩ সালে ছাত্রফেডারেশনের যে সাংস্কৃতিক দলটি আসাম সফর করেছিলেন তাতে পূর্ব বাঙলার খুলনা থেকে হিমাংশু চক্রবর্তী, ময়মনসিংহ থেকে মনতোষ ধরগুপ্ত, পরেশ সাহারায় ও একজন হাজং ছাত্র এবং ঢাকা থেকে সাধন দাশগুপ্ত যোগ দিয়েছিলেন। এই দলে কলকাতা থেকে যোগ দিয়েছিলেন অরুণ দাশগুপ্ত ও অজিত রায় (যুগ্ম-দলনেতা), সজল রায়চৌধুরী, শম্ভু ভট্টাচার্য ও সলিল চৌধুরী।[৩৬]

এর থেকেই বোঝা যায় যে, গণসঙ্গীত তথা গণসংস্কৃতিকে গণসংগঠনগুলির সঙ্গে কতটা একাত্ম করে তোলা হয়েছিল। শুধু পূর্ববঙ্গে নয়, সারা বাঙলা জুড়েই তখন অসংখ্য গণশিল্পী ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনে এবং মন্বন্তরের বিরুদ্ধে সংগ্রামে শরিক হয়েছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির রক্তপতাকার নীচে। ফ্যাসিস্ত-শত্রুর আক্রমণ থেকে বাঙলা তথা ভারতবর্ষকে রক্ষা করার জন্য, জাপ-আক্রমণকে প্রতিরোধের জন্য তাঁরা সকলেই ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ দেশপ্রেমিক। আর, এই লড়াইয়ের অস্ত্ররূপে তাঁরা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছিলেন বাঙলার সমৃদ্ধশালী লোকসংস্কৃতিকে। দেশের লুপ্তপ্রায় লোকশিল্পকে উদ্ধার করে বা পুনরুজ্জীবিত করে তাকে বসিয়েছিলেন জনতার মনে শ্রদ্ধার আসনে।

৭. ফ্যাসিস্ত-বিরোধী চিত্রকলা ও ক্যালকাটা গ্রুপ :

জনযুদ্ধের যুগে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সহযোগী রূপে গড়ে উঠেছিল গণমুখী চিত্রকলা রচনার এক নতুন ধারা। সাহিত্যিক, গায়ক ও অপরাপর সাংস্কৃতিক কর্মীদের মতোই সেইসময় বাঙলার প্রতিভাধর ও সৃজনশীল চিত্রশিল্পীদের একটা অংশ 'ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে'র সদস্যরূপে এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন।

চিত্রকলার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ১৯৪০-এর দশকেই চিত্র-শিল্পের ক্ষেত্রটি সুস্পষ্ট তিনটি ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়েছে। একটি ধারা ব্রিটিশ আর্ট স্কুলগুলিকে অন্ধভাবে অনুসরণ করে ইউরোপের প্রথাগত ঐতিহ্যকেই বহন করে চলত; দ্বিতীয় ধারাটি ছিল এরই বিকল্পরূপে 'স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল

সোসাইটি' পরিচালিত প্রাচ্যধারা, যা অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল ও তাঁদের শিষ্যেরা বহন করে চলছিলেন এবং তৃতীয় ধারাটি ছিল নিঃসন্দেহে লোকচিত্রকলার ধারা। প্রধানত যামিনী রায় ছিলেন এই রীতির পুরোধা শিল্পী। তিনি বাঙলার লোকশিল্প, পট ও টেরাকোটা মন্দিরের ভাস্কর্য থেকে বিষয় এবং আঙ্গিক গ্রহণ করেন। অবশ্যই সেগুলি শুধুমাত্র অনুকরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, শিল্পী এর থেকেই একটি নিজস্ব বলিষ্ঠ প্রকাশ-মাধ্যমও গড়ে তোলেন।[৩৭]

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ইউরোপের চিত্রকলাও তখন পৃথক দুটি আন্দোলনের ধারায় প্রবাহিত হচ্ছিল। প্রথমটি, বিমূর্ত শিল্পধারা—যা ইউরোপের চিত্র-আঙ্গিকের পুরনো বনিয়াদকে ধ্বসিয়ে দেয়। দ্বিতীয়টি, বাস্তবতা ও জীবন-সংশ্লিষ্ট শিল্পধারা—রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরবর্তীকালেই যার উদ্ভব।

ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত যে-চিত্রশিল্পীগোষ্ঠী তখন আত্ম-প্রকাশ করেছিলেন তাঁরা ছিলেন ভারতীয় তৃতীয় ধারা ও ইউরোপীয় দ্বিতীয় ধারার সংমিশ্রিত শিল্পচেতনার অনুসারী। এই সময়কার প্রখ্যাত শিল্পী ছিলেন যামিনী রায়। তিনি 'ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে'-র সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন প্রথমাবধি।

যামিনী রায়ের উত্তরসূরী হিসাবে গণ্য করা যায় 'ক্যালকাটা গ্রুপ'কে। জাতীয় কংগ্রেসের ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ 'বেঙ্গল স্কুল'-এর (যার নেতা ছিলেন নন্দলাল বসু) বিকল্পরূপে ১৯৪৩ সালেই আত্মপ্রকাশ করে 'ক্যালকাটা গ্রুপ'। যদিও শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুও জীবনের শেষ পর্যায়ে বাঙলার লোকচিত্রকলার আঙ্গিকের দিকেই ঝুঁকেছিলেন। কিন্তু যে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা 'ক্যালকাটা গ্রুপে'র চেতনায় সঞ্জীবিত ছিল তা হয়তো নন্দলালের কাছে ছিল সচেতনভাবেই বর্জনীয়।

১৯৩৪ সালে অনুষ্ঠিত সোভিয়েত লেখক কংগ্রেস, সমকালীন শিল্পের আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা ও বিমূর্ত শিল্পকে বর্জন করে মেহনতী মানুষের সুখ-দুঃখকে চিত্রকলায় প্রধান স্থান দিতে আবেদন করেন। শিল্পে মানবিকতা ও বাস্তবতার প্রকাশকেই আদর্শ বলে ঘোষণা করা হয়। 'ক্যালকাটা গ্রুপে'র শিল্পীরাও সে-সময় প্রায় প্রত্যেকেই এই মার্কসবাদী চেতনাদৃপ্ত পথই গ্রহণ করেন।

'ক্যালকাটা গ্রুপে'র প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সুভো ঠাকুর, রথীন মৈত্র, গোপাল ঘোষ, নীরদ মজুমদার, প্রদোষ দাশগুপ্ত, কমলা দাশগুপ্ত, প্রাণকৃষ্ণ পাল ও পরিতোষ সেন। এঁদের সম্পর্কে 'ক্যালকাটা গ্রুপে'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও শিল্পী রথীন মৈত্র বলেছেন :

"...এঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ রীতিতে ছবি আঁকতেন বা ভাস্কর্য করতেন। তবে মূল বিষয় ছিল সমাজচেতনা বা সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি। তখনকার শিল্পীরা পৌরাণিক ছবি আঁকছিলেন। আঁকতেন নারীর নানা রূপ-বৈচিত্র্য। তাকে **Break-through** করে একেবারে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হলো, মাটির কাছাকাছি, সমকালীন চিন্তাধারা নিয়ে ছবি আঁকা শুরু হলো।

সামাজিক বাস্তবতাকে শৈল্পিকভাবে ফুটিয়ে তোলা হলো। আরেকটা বিষয় ছিল তখন। তা হলো 'যুদ্ধ'। যুদ্ধের বিরুদ্ধেও আমরা আমাদের মতামত ব্যক্ত করেছিলাম।"[৩৮]

প্রকৃতপক্ষে, তখন রথীন মৈত্রের মতো 'ক্যালকাটা গ্রুপে'র আরো অনেক শিল্পীই ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন যুদ্ধ ও ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনে এবং তারই সঙ্গে যুক্ত থেকেই পরবর্তীকালে মন্বন্তর-প্রতিরোধের সামগ্রিক কর্মসূচীতেও তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

এই সময়কালেই 'ক্যালকাটা গ্রুপে'র সদস্যেরা স্বদেশ ও বিদেশেবিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। এঁদের কয়েকজনের ছবি কমিউনিস্ট পার্টির পত্রিকা 'জনযুদ্ধ' ও 'পিপলস ওয়ার'-এ নিয়মিত প্রকাশিত হতো। 'ক্যালকাটা গ্রুপ'-এর পাশা-পাশি জয়নুল আবেদিন, চিত্তপ্রসাদ, সোমনাথ হোড় প্রমুখ শিল্পীরা তাঁদের স্কেচ ও ছবির মাধ্যমে সেদিন প্রকাশ করছিলেন দুর্ভিক্ষ ও যুদ্ধের ভয়াবহ দিক। এঁদের ছবিতে ক্ষুধার্ত ও পীড়িত মানুষই হয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রধান বিষয়বস্তু।

জয়নুল আবেদিন ছিলেন এঁদের মধ্যে সবচেয়ে প্রতিষ্ঠিত শিল্পী। সাঁওতাল পরগণায় চলে গিয়ে তিনি সাঁওতালদের জীবনযাপন পদ্ধতিগুলি স্কেচ করতে শুরু করেন এবং তাঁর ছবিতে ক্রমেই মানুষের জীবনসংগ্রামই প্রাধান্য পেতে থাকে। পরবর্তীকালে ১৯৪৩-৪৪ সালে একই আঙ্গিকে তিনি স্কেচ করেন বাঙলার দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষের। অপুষ্টি ও রোগের কবলে পিষ্ট মুমূর্ষু মানুষ তখন কলকাতার রাজপথ জুড়ে পড়ে থাকত। জয়নুল আবেদিন দ্রুত হাতে এই সব মানুষের স্কেচ করতেন। ফটোগ্রাফিক অভিব্যক্তি নয়, এর পরিবর্তে তাঁর এই ছবিগুলি হয়ে উঠেছিল তেরশ' পঞ্চাশ-এর মন্বন্তরের সবচেয়ে জীবন্ত দলিল।

আবেদিনের মতোই যুদ্ধ ও মন্বন্তরের বিরুদ্ধে শিল্পীর সামাজিক দায়বদ্ধতার নজির রেখেছিলেন চিত্তপ্রসাদ, মণি রায় ও সোমনাথ হোড়। সংবাদপত্রে প্রকাশিত সাধারণ রিপোর্টের তুলনায় এই ছবিগুলি প্রত্যক্ষভাবে ঘটনার ভয়াবহতা ব্যক্ত করে মানুষকে প্রবলভাবে নাড়া দিত এবং সচেতন করে তুলত। একই সঙ্গে থাকত কমিউনিস্ট-কর্মীদের ত্রাণের কাজের ছবিও। এইসব দেখে দর্শকেরা উদ্বুদ্ধ হতেন সামাজিক কর্তব্য পালনে। এইগুলি ছিল নিঃসন্দেহে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী প্রচার-আন্দোলনের অন্যতম প্রধান মাধ্যম।

পরবর্তীকালে আবেদিনের অনুপ্রেরণায় চিত্তপ্রসাদ এবং চিত্তপ্রসাদের অনু-প্রেরণায় সোমনাথ হোড় সমকালীন ঘটনার চিত্রায়ন থেকে গড়ে তোলেন নিজস্ব এক আঙ্গিক। এই আঙ্গিকে চিত্তপ্রসাদ সৃষ্টি করেন তাঁর লিনোকাট সিরিজ। শান্তি ও যুদ্ধ-বিরোধী মতাদর্শ থেকে চিত্তপ্রসাদ ভারতীয় শিশুদের রূপকল্পে সৃষ্টি করলেন 'যুদ্ধ-বিরোধী চিত্রকলা'। চট্টগ্রামের গণনাট্য আন্দোলনের কর্মী চিত্তপ্রসাদ ভট্টাচার্যকে আবিষ্কার করার কৃতিত্ব কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন সম্পাদক পি. সি. যোশী-র। তিনিই পার্টির মুখপত্র 'পিপলস্ ওয়ার'-এর অলঙ্করণ শিল্পীরূপে

তাঁকে বোম্বাইতে নিয়ে যান। চিত্তপ্রসাদের বলিষ্ঠ তুলিতে অতঃপর ফ্যাসিস্ত-বিরোধী চিত্রকলায় সংযোজিত হয়েছিল এক নতুন মাত্রা।

শিল্পী সোমনাথ হোড়ও ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের সদস্যরূপে জনযুদ্ধ-নীতির প্রচার কাজের অংশীদার হয়ে শুরু করেন তাঁর শিল্পীজীবন। তাঁর প্রথম দিকের ছবি 'শেখ গোমানি' ও 'রমেশ শীল' ছিল মূলত প্রতিকৃতি চিত্র। এঁরা দুজনেই ছিলেন সত্যিকার ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লোকশিল্পী। মন্বন্তরের নির্মমতা ও ভয়াবহতা সোমনাথ হোড়ের তুলিতে প্রচণ্ড এক ঘৃণার রঙে ফুটে উঠেছিল। রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়-এর মতে :

"চিত্তপ্রসাদ ও সোমনাথ হোড়ের পরবর্তীকালের শিল্পকর্ম লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে উভয় শিল্পীই ভিন্ন ভিন্ন নিজস্ব আঙ্গিক গড়ে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁদের কাছে আদর্শ হিসাবে উপস্থাপিত করা হয়েছিল 'জনযুদ্ধ' ও 'পিপ্‌লস্ ওয়ার'-এ ছাপা রুশ-শিল্পের নিদর্শন। পোস্টার জাতীয় এই সব ছবিতে রুশ-বিপ্লবের ঘটনা ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে বা প্রতিরোধের দৃশ্য দর্শককে উৎসাহিত করত। এই ছবিগুলিতে নাটকীয়ভাব পরিবেশিত হতো জনসভার দৃশ্যাবলীতে— লেনিন বক্তৃতা দিচ্ছেন বিশাল জনতার সামনে। উত্তোলিত লাল পতাকা দর্শকের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করছে এবং একই সঙ্গে মানুষের সংঘবদ্ধ প্রতিবাদের প্রতীক হিসাবে ছবিকে করে তুলছে বিশেষ অর্থবহ।

"রেড আর্মির যুদ্ধযাত্রার ছবিগুলিতে দেখা গেল অস্ত্রসজ্জিত মানুষ তাদের বন্দুক উঁচিয়ে ধরে সামনের ঘন অন্ধকার পটভূমির দিকে ধাবিত হচ্ছে। এখানে পশ্চাৎপট রচনা করছে গাঢ় নীল আকাশে ঘনায়মান কালো মেঘ, যা সূচিত করছে ফ্যাসিবাদের বিপদ। 'জনযুদ্ধ' ও 'পিপলস্ ওয়ার'-এ মুদ্রিত এই ছবিগুলি শুধু যুদ্ধ-বিরোধী প্রচারের জন্য নয়, সমকালীন দর্শকের কাছে বাস্তববাদী শিল্পের আদর্শ বলে উপস্থাপিত হ ।।"[৩৯]

যাহোক, 'ক্যালকাটা গ্রুপ' কোনো বিশেষ রাজনৈতিক ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ ছিলেন কিংবা রাজনীতির সঙ্গে তাঁদের সংস্রব ছিল কিনা—এ নিয়ে কিছুটা বিতর্ক রয়েছে। এই বিতর্ক তুলেছেন 'গ্রুপ'-এর অন্যতম প্রধান সদস্য প্রদোষ দাশগুপ্ত। বেশ কয়েকটি লেখায় তিনি 'ক্যালকাটা গ্রুপ'-এর বামপন্থী রাজনীতি-সচেতনতা ও ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের সঙ্গে তাঁদের প্রত্যক্ষ সংলগ্নতাকে অস্বীকার করার জন্য খুবই সচেষ্ট হয়ে ওঠেন। তাঁর নিজের বক্তব্যেই এ-প্রসঙ্গে তাঁর দ্বিধাদ্বন্দ্ব প্রকাশিত হয়েছে। সেই বক্তব্য নিম্নরূপ :

"সুভো, রথীন এবং আমি প্রায় সমবয়সী। রথীন (মৈত্র) কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুলের শিক্ষা শেষ করে দিল্লীর শিল্পী কানওয়াল কৃষ্ণের সঙ্গে স্টুডিও নিয়ে কিছুদিন একসঙ্গে কাজ করেছিল ১৯৪০-৪১ সালে। কোনও দিক থেকে কোনো সুযোগ সুবিধা না হওয়াতে স্টুডিও ছেড়ে দিয়ে ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের সভ্য ও পরে এই সংঘের কলা বিভাগের সচিবও

হয়েছিল শুনেছি। কিন্তু এই কলা বিভাগের সচিব হিসেবে রথীন কতখানি কী করতে পেরেছিল কলাক্ষেত্রে তা আমার জানা নেই।

"তবে এইটুকু জানি যে, ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের সঙ্গে রথীনের দাদা জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র এবং আমাদের ক্যালকাটা গ্রুপের শুভানুধ্যায়ীদের মধ্যে কেউ কেউ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন—যেমন কবি বিষ্ণু দে। তাই স্বভাবতই এরা খুবই সচেষ্ট ছিলেন আমাদের ক্যালকাটা গ্রুপকে ফ্যাসি-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের কলা বিভাগের শাখা হিসেবে ব্যবহার করতে। কিন্তু সেটা আমরা হতে দিইনি। এ বিষয়ে আমাদের মতামত খুব পরিষ্কার ছিল যে, আমরা কোনো দলে ভিড়বো না, বিশেষ করে রাজ-নৈতিক দলে। অবশ্য আমাদের ক্যালকাটা গ্রুপ গড়বার প্রথম দিকে, অর্থাৎ ১৯৪৩-৪৪-৪৫ এইরকম একটা ধারণা অনেকেরই ছিল যে আমাদের গ্রুপের সঙ্গে ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে।...এটা কি করে সম্ভব হলো তা আমি আজও ভেবে পাই না, যদিও আমাদের গ্রুপের যুগ্ম সচিবের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম। আর অন্যজন ছিল রথীন মৈত্র। রথীনকে আমরা চাঁদা তুলে আমাদের শিল্পকর্ম দিয়ে বম্বেতে পাঠিয়েছিলাম প্রদর্শনী করার জন্য, কিন্তু রথীন মনে হয় বিষ্ণু দে, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র তথা ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের প্রভাব এড়াতে পারেনি। তাই আমাদের গ্রুপের একটা বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল।"[৪০]

বস্তুত, শিল্প-সমালোচক মৃণাল ঘোষ তাঁর গবেষণামূলক এক প্রবন্ধে[৪১] অত্যন্ত সঠিকভাবেই মন্তব্য করেছেন যে, প্রদোষ দাশগুপ্তের এই উক্তিতে বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে ক্যালকাটা গ্রুপের সম্পর্কের প্রত্যক্ষতা বা পরোক্ষতার বিষয়টি মোটামুটি পরিষ্কার হয়ে যায়। গ্রুপের কিছু সদস্যের প্রবণতা ছিল বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকার, অধিকাংশ সদস্যেরই তা ছিল না। তাঁরা রাজনীতির দিক থেকে নিরপেক্ষ থাকতে চেয়েছিলেন। ক্যালকাটা গ্রুপের পৃষ্ঠপোষক, শুভানুধ্যায়ী ও শিল্প-সমালোচকদের মধ্যে এরকম দুটো ভাগ ছিল। কেউ মনে করতেন প্রগতিশীল রাজনীতি সচেতনতাতেই তাঁদের মুক্তি, কেউ মনে করতেন এতেই তাঁদের বদ্ধতা।

অর্থাৎ, স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, 'ক্যালকাটা গ্রুপে'র সকলেই 'ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে'র সদস্য বা সক্রিয় কর্মী ছিলেন না। কিন্তু তাই বলে এই গ্রুপের সঙ্গে লেখক ও শিল্পী সংঘের 'ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের' বিষয়টি অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু প্রদোষ দাশগুপ্ত সেই চেষ্টাই করেছেন। রথীন মৈত্র এক সাক্ষাৎকারে সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, তাঁদের চিত্রকলায় সমকালীন রাজনীতির প্রভাব পড়েছিল এবং রাজনৈতিক-সামাজিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তনের সঙ্গে তাঁদের মানস-চেতনাতেও পরিবর্তন ঘটেছিল। তাছাড়া 'ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও

শিল্পী সংঘে'র অফিস ৪৬ নম্বরে তাঁরা অনেকেই যাতায়াত করতেন। যেমন, সূর্য রায়, নীরদ মজুমদার, সুভো ঠাকুর, জয়নুল আবেদিন এমনকি ইন্দ্র দুগারও ঐ অফিসে যেতেন। তবে তিনি একথাও স্বীকার করেছেন যে, "তখনকার সাহিত্যিক সঙ্গীতকারদের ফ্রন্ট যেভাবে সাড়া তুলতে পেরেছে—চিত্র ও ভাস্কর্য-শিল্পীরা তা পারেনি।"[৪২]

অবশ্য এটা বলাও নিশ্চয় ভুল হবে যে, ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলন কিংবা 'জনযুদ্ধের নীতি'র প্রচারে সংগঠিতভাবে সৌভ্রাতৃত্ব প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই এই 'ক্যালকাটা গ্রুপে'র জন্ম হয়েছিল। রাজনৈতিক মতাদর্শভিত্তিক কোনো শিল্পচিন্তা নয়— প্রধানত নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইউরোপীয় আধুনিক শিল্পের প্রকরণ-পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাই ছিল ক্যালকাটা গ্রুপের শিল্পীদের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু নীরদ মজুমদার,[৪৩] প্রণবরঞ্জন রায়[৪৪] এবং শোভন সোম তাঁদের সাক্ষাৎকার বা রচনায় যেসব বক্তব্য তুলে ধরেছেন, অর্থাৎ 'ক্যালকাটা গ্রুপ'কে 'প্রগতিশীল শিল্প-আন্দোলনের সঙ্গে এক করে দেখা ঠিক নয়'—এই অভিমতও মানা যায় না। কারণ, এই গ্রুপের মধ্য থেকেই আমরা নীরদ মজুমদার, সুভো ঠাকুর, রথীন মৈত্র, গোপাল ঘোষ, প্রাণকৃষ্ণ পালের মতো শিল্পীদের পেয়েছিলাম, যাঁরা তাঁদের চিত্রকলা ও শিল্প-চেতনাকে সমসাময়িক প্রগতিশীল রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের পক্ষেই সচেতনভাবে ব্যবহার করেছিলেন। না হলে, ময়মনসিংহের নেত্রকোণায় অনুষ্ঠিত সারা ভারত কিষাণ সম্মেলনের মঞ্চসজ্জার জন্য নীরদবাবু যাবেন কেন?[৪৫] [দ্র. বাঙালী সংস্কৃতির রূপ/গোপাল হালদার]

এ-কথা সত্য যে, এঁদের মধ্যে হয়তো কেউ কেউ মাত্র কিছুকালের জন্য এই আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন, কিন্তু ক্ষণকালের জন্য হলেও তাঁরা ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনে এবং সাম্রাজ্যবাদ ও মন্বন্তরের বিরুদ্ধে তাঁদের দায়িত্ব যথাসাধ্য পালন করে গেছেন। সুতরাং 'ক্যালকাটা গ্রুপে'র একাংশের এই ইতিবাচক ভূমিকাকে এবং ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনে তাঁদের অবদানকে অস্বীকার করার অর্থ হলো ইতিহাস চেতনাকেই অস্বীকার করা।

সপ্তম অধ্যায়

জনযুদ্ধ-পর্যায় : ফ্যাসিস্ত-বিরোধী গণআন্দোলন

১. প্রেক্ষাপট :

১৯৪১ সালের ২২শে জুন নাৎসী বাহিনীর ঝটিকা আক্রমণ নেমে আসে সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর। সেই দিন থেকেই ভারতে ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য 'সোভিয়েত সুহৃদ্ সংঘ' গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ১৯৪১-এর ২১শে জুলাই কলকাতার টাউন হলে 'সোভিয়েত দিবস' উপলক্ষে শ্রমিক ও ছাত্রদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় এক বিরাট জনসভা। ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। সভায় স্থির হয় যে, সোভিয়েত সুহৃদ্ সমিতি গঠন করতে হবে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটি কমিটি গঠিত হয়। এর কর্ণধার হন ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এবং যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত হন—হীরেন মুখার্জি ও স্নেহাংশুকান্ত আচার্য। ঐ বছরের ১৬ই নভেম্বর সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কলকাতায়। এই সময় বাঙলা কমিটির সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত হন জ্যোতি বসু।

ইতিমধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি ডিসেম্বর মাসেই গ্রহণ করে জনযুদ্ধের লাইন। ফলে, সোভিয়েত সুহৃদ্ সমিতির মধ্য দিয়েই পার্টি ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলন সংগঠিত করার কাজ প্রাথমিকভাবে শুরু করে দেয়। সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির বাঙলা কমিটির সঙ্গে প্রথম দিকে নিয়মিত যোগাযোগ স্থাপিত হয় চব্বিশ পরগণা, হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান, বাঁকুড়া, রংপুর, ময়মনসিংহ, জলপাইগুড়ি, খুলনা, নোয়াখালি প্রভৃতি জেলার শাখা সমিতিগুলির। যশোহর, মুর্শিদাবাদ, চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর, ফরিদপুর, ঢাকা ও নদীয়া জেলাতেও অতঃপর জেলা সমিতি গঠিত হয়। কলকাতা মহানগরীতে কাজের সুবিধার জন্য গঠন করা হয় উত্তর, দক্ষিণ, মধ্য ও পূর্ব এই চারটি আলাদা কমিটি। সাধারণ প্রচারকার্য ছাড়াও ১৯৪২-এর প্রথম ছয়মাস ধরে জেলায় জেলায় ফ্যাসিস্ত-বিরোধী সভা ও সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে থাকে। এইসব সভা এবং সম্মেলনে যোগদানের অপরাধে বহু ফ্যাসিস্ত-বিরোধী কর্মীকে গ্রেপ্তার বরণ করতে হয়, এমনকি বহুক্ষেত্রে সম্মুখীন হতে হয় ফ্যাসিস্ত-সমর্থক রাজনৈতিক দলের আক্রমণেরও। কিন্তু সোমেন চন্দ-র হত্যাকাণ্ডের পর (৮ই মার্চ, ১৯৪২) সোভিয়েত সুহৃদ্ সমিতির আন্দোলন দ্বিগুণ বেগে প্রসারিত হতে থাকে। এই সময় সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার সম্পাদিত 'অরণি' পত্রিকায় (সাপ্তাহিক) প্রতিটি সংখ্যায় থাকত ফ্যাসিস্ত-বিরোধী সভা-সম্মেলনের বিবরণ।

এক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এইসব সভা-সমিতি শুধুমাত্র নগরকেন্দ্রিক ছিল না। 'অরণি', 'জনযুদ্ধ' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত 'আন্দোলনের খবর' থেকে দেখা যায় সুদূর গ্রামাঞ্চলেও বিপুল উৎসাহ আর উদ্দীপনার সঙ্গেই অনুষ্ঠিত হয়েছে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী সভা-সম্মেলন এবং এগুলিতে জনতার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণও খুবই লক্ষণীয় ব্যাপার ছিল।[১]

সমগ্র বাঙলায় এইভাবে প্রায় এক বছর ধরে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনকে সংগঠিত করার পর ১৯৪২ সালের ২৪শে জুন কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে একটি ফ্যাসিস্ত-বিরোধী সভা হয়। ২১শে জুন থেকেই এজন্য প্রচার-অভিযান চলতে থাকে। শহরের বিভিন্ন এলাকায় সভা, বৈঠক ও মিছিলের আয়োজন করা হয়। শ্রমিক ও ছাত্রের দল রাস্তাঘাট মুখরিত করে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী ধ্বনি দিতে থাকে। ২১শে জুন অনুষ্ঠিত শ্রদ্ধানন্দ পার্কের সভায় ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও অধ্যাপক গোপাল হালদার ছিলেন প্রধান বক্তা। পরদিন সভা হয় হাজরা পার্কে। সভাপতিত্ব করেন সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির বাঙলা কমিটির সম্পাদক জ্যোতি বসু। ট্রাম শ্রমিকেরা ওয়েলিংটন স্কোয়ারের সভা সেরে মিছিল করে হাজরা পার্কে সমবেত হন। ছাত্ররাও ব্যাপকভাবে এই সভায় মিছিল করে যোগ দেয়। ২৪শে জুন অনুষ্ঠিত হয় প্রধান সভাটি। বিকেল তিনটার সময় ওখানেই হয় একটি চিত্র-প্রদর্শনীর উদ্বোধন। সোভিয়েতের অগ্রগতি এবং যুদ্ধজয়ের সংবাদচিত্র এই প্রদর্শনীতে দেখানো হয়। স্পেনের ফ্যাসিস্ত-বিরোধী যুদ্ধের কয়েকটি পোস্টারও এই প্রদর্শনীতে ছিল। হলে তিল ধারণেরও স্থান ছিল না। সভাপতিত্ব করেন বাঙলার তৎকালীন অর্থমন্ত্রী, হিন্দুমহাসভার নেতা ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।[২]

অবশ্য এর পূর্বেই ১৬ই মার্চ সোমবার থেকে ২১শে মার্চ শনিবার পর্যন্ত (১৯৪২) বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভা, বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন, বঙ্গীয় লেবার পার্টি প্রভৃতি গণসংগঠনগুলি কলকাতায় ও বাঙলাদেশের সর্বত্র 'জাপ-আক্রমণ প্রতিরোধ সপ্তাহ' পালনের নির্দেশ দিয়েছিল এবং তা উৎসাহ সহকারেই পালিত হয়।[৩]

১৯৪২ সালের মে মাস থেকে সারা ভারতে ছয় মাসব্যাপী এক কর্মসূচীর ভিত্তিতে শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র ও মহিলাদের মধ্যে ফ্যাসিবিরোধী ব্যাপক আন্দোলন ও সংগঠন গড়ে ওঠে। শ্রমিকরা বিভিন্ন কল-কারখানায় দাবি তোলেন—নিজ নিজ ইউনিয়ন শক্তিশালী করো। নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস থেকে ডাক আসে—বন্দীদের মুক্তি চাই, জাতীয় সরকার গঠন করে যুদ্ধপ্রস্তুতির মধ্যমে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন সুনিশ্চিত করো, শ্রমিক ছাঁটাই চলবে না, কাজের ঘণ্টা কমাও, চাকরি পাকা হওয়া চাই, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির অনুপাতে মজুরি বৃদ্ধি চাই, এ.আর.পি. পাকা শেলট্যার চাই, প্রতি কারখানায় খাদ্য মজুত রাখতে হবে, প্রত্যেক মহল্লা-বস্তিতে টিউবওয়েল চাই, শ্রমিকদের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী কৃষকগ্রামের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সমস্ত ফ্যাসিবাদ-বিরোধী শ্রমিক নেতা ও অন্যান্য জাতীয় কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি চাই, সভা-সমিতি ও শোভাযাত্রার উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা

প্রত্যাহার করতে হবে ইত্যাদি। এইসব দাবিগুলি বাঙলার চটকল মজুর, ট্রাম ও ইঞ্জিনিয়ারিং শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে।

সারা ভারত কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বিহারের বিহ্‌টায়। আসাম, পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, অন্ধ্র, উত্তর প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, বাঙলা প্রভৃতি প্রদেশ থেকে প্রতিনিধিরা এই সম্মেলনে যোগ দেন। ১৯৪২ সালের ২৯শে থেকে ৩১শে মে এই সম্মেলনে নানা বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়। যুদ্ধের সমস্যাসহ কৃষকদের বিভিন্ন সমস্যাই আলোচনায় মুখ্য স্থান অধিকার করে। সভাপতি ইন্দুলাল যাজ্ঞিক প্রতিটি কৃষক সমিতিকে কৃষক-ফৌজে পরিণত করার আহ্বান জানান। এই সম্মেলনের বিভিন্ন প্রস্তাবে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জনে কৃষকদের কর্তব্য, জমি দাও—কাজ দাও, বকেয়া খাজনা আদায় বন্ধ রাখো, আমাদের হাতে অস্ত্র দাও, অস্ত্র-আইন শিথিল করো প্রভৃতি দাবি উত্থাপিত হয়। ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সম্মেলন রূপে এই কৃষক সম্মেলন স্মরণীয় হয়ে আছে।

এই সময়কালে ছাত্র সম্মেলন থেকেও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট রণধ্বনি তোলা হয়। ১৩ই মে কলকাতার ছাত্ররা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে 'বন্দীমুক্তি কনভেনশন' করেন। ১৫ই মে দিল্লীতে সর্বভারতীয় ছাত্র কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সভামঞ্চে পঞ্জাবের এম. এল. এ. সোহন সিং জোশ, ডাঃ আস্রফ, সজ্জাদ জহির, বি. পি. এল. বেদী, রজনী প্যাটেল প্রমুখ কমিউনিস্ট ও সদ্যমুক্ত ছাত্র-নেতারা উপবিষ্ট ছিলেন। ভারতের জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করে বন্দীদের মুক্ত এবং জাতীয় সরকার গঠন করার জন্য ব্রিটিশ শাসকদের বাধ্য করতে হবে, আর এই পথে ফ্যাসিজমকেও পরাস্ত করতে হবে—এই প্রস্তাবটি দিল্লীতে ছাত্ররা ঐক্যবদ্ধ-ভাবে গ্রহণ করেন। কমিউনিস্ট নেতা সরোজ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন: "ইতিপূর্বে ছাত্ররা পাটনা কনভেনশনে ফ্যাসিজমকে পরাস্ত করার জন্য জনযুদ্ধের সংকল্প গ্রহণ করলেও দিল্লী সম্মেলনেই সারা ভারতের ছাত্রসমাজ একটা সুনির্দিষ্ট পথ দেখতে পেল।"[৪]

একইভাবে সারা দেশের বিভিন্ন প্রদেশে নারীদেরও সভা-সমিতি শুরু হয়। বিশেষ করে বাঙলাদেশে নারীদের সংঘবদ্ধ করে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি গঠন করার প্রস্তাব নেওয়া হয়। প্রতিটি জেলায় অতঃপর মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি গঠিত হতে থাকে।

এইভাবে শ্রমিক-কৃষক-মহিলা-ছাত্র-লেখক-শিল্পী প্রভৃতি সমাজের সকল শ্রেণীর বিভিন্ন অংশের দ্বারা আয়োজিত সভা-সমিতি ও সম্মেলন থেকে আওয়াজ ওঠে: শ্রমিকদের মাইনে বাড়াতে হবে; ছাঁটাই চলবে না; মহার্ঘভাতা দিতে হবে; জাতীয় ঐক্য চাই; জাতীয় সরকার গঠন করে ফ্যাসিবাদকে রুখতে হবে; পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করো; বন্যা ও দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলে খাজনা ও ঋণ আদায় স্থগিত রাখো; চাষের বীজ ও সার বিনামূল্যে দিতে হবে; জনরক্ষা সমিতি গড়ে তোলো; মহিলাদের আত্মরক্ষা সমিতি চাই; সভাসমিতির উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার

করো ; ছাত্রছাত্রীদের এ. আর. পি. শিক্ষা দিতে হবে ; এ. আর. পি. ও পাকা শেলট্যারের ব্যবস্থা করো ; ছাত্রদের বেতন হ্রাস করো ; সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি চাই। মোট ষোল দফা দাবির উপর ভিত্তি করে সারা ভারতে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়ে যায়।[৫] বলাবাহুল্য, কমিউনিস্ট পার্টিই ছিল ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এই আন্দোলনের মূল চালিকাশক্তি।

১৯৪২ সালের ৮ই মে (২৫শে বৈশাখ) রবীন্দ্র-জন্মদিবসে বাঙলার বুকে প্রথম ফ্যাসিস্ত জাপানের বোমাটি নিক্ষিপ্ত হয়। চট্টগ্রামে সেই জাপ-বোমার আঘাতে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনের ইতিহাসে তৃতীয় শহীদে পরিণত হন ডকশ্রমিক নেতা গোলাম শরীফ।[৬] এরপর ২২শে জুলাই কমিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয় এবং ১লা আগস্ট কলকাতার রাজপথে কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে প্রথম প্রকাশ্যে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। টাউন হলের সমাবেশের পূর্বে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে উত্তোলিত লালঝাণ্ডার উদ্দেশে জানানো হয় রক্তিম অভিবাদন। অতঃপর এক বিশাল শোভাযাত্রা রওনা হয় টাউন হলের দিকে। পার্টির প্রধান ফেস্ট্‌নটির দুপাশে বিশাল রক্তপতাকা কাঁধে নিয়ে মিছিল পরিচালনা করেন আবদুর রেজ্জাক খাঁ ও বঙ্কিম মুখার্জি। কমিউনিস্ট পার্টির নামে অত বড় বিশাল শোভাযাত্রা দেখে কলকাতার মানুষ সত্যিই সেদিন বিস্মিত হয়ে যায়।[৭] এর মাত্র সাত মাস পরেই ১৯৪৩ সালের ১৮ই থেকে ২১শে মার্চ অনুষ্ঠিত হয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম প্রকাশ্য প্রাদেশিক সম্মেলন (তৃতীয় সম্মেলন)। এই সম্মেলনে বিভিন্ন জেলা থেকে ১৮৬ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন। প্রাদেশিক সম্পাদক নির্বাচিত হন ভবানী সেন। সম্পাদকমণ্ডলীতে ছিলেন মুজফ্‌ফর আহমদ, সরোজ মুখার্জি, খোকা রায় (সুধীন), সোমনাথ লাহিড়ী, রণেন সেন, নৃপেন চক্রবর্তী। এই সময় বাঙলা প্রদেশে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য সংখ্যা ছিল মাত্র তিন হাজারের কিছু বেশি।[৮]

১৯৪৩ সালের প্রারম্ভেই সমগ্র বাঙলাদেশে শুরু হয় খাদ্যাভাব। গ্রামে-গঞ্জে-শহরে সর্বত্র হাহাকার ধ্বনিত হতে থাকে। নিরন্ন, অনাহারক্লিষ্ট, কঙ্কালসার লক্ষ লক্ষ মানুষ শুধু একটু 'ফ্যান'-এর আশায় শহরের রাজপথে মুখ থুবড়ে পড়ে শুধু মৃত্যুরই প্রতীক্ষা করে। বাঙলার সর্বত্রই কুকুর-বিড়ালের মতো মরতে থাকে গ্রামীণ কৃষকসমাজ। গবেষকদের গবেষণা থেকে জানা গেছে, পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকশ্রেণী বা শহরের চাকুরিজীবী মধ্যবিত্তশ্রেণী অসুবিধার সম্মুখীন হলেও মনুষ্যসৃষ্ট এই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের প্রধান আঘাত এসে লাগে গ্রামীণ কৃষক-জনতার উপর। এই মন্বন্তরে যে ৩০ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল তাদের প্রায় সমগ্র অংশটাই ছিল গ্রামীণ কৃষকশ্রেণীভুক্ত। 'দুর্ভিক্ষ কমিশন'-এর সদস্য নানাবতী এই অভিমতই ব্যক্ত করেছেন।[৯]

পঞ্চাশের মন্বন্তর ভারতের অনিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির উপর যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া রূপেই দেখা দেয়। এই দুর্ভিক্ষ ছিল নিঃসন্দেহে মনুষ্যসৃষ্ট। আবহমানকাল ধরে ভারতে

দুর্ভিক্ষ হয়েছে প্রাকৃতিক কারণে, খরা অথবা বন্যার ফলে। কিন্তু ১৯৪৩ সালে প্রকৃতি তেমন বিরূপ ছিল না, চালের উৎপাদনে যেটুকু ঘাটতি ছিল তা পূরণ করাও একেবারে অসম্ভব ছিল না। তবু বাঙলার প্রায় ৩০ লক্ষ অসহায় মানুষকে অনাহারে প্রাণ দিতে হলো মনুষ্যসৃষ্ট এই দুর্ভিক্ষের নির্মম থাবায়।

যুদ্ধকালীন চারটি বছরে ভারতে যে-বিপুল পরিমাণ অর্থ লগ্নী করা হয়েছিল, তার অনিবার্য ফল হলো মুদ্রাস্ফীতি এবং দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি। একদিকে যেমন যুদ্ধপ্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত একশ্রেণীর লোকের হাতে যথেচ্ছভাবে বিপুল পরিমাণ টাকা জমতে থাকল, অন্যদিকে তেমনি উৎপাদক ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে পণ্যদ্রব্য মজুত করে বাজারে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টির মাধ্যমে মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়ে মুনাফা সংগ্রহের প্রবণতাও প্রবল হয়ে উঠল। এইভাবেই কালোবাজারীদের অশুভ চক্রজালে জড়িয়ে পড়ল বাঙলার অসহায় মানুষ।

যাহোক, খাদ্যের যোগান যতদিন মোটামুটি স্বাভাবিক ছিল ততদিন সঙ্কট তেমন তীব্র হয়নি। কিন্তু বাঙলার কৃষিক্ষেত্রের সীমাবদ্ধতা ক্রমশই তার ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য খাদ্য যোগাতে অক্ষম হয়ে পড়েছিল। এদিকে যুদ্ধের প্রয়োজনে সেনাবাহিনীর ও যুদ্ধপ্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকদের জন্য খাদ্যের চাহিদা বাড়তেই থাকে। বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানি করেই এই চাহিদা কোনমতে মেটানো হচ্ছিল। কিন্তু ব্রহ্মদেশ জাপানের হাতে চলে যাওয়ার ফলে এই আমদানিও বন্ধ হয়ে যায়। শুধু ব্রহ্মদেশ নয়, চাল উৎপাদনকারী সমগ্র পূর্ব এশিয়াই চলে যায় জাপানের হাতে। এর ফলে বাঙলায় এক সর্বগ্রাসী আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকার এ সম্পর্কে ছিল সম্পূর্ণ উদাসীন। অসামরিক জনসাধারণের জন্য খাদ্য সরবরাহের কোনো ব্যবস্থাই তারা অবলম্বন করেনি।

এছাড়াও জাপ-সেনাবাহিনীর গতিরোধ করার জন্য বাঙলার সরকার পূর্ব বাঙলায় যে পোড়ামাটি নীতি অবলম্বন করে, তার প্রয়োজনীয়তার দিকটিও তারা জনগণকে বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছিল। এই নীতিকে সফল করার জন্য জনগণের মধ্যে যে রাজনৈতিক চেতনা ও সহযোগিতার মনোভাব থাকা দরকার ছিল, সেই সময় পূর্ব বাঙলার নিরক্ষর কৃষকদের ভিতর সেটারও খুবই অভাব ছিল। প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার, কমিউনিস্ট পার্টির ফ্যাসিস্ত-বিরোধী প্রচার-আন্দোলন তখনো গ্রামীণ কৃষক-জনতার উপর ততটা প্রভাব বিস্তার করে উঠতে সক্ষম হয়নি। তাই সরকার যখন সীমান্ত-এলাকা থেকে খাদ্য ও নৌকা সরিয়ে নিতে লাগল তখন বাঙলার মানুষ এই ব্যবস্থার অর্থ বুঝতে না পেরে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশঙ্কায় খাদ্য মজুত করতে থাকল। দুর্নীতি-গ্রস্ত ব্যবসায়ীরাও গ্রহণ করল এই অবস্থার সুযোগ। ফলে, দুর্ভিক্ষের করালগ্রাসে বাঙলা প্রায় শ্মশানে পরিণত হলো। এই সর্বনাশা ধাক্কায় বাঙলার গ্রাম্য অর্থনীতি তছনছ হয়ে যায়, পারিবারিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে এবং সামাজিক নৈতিকতা ও মূল্যবোধ অতলে তলিয়ে যায়; অপরদিকে সরকারের অনুগ্রহপুষ্ট মুষ্টিমেয় বৃহৎ

ব্যবসায়ীগোষ্ঠী ধান-চালের মজুতদারী ও চোরাকারবার করে বাঙলার লক্ষ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে গড়ে তোলে মুনাফার পাহাড়।

ইতিহাসের সাক্ষ্য থেকে জানা যাচ্ছে, এই ভয়াবহ পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময়-কালেই কমিউনিস্ট পার্টিই সর্বাগ্রে বাঙলার অসহায়, অনাহারক্লিষ্ট মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। যে-প্রতিক্রিয়ার শক্তি (ভারতের ব্রিটিশ সরকার ও তার অনুগ্রহভাজন ব্যবসায়ীসমাজ) বাঙলার বুকে ঐ বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছিল, কমিউনিস্ট পার্টি একদিকে যেমন জনগণের সামনে তাদের মুখোশ খুলে দিতে ব্যাপক প্রচার অভিযান চালিয়েছিল, অন্যদিকে তেমনি বাঙলার দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের প্রাণ বাঁচাবার জন্য অর্থ, খাদ্য, বস্ত্র প্রভৃতি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পার্টির সদস্যেরা গ্রহণ করেছিল এক সক্রিয় ভূমিকা। সব থেকে বড় কথা, মন্বন্তর মোকাবিলার লড়াইকে এই সময় কমিউনিস্টরা ফ্যাসিস্ত-বিরোধী সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করে তাঁদের ঈপ্সিত পথে চলতেও সক্ষম হয়েছিল।

ইতিমধ্যে বাঙলার বুকের উপর ফ্যাসিস্ত জাপানের বোমারু বিমানের বোমাবর্ষণও শুরু হয়ে যায়। একদিকে ভয়াবহ মন্বন্তর, অপরদিকে জাপ-বোমা-বর্ষণ—এই উভয় সঙ্কটে সাধারণ মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়ে। ২০শে ডিসেম্বর (১৯৪২) কলকাতায় প্রথম জাপ-বোমা বর্ষিত হয় হাতীবাগান ও খিদিরপুর অঞ্চলে। এরপর ১৫ই জানুয়ারির মধ্যে মোট ছয়বার কলকাতার বুকে জাপানীরা বোমা বর্ষণ করে। কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক কমিটির মুখপত্র 'জনযুদ্ধ' পত্রিকা এই সময় এক উল্লেখযোগ্য ফ্যাসিস্ত-বিরোধী ভূমিকা পালন করেছিল।

১৫ই জানুয়ারি ষষ্ঠ জাপ-আক্রমণের সময় রাত দশটায় কলকাতার উত্তরাঞ্চলে দুটি বোমা শ্রমিক কোয়ার্টারের উপর পড়ে। ফলে, কয়েকজন শ্রমিক হতাহত হন। সরকারী বিবৃতিতে জানানো হয় : 'আমাদের (ব্রিটিশ) জঙ্গী বিমানগুলি জাপ-বোমারু বিমানগুলিকে তাড়িয়ে দিয়েছে…ক্ষতির পরিমাণ তুচ্ছ…সামান্য কয়েকজন কুলী হতাহত হয়েছে' ইত্যাদি। এই পরিপ্রেক্ষিতে 'জনযুদ্ধ' পত্রিকায় এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে শ্রমিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলা হয়—বাঙলার মজুর! নতুন আঘাত রোখো! জাপানী বোমাই হোক, আর মালিক বা আমলা-তন্ত্রের আক্রমণই হোক, বাঙলার বীর মজুর এ সমস্ত আক্রমণ প্রতিহত করার শক্তি রাখে। ঐ দিনের 'জনযুদ্ধে'ই দুটি সংবাদ-চিত্র প্রকাশ করে বোমাবর্ষণ-জনিত ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ প্রকাশিত হয়। এই দুটি চিত্রের শিরোনাম ছিল "জাপানী বোমা গরীবের কুঁড়েই ভাঙ্গে—খড়ের গাদায় আগুন জ্বালায় আর আমলাতন্ত্র বলে সামান্য 'কুলী' মরিয়াছে! যাহারা তাহার ঘর ভাঙ্গিয়াছে, আগুন জ্বালিয়াছে, বাংলার চাষী-মজুর তাহাদের ক্ষমা করিবে না। চাষী-মজুররাই বোমার জবাব দিবে। আমলাতন্ত্রের তাচ্ছিল্য চূর্ণ করিবে। মালিকদের ষড়যন্ত্র ধ্বংস করিবে।"[১০]

৭ই এপ্রিল (১৯৪৩)-এর এক হিসাব থেকে দেখা যাচ্ছে বাঙলায় জাপ-বিমান আক্রমণ উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছিল। বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রাম শহর

এলাকা, কক্সবাজার ও ফেণী শহর এলাকায় এই বোমাবর্ষণ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অবশ্য জাপ-ফ্যাসিস্তদের এই নগ্ন আক্রমণের ফলেই বাঙলার জনমানসে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী কমিউনিস্টদের প্রচার ক্রমশই দাগ কাটতে থাকে এবং সাধারণ মানুষকে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনে আরও অধিক সংখ্যায় সামিল করা সম্ভব হয়। এমনকি ফরওয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি যেসব জাপ-সমর্থক রাজনৈতিক দল সেসময়ে বাঙলায় কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত ছিল, তারাও বেসামরিক জনগণের উপর জাপানী বোমাবর্ষণে হতভম্ব হয়ে পড়ে, কারণ এতদিন পর্যন্ত তারা প্রচার করেছিল জাপ-বিমান কখনোই ভারতীয় জনগণের উপর বোমা ফেলবে না, তারা ভারতীয়দের মিত্র।

এই সব কিছুর প্রেক্ষাপটেই বাঙলায় সংগঠিত হয় ফ্যাসিস্ত-বিরোধী গণ-আন্দোলনের এক ব্যাপক ভিত্তি। জনযুদ্ধের যুগে প্রধানত কমিউনিস্ট পার্টিই ছিল এই ফ্যাসিস্ত-বিরোধী জনজাগরণের মূল উৎস। কমিউনিস্ট প্রভাবিত বিভিন্ন গণসংগঠনগুলি—যেমন শ্রমিক, কৃষক, মহিলা, ছাত্র-যুব, এমনকি কিশোরবাহিনীকে পর্যন্ত জনযুদ্ধের যুগে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে দেখা যায়। সুতরাং শুধুমাত্র সাহিত্য বা সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের আন্দোলন নয়, ফ্যাসিস্ত-বিরোধী সংগ্রামে বাঙলার সংগঠিত অন্যান্য গণসংগঠনের ভূমিকাও কোনো অংশে কম ছিল না।

২. সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলন ও ফ্যাসিস্ত-বিরোধিতা :

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা থেকেই সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (A.I.T.U.C)-এর নেতৃত্বে ভারতবর্ষের শ্রমিকশ্রেণী তাদের দাবিদাওয়া সংক্রান্ত আন্দোলনকে জোরদার করে তোলে। বিশেষকরে যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে এই আন্দোলনের মূল ধারা ছিল ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী। কিন্তু পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট পার্টি 'জনযুদ্ধে'-র নীতি গ্রহণ করার ফলে ১৯৪২ সাল থেকেই বাঙলা তথা ভারতবর্ষের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়। শ্রমিকদের দাবি-সংক্রান্ত আন্দোলনের ধারা তখনও পর্যন্ত অব্যাহত থাকলেও যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে যাতে কোনো অচলাবস্থা সৃষ্টি না হয় তার জন্যও কমিউনিস্ট-প্রভাবিত ট্রেড ইউনিয়নগুলি সচেষ্ট ছিল। তবে এটা অবশ্যই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এম. এন. রায় প্রভাবিত 'ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়ান লেবর' ব্রিটিশ সরকারের অর্থানুকূল্যে যেভাবে শ্রমিকস্বার্থ সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে ব্রিটিশ যুদ্ধপ্রচেষ্টাকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেছে, সেই জাতীয় কাজ কমিউনিস্ট-প্রভাবিত ট্রেড ইউনিয়নগুলি কখনোই করেনি। বস্তুত, রায়পন্থী 'ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়ান লেবর'কে ব্রিটিশ সরকার ১৯৪২ সালে 'সবচেয়ে বেশি' প্রতিনিধিত্বমূলক বলে স্বীকৃতি দেয়। ব্রিটিশ সরকারের আর্থিক সাহায্যে এবং জাতীয়তাবাদী ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের গ্রেপ্তারের ফলেই ফেডারেশনের কলেবর দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ১৯৪২ সালে বাঙলায় ২৮,৯২৭ জন সদস্য

সম্বলিত ২৬টি ইউনিয়ন ফেডারেশনের অনুমোদন পায়। ১৯৪৩ সালে ঐ সংখ্যা দাঁড়ায় যথাক্রমে ৮৫,৯১৮ জন ও ৬২টি ইউনিয়ন। কিন্তু একটুও অতিরঞ্জিত না করেই বলা যায়, শ্রমিকদের মধ্যে ফেডারেশন সম্পর্কে ধারণা আদৌ ভালো ছিল না।[১১]

অন্যদিক থেকে দেখা যায়, ১৯৪২ সালে যখন জনযুদ্ধে-র নীতি ঘোষিত হয়েছে এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (B.P.T.U.C)-এর নেতৃত্ব যখন কমিউনিস্টদের হাতে, তখনও কিন্তু তারা শ্রমিক আন্দোলনের নিজস্ব গতিবেগকে থামিয়ে দেয়নি। যুদ্ধ চলছিল বলে দরকষাকষির পাল্লাটি শ্রমিকশ্রেণীর দিকেই ঝুঁকেছিল একথা সত্যি এবং এরফলে বহু স্থানেই ধর্মঘট-আন্দোলনের পথে না গিয়েও দাবি-দাওয়া আদায় করাটা সুবিধাজনক হয়েছিল। কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয় নি, সেসব ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট শ্রমিকনেতাদের নেতৃত্বেই শ্রমিকরা দাবি-আদায়ের আন্দোলন অব্যাহত রেখেছিল। এরকম কয়েকটি শ্রমিক আন্দোলন হলো :

১) ১৯৪২-এর জানুয়ারিতে হেস্টিংস জুটমিলের ৪,৪০০ শ্রমিকের ধর্মঘট।

২) ১৯৪২-এর ফেব্রুয়ারিতে এ্যাণ্ডরু ইয়ুল মিলের ১৫,০০০ শ্রমিকের ২৫% বেতনবৃদ্ধির দাবিতে ধর্মঘট।

৩) ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারিতে কলকাতা কর্পোরেশনের ৮,০০০ শ্রমিকের ধর্মঘট।

৪) ১৯৪২-এর অক্টোবরে ভার্তিয়া কারখানার ১,৬০০ শ্রমিকের বোনাসের দাবিতে ধর্মঘট।

৫) ১৯৪২-এর ডিসেম্বরে মহার্ঘভাতার দাবিতে পোর্ট কমিশনার অফিসের ১,০০০ কর্মচারীর ধর্মঘট।

৬) ১৯৪২-এর মে মাসে ট্রাম শ্রমিক ধর্মঘট।

এছাড়াও এই সময়কালেই অন্যান্য ধর্মঘটের মধ্যে গজলভাই জুট মিলস, লরেন্স জুট মিলস, হুকুমচাঁদ জুট মিলস ও ক্যালকাটা জুট মিলের ধর্মঘট ছিল উল্লেখযোগ্য।

যুদ্ধের সময় সংগঠিত শ্রমিকদের প্রধান দাবি ছিল দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সূচক অনুসারে মহার্ঘভাতা প্রদান। ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে শতকরা ৫০ ভাগ মহার্ঘভাতার দাবিতে বি. পি. টি. ইউ. সি সারা বাঙলায় শ্রমিক সমাবেশ সংগঠিত করে। তাদের দাবির মধ্যে কারখানায় রেশনিংব্যবস্থা চালু করার দাবিও ছিল।[১২]

চটকল, রেল প্রভৃতি অন্যান্য সংস্থার শ্রমিকদের মধ্যেও প্রবল আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। ১৯৪৩ সালের জানুয়ারি মাস থেকে পাঁচ মাস ধরে রেল শ্রমিকদের আন্দোলন খুব জোরদার হয়ে ওঠে। ২৯শে মার্চ ঢাকার রেল শ্রমিকরা আন্দোলন করে প্রতি মণ বারো টাকা সাত আনা হারে দশ সের চাল প্রত্যেকের জন্য আদায় করতে সক্ষম হয়। এই সময় বি. এ্যাণ্ড এ. রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক জ্যোতি বসু রেল মজুরদের কাছে আহ্বান জানান—সমস্ত শ্রমিকশ্রেণীর

সঙ্গে একসাথে রেলের মজুরদেরও এগিয়ে আসতে হবে মহার্ঘভাতার দাবি, জাতীয় ঐক্য ও বন্দীমুক্তির দাবিকে জোরদার করার আন্দোলনে। 'জনযুদ্ধে'র পাতায় এই আবেদন প্রকাশিত হয়।[১৩]

এই সময় যেসব কমিউনিস্ট নেতা শ্রমিক আন্দোলনকে সুসংহত, সুসংগঠিত ও সুপরিকল্পিতভাবে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন দায়িত্ব প্রাপ্ত হন, তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন ডাঃ রণেন সেন, জ্যোতি বসু, ইন্দ্রজিত গুপ্ত, নেপাল নাগ, মহম্মদ ইসমাইল ও আবদুল মোমিন। এঁরা প্রয়োজন মতো বঙ্কিম মুখার্জি এবং সোমনাথ লাহিড়ীর সাহায্য ও পরামর্শ গ্রহণ করতেন।

শ্রেণী-ভিত্তিক নিজস্ব দাবি-দাওয়াকে কেন্দ্র করে বাঙলার জঙ্গী শ্রমিক আন্দোলনের এই উত্তাল তরঙ্গের পাশাপাশি চলছিল শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠনগুলির সচেতন ফ্যাসিবাদ-বিরোধিতাও। সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হওয়ার পর ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে কমিউনিস্টদের ভূমিকা কি হবে এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যুদ্ধ-সম্পর্কে কমিউনিস্টদের দৃষ্টিভঙ্গি কি, সেই বিষয়ে কানপুরে অনুষ্ঠিত এ. আই. টি. ইউ. সি-র উনবিংশতিতম সম্মেলনের প্রাক্কালে অনুষ্ঠিত সাধারণ পরিষদের সভায় ১৯৪২ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারি বঙ্কিম মুখার্জির উত্থাপিত ব্যাখ্যামূলক প্রস্তাবটিকে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ একটি দলিল রূপে গণ্য করা যেতে পারে। এই দলিলের 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ নয় : সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্য, নিজের জন্য জনযুদ্ধে বিজয়ী হোন'—শীর্ষক পরিচ্ছেদে বলা হয়েছিল :

> "ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণী ও ভারতের জনগণকে আজ পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমস্ত প্রগতিশীল শক্তিগুলির হিটলারী ফ্যাসি-বাদের বিরুদ্ধে বিজয় হলো এদেশে স্বাধীনতা ও পূর্ণ গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত। এখন গ্রেট ব্রিটেনের পরাজয় সাম্রাজ্যবাদকে দুর্বল করবে না বরং সোভিয়েত ইউনিয়নেরও পরাজয় ঘটাবে, যা হবে শ্রমিকশ্রেণী ও পৃথিবীর নিপীড়িত মানুষের উপর অচিন্ত্যপূর্ব দুর্বিপাক। অপরপক্ষে হিটলারী ফ্যাসিবাদের বিজয়ের অর্থ হবে গ্রেট ব্রিটেনসহ সর্বত্র চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির বিজয় ও শক্তিবৃদ্ধি, সুতরাং তার ফলে আমাদের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম সাংঘাতিক-ভাবে পিছিয়ে যাবে। সেই কারণেই ভারতীয় জনগণের ও ভারতীয় শ্রমিক-শ্রেণীর স্বার্থ আজ দাবি করে যে, হিটলারী ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় সুনিশ্চিত করার জন্য তাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে শক্তি সংহত করে কার্যকরী, অবাধ ও স্বেচ্ছায় এই জনযুদ্ধে অংশগ্রহণ করা উচিত।"

'ব্রিটিশ নীতি : মূল বাধা'—শীর্ষক অংশে বলা হয় :

"...এ. আই. টি. ইউ. সি এবং তার সঙ্গে যুক্ত ইউনিয়নগুলি এমন কি বর্তমান সরকারের এই যুদ্ধ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধেও আর বৈরী বা অসহযোগিতা বা নিরপেক্ষতার নীতি চালাতে পারে না। অন্যদিকে এ. আই. টি. ইউ. সি জানে যে, এটা সম্পূর্ণরূপে অপর্যাপ্ত। ভারতীয় জনগণের আস্থাভাজন এক সরকারের

দ্বারা পরিচালিত যুদ্ধ-প্রচেষ্ট যদি হতো তবে তারা যা করতে পারত, বর্তমান স্বেচ্ছাচারী, অত্যাচারী ও অপ্রিয় সরকার তার এক কণাও করতে পারে না। হিটলারী ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সমগ্র জনগণের যুদ্ধে বিজয়কে নিশ্চিত করতে যা প্রয়োজনীয় তা হলো এই যুদ্ধে ভারতের সম্পদ ও জনশক্তির পূর্ণ প্রয়োগ। কিন্তু তার পথে প্রধান বাধা হলো ব্রিটিশ সরকারের নীতি—ভারতের স্বাধীনতার অধিকার, পূর্ণ গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা ও জনপ্রিয় সরকার গড়ার অধিকারের প্রত্যাখ্যান।"

'যুদ্ধজয়ের জন্য সংগ্রাম করুন : দাবিসনদ' শীর্ষক অংশে বলা হলো :

"…সুতরাং এ. আই. টি. ইউ. সি যুদ্ধের প্রতি তার নিঃশর্ত সমর্থন জানাচ্ছে এবং ঘোষণা করছে যে, এই যুদ্ধের দ্রুত ও পূর্ণ বিজয়ের জন্য প্রয়োজন ভারতের পূর্ণ, কার্যকরী ও ঐচ্ছিক অংশগ্রহণ এবং আজ তাতে যে বাধাগুলি আছে তার অপসারণের জন্য সংগ্রাম। এজন্য এ. আই. টি. ইউ. সি তার অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়ন, শ্রমিকশ্রেণীকে আহ্বান জানাচ্ছে নিম্নবর্ণিত ন্যূনতম দাবিসমূহ আদায়ের জন্য গণ-আন্দোলন ও সংগ্রাম গড়ে তুলতে :

ক) ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার অধিকার স্বীকার করতে হবে।

খ) সমস্ত রাজবন্দী ও শ্রমিক-কৃষক কর্মী যাঁরা শ্রমিক, কৃষক বা রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য দণ্ডিত বা আটক আছেন তাঁদের সকলকে মুক্তি দিতে হবে।

গ) গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যুদ্ধকালীন যে-সমস্ত আইনে বাক-স্বাধীনতার, মত প্রকাশের, সংগঠনের, আন্দোলনের, ধর্মঘটের, গণ-বাহিনী গড়ে তোলার অধিকার হ্রাস করা হয়েছে—তা তুলে নিতে হবে।

ঘ) জনগণের বিশ্বাসভাজন, জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত জাতীয় সরকারের হাতে কেন্দ্রের ক্ষমতা দিতে হবে এবং তাঁদের হাতে যুদ্ধ পরিচালনা সমেত সমস্ত সরকারী ক্ষমতা অর্পণ করতে হবে।

ঙ) প্রদেশগুলিতে জনপ্রিয় সরকারের পুনঃপ্রবর্তন করতে হবে।

চ) যুদ্ধের প্রয়োজনে, জনগণের প্রয়োজনে ও প্রতিরক্ষার কারণে শিল্প-বিকাশের বাধাগুলি দূর করতে হবে।"

এছাড়াও এই দাবি সনদে শ্রমিক ও কৃষকদের বেশ কিছু অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়াও স্থান পেয়েছিল। 'শ্রমিকদের প্রতি আবেদন' শীর্ষক অংশে বলা হয়েছিল :

"এ. আই. টি. ইউ. সি তার অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়ন ও শ্রমিকদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে যে কংগ্রেস বা সরকারের ব্যবস্থা নেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা না করতে। বরং সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীকেই শ্রমিক ও জনসাধারণের মধ্যে এই সনদের প্রচার করতে হবে, উদ্যোগ নিতে হবে, কাজে নামতে হবে এই পথকে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় করে তোলায়। দৃঢ়ভাবে ও খোলাখুলি আমাদের

শ্রমিকদের কাছে বলতে হবে যে, সোভিয়েত ও ব্রিটেনের জনসাধারণের এই যুদ্ধ আমাদেরও যুদ্ধ। এ এমন এক যুদ্ধ, যাতে জনগণকে তাদের নিজেদের স্বার্থেই জিততে হবে। আমরা চাই এই যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে হাজার গুণ বাড়াতে। আর তাই আমরা এই সনদের জন্য লড়ছি।…

"আমরা জবরদস্তি যুদ্ধপ্রচেষ্টার বিরোধী কিন্তু আমরাই উদ্যোগ নেব ক্রমবর্ধমান যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় বিশেষত উৎপাদনে, ইউনিয়নের স্বীকৃতিতে, কারখানায় কারখানায় কমিটিগুলিতে ও আমাদের জরুরী দাবিগুলিতে। আমরা শ্রমিকদের যুদ্ধ-প্রচার সংগঠিত করব যাতে সোভিয়েতের জনগণের তুলনাহীন বীরত্ব, অধিকৃত দেশগুলির সংগ্রামী মানুষের স্বাধীনতার লড়াই, ব্রিটেন ও আমেরিকার শ্রমিকরা যুদ্ধজয়ের জন্য যে উদ্যোগ নিচ্ছে তাকে হিটলারী ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে জনগণের যুদ্ধে বিজয়ী হওয়া নিশ্চিত করে তুলতে জনপ্রিয় করা যায়।"

এরপর এস. এ. ডাঙ্গের সভাপতিত্বে ১৯৪৩ সালে শুরু হয় নাগপুরে 'নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে'র অধিবেশন (৩০ শে এপ্রিল—৩ রা মে)। বিগত বছরে কংগ্রেসে প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত ছিলেন ১৬৮ জন। কিন্তু ১৯৪৩-এ প্রতিনিধি এসেছিলেন আরো অনেক বেশি। মোট শ্রমিক সদস্যের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল তিন লক্ষেরও বেশি। বলা যায়, কমিউনিস্ট পার্টির আধিপত্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সংগঠনে। নাগপুর অধিবেশন থেকে শ্রমিকশ্রেণীর কাছে আহ্বান জানানো হয়: জাতীয় ঐক্য ও জাতীয় সরকার গঠন করতে হবে। 'জনযুদ্ধে'-র নীতিই এই রাজনৈতিক প্রস্তাবে বেশি প্রতিফলিত হয়। রাজনৈতিক প্রস্তাবের পক্ষে ভোট পড়ে ৪২৪টি আর বিপক্ষে ১৯২ টি। তবে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের নিয়মানুযায়ী রাজনৈতিক প্রস্তাব পাস করতে হলে তিন-চতুর্থাংশ ভোটের প্রয়োজন ছিল। তাই এই রাজনৈতিক প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। যদিও কমিউনিস্ট প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে শ্রমিকদের কাছে ঐ আবেদনই রাখা হয়।[১৪]

এ. আই. টি. ইউ. সি-র সর্বভারতীয় নেতৃত্বের এই আহ্বানে সাড়া দেন বাঙলার শ্রমিকশ্রেণী। ফ্যাসিবাদ-বিরোধী প্রচারে, বন্দীমুক্তির আন্দোলনে ও জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে তারা সোচ্চার হয়ে ওঠেন। শ্রমিক-নেতা আব্দুল মোমিন এই সময়ে শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির কাছে যে-রিপোর্ট পেশ করেন তা খুবই তাৎপর্যব্যঞ্জক। এই রিপোর্টে বলা হয়:

"এই প্রথম আমরা শ্রমিকদের কাছে সরাসরি রাজনীতি নিয়ে যাবার সুযোগ পেলাম। যে সমস্ত ইউনিয়ন ও অঞ্চলে আমাদের প্রভাব আছে সেই সমস্ত স্থানে আমরা সভা করেছি, গান্ধীজীর বিনাশর্তে ও অবিলম্বে মুক্তি দাবি করে আমরা প্রস্তাব গ্রহণ করেছি। বড়লাটের কাছে তার পাঠিয়েছি। সব দলকে একত্র করে মুক্তির দাবি করবার জন্য জিন্না সাহেবকে অনুরোধ করেছি। এই পদ্ধতিতে স্থানীয়ভাবে আমরা যাঁদের পরিচালনা করতে পেরেছি

তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য : চেঙ্গাইল, ঘুসুড়ি, রিষড়া, গৌরীপুর, জগদ্দল, বজবজ, মেটিয়াবুরুজ, কাদাপাড়া, নারকেলডাঙ্গা, ভিক্টোরিয়া ও শ্যামনগর চটকলের শ্রমিক, মার্টিন, পোর্ট ইঞ্জিনিয়ারিং, গার্ডেনরীচ লোহা কারখানা, শ্রীরামপুর, নদীয়া, ঢাকার সুতাকল শ্রমিক, বি. এ্যাণ্ড এ. রেলওয়ে এবং বি. ডি. আর শ্রমিক (বাঁকুড়া), সিলেটের ইলেকট্রিক ও মিউনিসিপ্যাল শ্রমিক, কলকাতার পৌর-জমাদার সমিতি, ক্রুকবণ্ড কারখানা, গ্যাস ও কাশীপুর ইলেকট্রিক শ্রমিক। ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউট হলে যে শ্রমিক-সভা হয় তাতে আটশত ট্রাম শ্রমিক যোগ দেন। এই হচ্ছে সর্বপ্রথম আমরা সোজাসুজি আমাদের পার্টির রাজনীতি শ্রমিক সাধারণের কাছে হাজির করলাম। আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠকরা সর্বপ্রথম পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও সাহসের সাথে মাগ্‌গী ভাতা, খাদ্য, এ. আর. পির দাবির সঙ্গে রাজনীতির প্রধান স্লোগানগুলি শ্রমিকদের কাছে উপস্থিত করেছেন। সর্বত্র আমরা আশাতীত সাড়া পেয়েছি। 'প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন, পরে রাজনীতি'—এই ধারণার পরিবর্তন ঘটানো হলো। দেশরক্ষার জন্য জাতীয় গভর্নমেন্ট, কংগ্রেস-লীগ আপস, জাতীয় ঐক্য, গান্ধাজী ও অন্যান্য নেতৃবর্গের মুক্তির দাবি প্রভৃতি দাবিতে জাতীয় ঐক্য সপ্তাহ পালনে শ্রমিকশ্রেণী ব্যাপকভাবে এগিয়ে এলেন।"[১৫]

১৯৪৩ সালে সারা বছরব্যাপী এবং ১৯৪৪ সালের প্রথম ছয়মাস বাঙলার শ্রমিকশ্রেণী তাদের অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনে এবং মন্বন্তরের প্রতিরোধে, দুভিক্ষপীড়িত মানুষের সাহায্যে ব্যাপক অভিযান শুরু করে। রেল, ট্রাম, চটকল এবং কটন মিলের শ্রমিকেরা এই আন্দোলনেসব থেকে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল। এ. আই. টি. ইউ. সি-র উদ্যোগে শ্রমিকরা ব্যাপকভাবে নিজস্ব ইউনিয়নগুলির নেতৃত্বে লঙ্গরখানা খুলে অনাহারক্লিষ্ট মানুষদের খাদ্য সরবরাহ করে। এই কাজে অংশগ্রহণ করেছিল ট্রাম, ইঞ্জিনিয়ারিং, চটকল, পরিবহণসহ প্রায় সমস্ত শিল্পের শ্রমিকবৃন্দ। তাঁরা সাংস্কৃতিক স্কোয়াড গঠন করে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী প্রচার ও সাহায্য-সংগ্রহ অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এরকম দুটি উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক স্কোয়াড তৈরি হয়েছিল ট্রাম এবং কর্পোরেশন শ্রমিকদের উদ্যোগে।[১৬]

সেই সময় বাঙলার শ্রমিক আন্দোলনে যে নতুন জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল তা কমিউনিস্ট পার্টির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। ১৯৪৪ সালের মার্চ মাসে কলকাতা কর্পোরেশনের যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাতে কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থীরাই সব থেকে বেশি ভোট পেয়ে জয়ী হন। শ্রমিককেন্দ্রে দু'জন কমিউনিস্ট প্রার্থী—সোমনাথ লাহিড়ী ও মহম্মদ ইসমাইল সর্বাধিক ২১,০০৫ ভোট লাভ করেন। অপরদিকে বিরোধীরা পায় মোট ৭৫৬৯টি ভোট।[১৭] এর দ্বারাই বোঝা যায় যে, শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলন এবং কমিউনিস্ট পার্টির জনযুদ্ধের নীতি কতখানি পরিব্যাপ্ত হতে পেরেছিল।

৩. ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনে কৃষকসভার ভূমিকা :

সারা ভারত কৃষকসভার বাঙলা কমিটিতেও কমিউনিস্ট পার্টির আধিপত্য এবং নিয়ন্ত্রণ ছিল প্রশ্নাতীত। সমগ্র ভারতেই কৃষকসভায় বামপন্থীদের প্রভাব ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে কৃষকসভার নেতৃত্বে কৃষি-সংক্রান্ত দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন ক্রমেই জোরদার হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরেই সারা ভারত কৃষকসভার প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় অন্ধ্রপ্রদেশের পলাসায়। সভার এই পঞ্চম অধিবেশন বসে মার্চ, ১৯৪০-এ। এই সম্মেলনেই যুদ্ধ সম্বন্ধে কৃষকসভা তার নীতি নির্ধারণ করে। পলাসাসম্মেলনের রাজনৈতিক প্রস্তাবে শান্তির প্রয়োজনে কৃষকেরা শ্রমিকদের সঙ্গে মিলিতভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মুক্তিসংগ্রাম শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয়। তাছাড়া সেই সঙ্গে দেশীয় রাজা, জমিদার ও মহাজনদের বিরুদ্ধে দৈনন্দিন সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ারও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ একটি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, তাই এই যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় কোনোরূপ সমর্থনই কৃষকসভার ছিল না। সর্বভারতীয় সম্মেলনের এই গাইড লাইন অনুসারেই প্রাদেশিক কৃষক সভার (বাঙলা) চতুর্থ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় যশোহর জেলার পাঁজিয়া গ্রামে। প্রায় বে-আইনী অবস্থায় পুলিশী দমনপীড়ন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনেরও মূল সুর ছিল সংগ্রাম করা ও যুদ্ধপ্রচেষ্টায় সামিল না হওয়া।[১৮]

নাৎসী জার্মানী কর্তৃক সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হওয়ার পরেই যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়। ২২শে জুন (১৯৪১) সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হয় আর এক সপ্তাহের মধ্যেই ২৯শে জুন 'সারা ভারত কৃষক সভা'-র অস্থায়ী সাধারণ সম্পাদক, সাহিত্যিক গোপাল হালদার 'যুদ্ধের পরিবর্তিত অবস্থা ও কর্তব্য' সম্পর্কে এক দীর্ঘ আবেদনমূলক বিবৃতি প্রকাশ করেন। 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' এই বিবৃতির যে বয়ান প্রকাশিত হয়েছিল তার অংশবিশেষ নিম্নরূপ :

"…২১ মাস পূর্বে যখন যুদ্ধ আরম্ভ হয় তখন আমরা, ভারতের কৃষাণ ও মজুরগণ, সুস্পষ্টভাবেই আমাদের অভিমত জ্ঞাপন করি। যুদ্ধের প্রারম্ভ হইতেই আমরা ইহার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছিলাম। ভারতের পরিস্থিতিতেও তাহার স্বরূপ অভ্রান্তভাবেই অভিব্যক্ত হইয়াছিল। কিষাণ সভার পালাসা অধিবেশনে এবং নিঃ ভাঃ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে কিষাণ ও মজুরগণ যতদূর সম্ভব সুস্পষ্টভাবেই তাহাদের মনোভাব প্রকাশ করিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বলিয়া আমরা ফ্যাসিস্ত-বিরোধী, সুতরাং ফ্যাসিস্তবাদ অথবা সাম্রাজ্যবাদ উভয়ের মধ্যে কোনোটিরই প্রভাব বৃদ্ধিতে আমরা উদাসীন থাকতে পারি না।

"মহাযুদ্ধের গতি সম্প্রতি যেভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে তাহাতে আমাদের নীতি ও কর্মসূচী পুনরায় ঘোষণা করার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে। কেননা, স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে যে, পৃথিবীর একমাত্র সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের উপর এই

অতর্কিত আক্রমণের ফলে যুদ্ধ সম্পর্কে মনোভাব পরিবর্তিত হইয়াছে।···

"আমরা জানি যে, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র হইতেছে শ্রমিক ও কৃষকদের রাষ্ট্র। ইহা সমাজতন্ত্রীদের দেশ। অত্যাচারিত জাতিগুলির উদ্ধারসাধনই ইহার কার্য। কাজেই আন্তর্জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদের আশ্রয় হিসাবে ইহাই হইতেছে শান্তি ও প্রগতির কেন্দ্রস্থল। সোভিয়েটকে রক্ষা করা, কৃষক ও শ্রমিকের পক্ষে আত্মরক্ষারই তুল্য।···

"যুদ্ধের ঐতিহাসিক অধ্যায় শুরু হইয়াছে। এই সময় আন্তর্জাতিক শ্রমিক ও কৃষকের ন্যায় আমাদিগকেও পরিবর্তিত অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইবে।"[১৯]

আমরা জানি, ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে জাপান যুদ্ধে যোগ দেয়। যুদ্ধের বিপদ ভারতবর্ষের পূর্বসীমান্তে উপস্থিত হয়। ১৯৪২-এর ফেব্রুয়ারিতে নাগাপুরে কেন্দ্রীয় কৃষক কাউন্সিল এই যুদ্ধকে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী যুদ্ধ এবং স্বাধীনতার যুদ্ধরূপে ঘোষণা করে। এই সময় থেকেই কৃষকসভার কর্মীরা কৃষকদের মধ্যে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী প্রচারের উপর বিশেষ জোর দিতে থাকেন। [কৃষকসভার নলিতাবাড়ি সম্মেলনের রিপোর্ট, ১৯৪৩, দ্রষ্টব্য]।

এরপর থেকেই ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত 'জাপানকে রুখতে হবে' এই স্লোগান তুলে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলন ব্যাপকভাবে শুরু হয়ে যায়, বিশেষকরে পূর্ববঙ্গের জেলাগুলিতে। সর্বত্র কৃষকদের মধ্যে দেশপ্রেম জাগিয়ে তুলে দেশরক্ষার জন্য তাদের প্রস্তুত করার চেষ্টা চলতে থাকে। সেইজন্য কৃষক-ভলান্টিয়ার সংগ্রহ করে 'জনরক্ষা বাহিনী' গঠনের কাজকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। সারা বাঙলায় প্রায় ৩০০ জনরক্ষা কমিটি গঠন করে ৫০ হাজার কৃষক-ভলান্টিয়ার সংগ্রহ করা হয়। কৃষকদের মুখে নতুন রচিত দেশরক্ষার গানও শুনতে পাওয়া যায় [হাট-গোবিন্দপুর সম্মেলনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য]।

জাপানী আক্রমণের আশঙ্কায় ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ১৯৪২ সালের ১লা মে তারিখে 'ডিনায়্যাল পলিসি' ঘোষণা করে। ত্রিপুরা (এখন কুমিল্লা) জেলার চাঁদপুর থেকে বরিশাল ও খুলনা জেলা সহ ২৪ পরগণা জেলার বসিরহাট ও ডায়মণ্ড-হারবার মহকুমা হয়ে মেদিনীপুর জেলার খড়্গপুর পর্যন্ত বিস্তৃত দক্ষিণের সমগ্র সমুদ্র-উপকূলবর্তী এলাকায় দশজন ও তার বেশি যাত্রী বহনের উপযোগী সমস্ত নৌকা সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়। বহু নৌকা জলেও ডুবিয়ে রাখা হয়। ফলে, প্রয়োজনীয় খাদ্য ও অন্যান্য মাল চলাচলের কাজ বিশেষভাবে বাধাপ্রাপ্ত ও ক্ষতি-গ্রস্ত হয়। নৌকাগুলির মালিক ও মাঝিরা এর জন্য যে ক্ষতির সম্মুখীন হয় সেই ক্ষতি-পূরণের দাবি জানিয়ে কৃষকসভা আন্দোলন করেছিল। 'ডিনায়্যাল পলিসি' প্রত্যাহৃত হয় ১৯৪৩-এর জুন মাসে।[২০]

১৯৪৩ সালে সমগ্র বাঙলা ভয়াবহ দুটি দুর্যোগের কবলে পড়ে। প্রথমটি মনুষ্যসৃষ্ট পঞ্চাশের মন্বন্তর এবং দ্বিতীয়টি ১৬ই অক্টোবরের (১৯৪৩) প্রলয়ঙ্করী প্রাকৃতিক বিপর্যয়। এই প্রাকৃতিক বিপর্যয় ছিল সমুদ্রের ভয়ঙ্কর তরঙ্গোচ্ছ্বাস জনিত ঘটনা।

ওই দুর্যোগের কবলে প্রাণ হারায় প্রায় ১৫,০০০ মানুষ ও দু'লক্ষ পশু। মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণার প্রায় ৪ হাজার বর্গমাইল এলাকার ২৫ লক্ষ অধিবাসী নিদারুণ ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়। চাষাবাদ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়, পানীয় জলের অভাবও শুরু হয়। অন্যান্য অনেক প্রতিষ্ঠানের মতোই কৃষকসভাও 'সাইক্লোন রিলিফ কমিটি' নাম দিয়ে একটি অদলীয় রিলিফ কমিটি গঠন করে এবং সাহায্যের আবেদন জানায়। প্রাদেশিক কৃষকসভার সাধারণ সম্পাদক আবদুল্লাহ রসুলকে এই কমিটির সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়। উল্লেখযোগ্য যে, এই কমিটিই পরের বছর পুনর্গঠিত হয়ে সাধারণ ও স্থায়ী রিলিফের জন্য 'পীপলস রিলিফ কমিটি' নাম গ্রহণ করে। মন্বন্তর প্রতিরোধ ও ফ্যাসিস্ত-বিরোধী প্রচারেও কৃষকসভার স্বেচ্ছা-সেবকেরা সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ডোমার (রংপুর, ১৯৪২) এবং নলিতাবাড়ি (ময়মনসিংহ), ফুলবাড়ি (দিনাজপুর) ও হাটগোবিন্দপুর (বর্ধমান)—এই তিন সম্মেলনেই (ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম—১৯৪৩—'৪৪—'৪৫) কৃষকদের অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী প্রচারকার্য সংগঠিত করারও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশে প্রায় প্রত্যেক জেলায় কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে থাকে এবং সেখানেও উক্ত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে জেলার কাজের প্রোগ্রাম নির্ধারিত হয়। উক্ত জেলা সম্মেলনগুলিতে পূর্বের তুলনায় অধিক সংখ্যক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

১৯৪৪ সালের ১৩ই মে থেকে ১৫ই মে পর্যন্ত অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক কৃষক কাউন্সিলের এক সভায় সাংগঠনিক দিকগুলি সহ আন্দোলনগত নানা বিষয়েই বিস্তৃত আলোচনা হয়। অতঃপর এই প্রসঙ্গে এক সাংগঠনিক পত্রে (১লা জুন, ১৯৪৪) বলা হয়;

> "মেডিকেল ও অন্যান্য রিলিফ, গ্রাম্য-জীবন পুনঃপ্রতিষ্ঠা, ফসল বাড়ানো, মজুত বিরোধী ও খাদ্য বরাদ্দের জন্য আন্দোলন, সম্মেলন, সভ্য সংগ্রহ এবং কৃষক সমিতির সংগঠনকে শক্তিশালী করিবার প্রচেষ্টা—এই সবের ভিতর দিয়াই বর্তমানে জেলায় জেলায় কৃষক আন্দোলনের কাজ চলিতেছে।···জেলাগুলিতে বিশেষ করিয়া এই (রিলিফ) কাজের ভিত্তিতে কৃষক সমিতি প্রসার লাভ করিতেছে।"[২১]

সংগঠিতভাবে কৃষক আন্দোলন পরিচালনার জন্য, ফ্যাসিস্ত-বিরোধী প্রচার-কার্য এবং ত্রাণ ও মজুতখাদ্য উদ্ধারের কাজ চালানোর জন্য এই সময় 'কৃষক বাহিনী' গঠন সম্পর্কেও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ঠিক করা হয়, কমপক্ষে ১৮ বছর বয়স্ক ও সপ্তাহে অন্তত একদিন কাজ করতে ইচ্ছুক যে-কোনো ব্যক্তি কৃষক-বাহিনীর অঙ্গীকারপত্র মেনে নিলে বাহিনীতে যোগদান করতে পারবে। প্রত্যেক গ্রামে অন্তত ১০ জন ভলান্টিয়ার নিয়ে একটি স্কোয়াড গঠিত হবে, প্রত্যেক ইউনিয়নে অন্তত ৩০, মহাকুমায় অন্তত ২১০ ও জেলায় অন্তত ৫০০ ভলান্টিয়ার নিয়ে কৃষক বাহিনী গঠিত হবে। প্রত্যেক ভলান্টিয়ারকে প্রাদেশিক অফিস থেকে

কাস্তে-হাতুড়ি চিহ্নিত ও 'কৃষক বাহিনী' লিখিত ব্যাজ দেওয়া হবে। প্রত্যেক পরিবার থেকে অন্তত একজন কৃষককে কৃষক বাহিনীতে যোগ দেবার জন্য আহ্বান জানানো হয়। এছাড়া প্রচারমূলক কাজে সাহায্যের জন্য 'কৃষকসভা'র নিজস্ব সাংস্কৃতিকগোষ্ঠী 'কৃষ্টি বাহিনী'গড়ে তোলারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। [দ্র. সাংগঠনিক পত্র, ১ লা জুন, ১৯৪৪]।[২২]

প্রকৃতপক্ষে, এই সময়ে কৃষকসভা-পরিচালিত আন্দোলন ও সম্মেলনগুলি কেবলমাত্র অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও সভা যথেষ্ট পরিমাণে সক্রিয় ছিল। 'জনযুদ্ধ' পত্রিকার মাধ্যমে এই সময় কৃষকনেতা আবদুল্লাহ রসুল বাঙলার কৃষকসমাজের কাছে এক উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে বলেন :

"রাজনীতিতে বাঙলার কৃষকদের এগিয়ে আসতে হবে। কৃষকরা জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারছেন—জাতীয় নেতাদের মুক্তি চাই, কংগ্রেস-লীগ একতা চাই, জাতীয় সরকার কায়েম করতে হবে। 'জনযুদ্ধে'র রাজনীতি ধীরে ধীরে কৃষকদের মধ্যে প্রচারিত হয়েছে। কৃষক সমিতির পক্ষ থেকে বিভিন্ন রাজনীতিক দাবিতে আন্দোলন-মিটিং-মিছিল করার ফলে দারুণ সাড়া জাগছে গ্রামে গ্রামে। দেশের রাজনৈতিক সঙ্কটের সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক সঙ্কট—ভাত-কাপড়ের সঙ্কট কৃষক সমাজকে জেরবার করে ফেলেছে। দেশময় হাহাকার। লুটপাট নয়, সংগঠিত সম্মিলিত আন্দোলনের পথেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে সঙ্কট সমাধান করতে। দেশের আর্থিক ও রাজনৈতিক সঙ্কটের সমাধানের আন্দোলনে বাঙলার কৃষকরা এবার বিশেষ অংশগ্রহণে অগ্রসর হয়েছে। গ্রামে গ্রামে 'জনযুদ্ধ' পত্রিকা নেবার ব্যবস্থা করুন। কৃষকরা কিভাবে কাজ করবেন, কি আন্দোলন করবেন তার নির্দেশ পাবেন এই 'জনযুদ্ধে'র মাধ্যমে—একথা সকলে স্মরণে রাখবেন।"[২৩]

তৎকালীন প্রাদেশিক কৃষকসভার নেতৃত্বে আবদুল্লাহ রসুল ছাড়াও অন্যান্য যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন : মনসুর হবিব, বগলা গুহ, অবনী লাহিড়ী, ভবানী সেন, বিভূতি গুহ (দিনাজপুর), রণধীর দাশগুপ্ত (চট্টগ্রাম), শচীন ঘোষ ও সুধীর মুখার্জী (রংপুর), মণি সিং (ময়মনসিংহ), আব্দুর রেজ্জাক খাঁ, বঙ্কিম মুখার্জি, মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ প্রমুখ। এই সময় নেতৃত্বের আহ্বানে জেলায় জেলায় বিভিন্ন দাবিতে কৃষক আন্দোলন ব্যাপকভাবে শুরু হয়ে যায়। জেলা ও মহকুমা থেকে বিভিন্ন কৃষক সম্মেলন ও আন্দোলনের বহু রিপোর্ট পার্টি ও প্রাদেশিক কৃষকসভার দপ্তরে আসতে থাকে। সেই রিপোর্টগুলি সংক্ষিপ্ত আকারে ৩ রা ও ১০ ই মার্চের 'জনযুদ্ধে' প্রকাশিত হয়।

কৃষকসভার উদ্যোগে যে 'কৃষক বাহিনী' বা স্বেচ্ছাসেবক দল তৈরি করা হয় তাদের উপর বিভিন্ন দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল। রংপুর জেলার কৃষকসভা ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। এদের উদ্যোগে গঠিত রংপুরের কৃষক-জনরক্ষা স্বেচ্ছাসেবক

বাহিনী ছিল গোটা বাঙলার কৃষকদের কাছে আদর্শস্থানীয়। এরা যেসব দায়িত্ব পালন করত তা হলো :

১) হাটে পাহারা দিয়ে দর-নিয়ন্ত্রণ ও ধান-রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ করা।

২) বিমান আক্রমণের বিরুদ্ধে ব্লাক আউট ও শেলট্যার-ব্যবস্থা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করা।

৩) মহাজনদের গোপন করা লুকানো চাল উদ্ধার করে জনসাধারণের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত দরে বিক্রয় করা।

৪) রেশনিং-ব্যবস্থা পরিচালনা এবং খাদ্যসরবরাহ ও উৎপাদন-ব্যবস্থা বজায় রাখা।

৫) ব্যাপক জাপ-বিরোধী প্রচার ও গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করা।[২৪]

আন্দোলনের ইতিহাস থেকে জানা যায়, সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে কৃষকসভা স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। উপরোক্ত যেসব দায়-দায়িত্ব 'কৃষক বাহিনী' পালন করত, প্রত্যক্ষভাবে না হলেও তার সবগুলিই অন্তত পরোক্ষভাবে ছিল 'ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান সহায়ক কাজ। এর একটি উদাহরণ রংপুর জেলা থেকেই দেওয়া যায়। রংপুরের বহু স্থানে শিমুল গাছের কাঁটা তুলে তাতে 'কাস্তে-হাতুড়ি-তারা' ও 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি' কথাটি খোদাই করে নিয়ে ব্লক তৈরি করা হতো এবং তা দিয়ে কৃষকদের মধ্যে কুপন ব্যবস্থায় সোভিয়েতকে সাহায্যের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করা হতো। কৃষককর্মীগণ অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গেই এই সব কাজ করতেন।[২৫] এছাড়া কৃষক সম্মেলনগুলি ছিল ফ্যাসিস্ত-বিরোধী সাংস্কৃতিক কর্মসূচী প্রচার করারও অন্যতম প্রধান মাধ্যম। এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনে কৃষকসভার ভূমিকা ছিল যথেষ্টই গুরুত্বপূর্ণ।

৪. ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনে বাঙলার ছাত্রসমাজ :

বাঙলায় ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনের সংগঠিত উদ্যোগ যে-সময় থেকে শুরু হয়, সেই সময় থেকেই বাঙলার ছাত্রসমাজের এক অগ্রণী অংশ ছিল এই আন্দোলনের অংশীদার। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল প্রতিভাবান ছাত্র যেভাবে 'ইয়ুথ কালচারাল ইনস্টিট্যুট' গঠনের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও ফ্যাসিস্ত-বিরোধিতায় অগ্রসর হয়েছিলেন, সেই বৃত্তান্ত পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। একথা সত্য, 'ওয়াই. সি. আই-'এর আন্দোলনে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং সীমাবদ্ধতা ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে বাঙলার ছাত্রদের ঐ সেরা অংশটিই ৪৬ নম্বর ধর্মতলা স্ট্রীটকে কেন্দ্র করে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী সাংস্কৃতিক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তেও দ্বিধা করেননি।

এই পরোক্ষ ভূমিকা ছাড়াও নিজস্ব সংগঠনের পতাকাতলে দাঁড়িয়ে বাঙলার ছাত্রসমাজের এক বৃহৎ অংশ ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত ফ্যাসিস্ত-বিরোধী প্রচার, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন এবং বাঙলায় মন্বন্তর ও মহামারী

প্রতিরোধের প্রত্যক্ষ কর্মসূচীতেও সামিল হয়েছিল।

নিঃসংকোচে বলা যায়, এ-ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন (B. P. S- F)। কমিউনিস্ট মতাদর্শে পরিচালিত এই ছাত্র-সংগঠনটি ছিল সে-সময় বাঙলার বৃহত্তম ছাত্র-সংগঠন। কংগ্রেস, ফরওয়ার্ড ব্লক, সোস্যালিস্ট পার্টি পরিচালিত ও সমর্থিত ছাত্রসমাজ যখন 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলনের উগ্র জাতীয়তাবাদী জোয়ারে ভাসমান এবং ব্রিটিশের শত্রু বলে 'জাপ-ফ্যাসিস্ত' আগ্রাসনকারীদের অন্ধ সমর্থক, তখন সেই জটিল রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে দাঁড়িয়ে যুগপৎ উগ্র জাতীয়তাবাদী ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের মোকাবিলা করেই বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনকে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলন পরিচালনা করতে হয়েছিল।

১৯৪১-এর ২২শে জুন সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হওয়ার পরেই যে-'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি' ভূমিষ্ঠ হয়েই মৃত্যুপথযাত্রী রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ লাভ করে, তার স্বেচ্ছাসেবকরূপে কাজ করতে থাকেন ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীরা। কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে গড়ে ওঠে 'স্টুডেন্টস এইড টু দি সোভিয়েট কমিটি'।[২৬] ডিসেম্বরে (১৯৪১) পাটনায় শুরু হয় A. I. S. F-এর সর্বভারতীয় সম্মেলন। কমিউনিস্ট ছাত্রদের নেতৃত্বে পরিচালিত এ. আই. এস. এফ ফ্যাসিস্ত-বিরোধী জনযুদ্ধের নীতি গ্রহণ করে এই সম্মেলনে। ফলে, এ. আই. এস. এফ থেকে কমিউনিস্ট-বিরোধী সব ছাত্রনেতাই বেরিয়ে যান। 'আগস্ট-আন্দোলন'-এর প্রাক্কালে এই ভাঙ্গন আরো তীব্র হয় এবং এই সময় থেকেই নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন (A. I. S. F) ছাড়াও 'ছাত্র কংগ্রেস', 'মুসলিম ছাত্র লীগ' প্রভৃতি ছাত্র-সংগঠনগুলির উদ্ভব হয়।

পাটনায় সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে ছাত্রদের কর্তব্য নির্ধারণের জন্য বোম্বাইয়ে ছাত্রদের জাতীয় ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক হয়। সেখানে বাঙলা, উত্তরপ্রদেশ, পঞ্জাব, অন্ধ্র, তামিল-নাড়ু, কেরালা প্রভৃতি স্থান থেকে প্রতিনিধিরা উপস্থিত হন। অন্যান্য অনেক প্রদেশ থেকে ছাত্র-নেতারা বোম্বাই যেতে পারেন নি, কারণ তাঁরা অনেকেই গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে ছিলেন। সমস্ত প্রদেশ থেকে প্রাপ্ত লিখিত রিপোর্টই উক্ত অধিবেশনে আলোচিত হয়। এ. আই. এস. এফ এই সর্বপ্রথম একটা সুসংবদ্ধ রাজনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণ করে। সিদ্ধান্তগুলি সংকলিত করে সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি পুস্তিকাও প্রকাশ করা হয়।[২৭]

ছাত্র ফেডারেশনের এই 'সেপ্টেম্বর-দলিলে' যেসব দাবি ঘোষিত হয়, সেগুলি হলো:

১) অবিলম্বে বিনাশর্তে বন্দী কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি চাই।

২) জাতীয় প্রতিরক্ষার জন্য একটি জাতীয় সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে কংগ্রেস ও লীগ নেতাদের আলোচনা চাই—যার ভিত্তি হবে জাতিসমূহের আত্ম-

নিয়ন্ত্রণের অধিকার।

৩) দেশরক্ষার ও জাতীয় সরকার গঠনের জন্য ছাত্রসমাজের মধ্যে সার্বিক ঐক্য চাই।

বোম্বাইয়ের সেপ্টেম্বর অধিবেশনের পর থেকেই গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ কার্যকর করার জন্য প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের ইউনিটগুলি সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং ব্যাপক ফ্যাসিস্ত-বিরোধী প্রচার-আন্দোলন, স্বাক্ষরসংগ্রহ অভিযান পরিচালনা করতে থাকে। 'কংগ্রেস-লীগ ঐক্য' ও 'বন্দী মুক্তি' ছিল এই সময় ছাত্র-ফেডারেশনের প্রধানতম আহ্বান। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের তৎকালীন কর্মপ্রচেষ্টা ও উদ্যোগের একটা রেখাচিত্র পাওয়া যায় প্রাক্তন ছাত্রনেতা অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণ থেকে:

"...১৯৪২-৪৩ বাঙলাদেশের জীবনে এক মহাসংকটের যুগ। একদিকে বুকের উপর সদম্ভে দমনপীড়ন করে চেপে বসে রয়েছে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ ও তার আমলাশাহী, দেশের বুকে চলেছে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ; অপরদিকে সীমান্তে—চট্টগ্রামে, মণিপুরে উদ্যত জাপানী ফ্যাসিবাদী বাহিনী। কলকাতা নিষ্প্রদীপ, বোমায় ক্ষতবিক্ষত চট্টগ্রাম। তারই মধ্যে কঠিন দায়িত্ব ছিল সমগ্র ছাত্রসমাজকে জাপানী ফ্যাসিস্ট হামলা রোখার জন্য সংহত করার, সাম্রাজ্যবাদী দমননীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ার ও ভয়াবহ দুর্ভিক্ষকে রুখে লক্ষ লক্ষ নিরন্ন দেশবাসীকে বাঁচানোর। সাহসের সঙ্গে, এই অসম লড়াই-এর কঠিন দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন কমিউনিস্ট পার্টি এবং লড়াই-এর সবচেয়ে সামনের সারিতেই ছিল ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীরা। অগণিত শহরে ও গ্রামে রিলিফ কিচেন বা লঙ্গরখানা খুলে হাজার হাজার বুভুক্ষু মানুষকে মৃত্যুর কবল থেকে বাঁচিয়েছিল ছাত্রকর্মীরা। তখনকার রণধ্বনিই ছিল: যেখানে এখনও ছাত্র ফেডারেশনের কর্মী আছে, সেখানেই অন্তত একটি রিলিফ কিচেন খুলতেই হবে। ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃত্বে কলকতার বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে মাসের পর মাস জনসেবার কাজ চালিয়ে যান—লড়াই করেন ব্যাপক মহামারীর বিরুদ্ধে। কমিউনিস্ট পার্টি ও ছাত্র ফেডারেশন ভারতজুড়ে ডাক দেয় 'বাঙলাকে বাঁচাও'। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের মেহনতী মানুষ ও ছাত্রসমাজ অকাতরে অর্থ,বস্ত্র, খাদ্য ও ঔষধ দান করেন, অগণিত ছাত্র-রিলিফ-স্কোয়াড অন্যান্য প্রদেশ থেকে সাহায্য নিয়ে বাঙলাদেশে আসেন। ছাত্র-শিক্ষকদের সম্মিলিত 'ত্রাণ কমিটির' যুগ্ম সম্পাদকদ্বয় ছিলেন কমিউনিস্ট ছাত্রনেতা সুনীল মুন্সী ও জাতীয়তাবাদী ছাত্র জি. জি. সোয়েল, যিনি পরবর্তীকালে লোকসভার সহ-অধ্যক্ষ হয়েছিলেন।"[২৮]

ইতিমধ্যে রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক ছাত্রসম্মেলনে (১৯৪৩) ছাত্র ফেডারেশনের নতুন নেতৃত্ব নির্বাচিত হয়েছে। বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, অবন্তী

লাহিড়ী প্রমুখ নেতারা ছাত্র-আন্দোলন থেকে সরে এসে ইতিপূর্বেই কমিউনিস্ট আন্দোলনের বৃহত্তর দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। নব-নির্বাচিত সভাপতি সাধন গুপ্ত এবং সাধারণ সম্পাদক অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্যের নেতৃত্বেই সেই সময় ছাত্র ফেডারেশন পরিচালিত হচ্ছিল।

এই সময়কালের কর্ম-পরিচালনায় কমিউনিস্ট ছাত্রকর্মী'রা যে সাহস ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করেছিলেন সে-কথা বলা অবশ্যই প্রয়োজন। ফ্যাসিবাদ-বিরোধী জনযুদ্ধের নীতি দেশবাসীকে বোঝানো তখন ছিল খুবই কঠিন কাজ। শত্রু ইংরাজের শত্রু জাপান আমাদের মিত্র—এই বিপজ্জনক ভ্রান্ত চিন্তাধারায় ভেসে গিয়েছিল দেশপ্রেমিক ছাত্রসমাজের এক বৃহত্তর অংশ। বাঙলার তরুণমানসের অবিসংবাদী নায়ক সুভাষচন্দ্র বসু স্বয়ং ছিলেন এই ভ্রান্ত মতাদর্শের পতাকাধারী; ফলে, বাঙলাদেশের ছাত্র ফেডারেশনের কর্মী'দের কাজ খুবই কঠিন ছিল। কিন্তু নিন্দা-অপবাদ বা দৈহিক নির্যাতন, কোনোকিছুই ১৯৪২-৪৪ সালে ছাত্র ফেডারেশনের কর্মী'দের কর্তব্যচ্যুত করতে পারেনি। বহু ছাত্রনেতা ও কর্মী বিভ্রান্ত দেশপ্রেমিক-দের দ্বারা সে-সময় আক্রান্ত হয়েছেন। ৪ জন বিশিষ্ট ছাত্রকর্মী—প্রদ্যোত সরকার, ফণী চক্রবর্তী, ভানু মজুমদার ও রুচি নাগ, আততায়ীদের আক্রমণে শহীদ হয়েছেন কিন্তু ছাত্র ফেডারেশনের কর্মী'দের প্রচার-আন্দোলন তবু একদিনের জন্যেও ব্যাহত হয়নি। তাঁদের দেশপ্রেম, সেবা ও সাহসিকতার আদর্শ সেদিন মুগ্ধ করেছিল অকমিউনিস্ট রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকেও।

এই টাল-মাটাল পরিস্থিতিতে ১৯৪৪-এর ডিসেম্বর মাসে কলকাতার মহম্মদ আলি পার্কে নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের অষ্টম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন উদ্বোধন করলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, সভাপতিত্ব করলেন ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আর প্রধান অতিথি ছিলেন দেশনেত্রী শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু। সম্মেলনের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য সেদিন সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রী স্বেচ্ছাসেবকরূপে দিনরাত পরিশ্রম করেছিল। প্রকাশ্য সমাবেশে যোগ দিয়েছিল কলকাতা ও শহরতলির দশহাজার ছেলেমেয়ে। বাঙলার ছাত্র ফেডারেশনকে অভিনন্দন জানিয়ে সরোজিনী নাইডু আবেগদৃপ্ত কণ্ঠে বলেছিলেন:

> "আত্মত্যাগ আমরা করিনি—আত্মত্যাগ করেছ তোমরা, বাঙলার তরুণ সমাজ। তোমাদের ধন্যবাদ জানাই। বাঙলার ঘোর দুঃসময়ে, তোমরা জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে অসামান্য সেবাকার্য করেছ—কে তা অস্বীকার করবে? এখন স্বাধীনতার শেষ সংগ্রাম আসন্ন। ঝগড়া ভোলো, একজোট হও।" [সম্মেলনের মুদ্রিত ইংরাজি বিবরণের অনুবাদ]।[২৯]

প্রকৃতপক্ষে, এই পর্যায়ে ছাত্রফেডারেশন এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিল। ছাত্রনেতা ও কর্মী'রা ছড়িয়ে পড়েছিলেন গ্রামে গ্রামে, জেলায় জেলায়। 'জনযুদ্ধ' ও 'দি স্টুডেন্ট' পত্রিকার মাধ্যমে এবং ভ্রাম্যমান সাংস্কৃতিক স্কোয়াডগুলির মারফৎ তারা যেমন একদিকে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী প্রচার-আন্দোলন

চালাচ্ছেন, অপরদিকে তেমনি 'জনরক্ষা সমিতি' 'পিপল্‌স্ রিলিফ কমিটি' প্রভৃতির মাধ্যমেও ছাত্রকর্মীরা মন্বন্তর ও মহামারীর মোকাবিলায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। বাঙলার ছাত্রসমাজের মধ্যে এই সময় থেকেই ছাত্র ফেডারেশনের প্রভাব বাড়তে থাকে। জনযুদ্ধের যুগে যাঁরা ছাত্র ফেডারেশনকে বাঙলাদেশে নেতৃত্ব দিতেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হলেন: বিশ্বনাথ মুখার্জি, রমেন ব্যানার্জি, অবনী লাহিড়ী, সুনীল মুন্সী, কমলাপতি রায়, গৌতম চট্টোপাধ্যায়, কল্যাণ দত্ত, নির্মল চ্যাটার্জি, সুকুমার গুপ্ত, প্রভাত দাশগুপ্ত, নন্দ বসু, কনক দাশগুপ্ত (মুখার্জি), গীতা মুখার্জি, অলকা মজুমদার (চট্টোপাধ্যায়), প্রশান্ত সান্যাল, শঙ্কর রায়চৌধুরী, অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য, সাধন গুপ্ত প্রমুখ আরো অনেকেই। রমেন ব্যানার্জি ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত ছিলেন পার্টির প্রাদেশিক ছাত্র-ফ্রাকশানের সম্পাদক।[৩০]

৫. ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনে নারীসমাজ ও মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির ভূমিকা:

ফ্যাসিস্ত-বিরোধী সংগ্রামে বাঙলার কমিউনিস্ট পার্টি'র সদস্য নারীকর্মীদের নেতৃত্বে বিভিন্ন শ্রেণী ও স্তরের নারীসমাজ যেভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন—তা নিশ্চয়ই আজ ইতিহাস। ভারতবর্ষের মাটিতে উচ্চকোটি মহিলাসমাজের গণ্ডী পেরিয়ে সংগঠিত ও গণভিত্তিক নারী-আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে নিঃসন্দেহে বাঙলার 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি' গঠনের মধ্য দিয়ে।

প্রাথমিকভাবে ছাত্র ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত ছাত্রীকর্মীরাই নারীসমাজের মধ্যে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী প্রচারকার্য শুরু করেন। ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে ১৯৪০ সালের জানুয়ারিতে লক্ষ্ণৌ শহরে একটি 'সারাভারত ছাত্রী সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। সমগ্র ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের কয়েকশত ছাত্রীকর্মী এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিল। সরোজিনী নাইডু ছিলেন সম্মেলনের প্রধান অতিথি। লণ্ডন থেকে সদ্য প্রত্যাগতা রেণু রায় (চক্রবর্তী) তরুণ ছাত্রীদের সামনে দেশবিদেশের উদাহরণ সহযোগে ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনের চিত্র তুলে ধরেন এবং প্রদেশে প্রদেশে ছাত্রী-সংঘ গড়ে তুলতে তাদের উৎসাহিত করেন।[৩১]

ইতিমধ্যেই অবশ্য ১৯৩৯ সালে বাঙলার বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের নিয়ে একটি ছাত্রী-সংঘ বা গার্লস স্টুডেন্টস এ্যাসোসিয়েশন গড়ে ওঠে। ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নারীকর্মীরা মিলিত হয়েছিলেন ছাত্রীদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তুলবার কাজে। কমিউনিস্ট পার্টির কনক দাশগুপ্ত (মুখার্জি), শান্তি সরকার (বসু), কল্যাণী মুখার্জী (কুমারমঙ্গলম), চিনু ঘোষ, প্রীতি লাহিড়ী (ব্যানার্জি), লেবার পার্টির উমা ঘোষ, গীতা ব্যানার্জি (মুখার্জি), কংগ্রেস সোস্যালিস্ট-পার্টির অনিমা ব্যানার্জি (চক্রবর্তী) এবং রায়বাদী পার্টির শোভা মজুমদার (গাঙ্গুলি) কে নিয়ে প্রথম গার্ল'স স্টুডেন্টস কমিটি গঠিত হয়। কনক দাশগুপ্ত হন এর প্রথম সম্পাদিকা। গার্ল'স স্টুডেন্টস্

অ্যাসোসিয়েশন প্রথম দিকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রচার-আন্দোলন চালালেও জনযুদ্ধকালে কমিউনিস্ট ছাত্রী-নেতৃত্বের পরিচালনায় তারা প্রদেশে-প্রদেশে, জেলায়-জেলায় ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনে সামিল হন।[৩০]

বস্তুত, এই সময়কালে সমাজের বিভিন্ন অংশ থেকে, বিশেষ করে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে, কিছু কিছু মহিলারা কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন প্রাক্তন কংগ্রেসকর্মী ও বিপ্লববাদী দলের সঙ্গে যুক্ত। আবার ছাত্র আন্দোলন থেকেও এসেছিলেন অনেকে। কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে এসে এইসব মহিলাকর্মীদের অনেকেই পার্টির গোপন কাজে নানাভাবে সাহায্য করতে থাকেন, এমনকি পার্টিতেও যোগ দেন। কমিউনিস্ট পার্টিও এই সময় মহিলাদের পার্টির মধ্যে নিয়ে আসার জন্য এবং তাঁদের রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত করে তুলবার জন্য উদ্যোগ নেয়। এইভাবে নারীসমাজের মধ্যে বৈপ্লবিক মতাদর্শ প্রচার করার কাজ চলতে থাকে। পার্টির রাজনৈতিক ক্লাসগুলির মধ্য দিয়েও মহিলাকর্মীদের প্রশিক্ষিত করার কাজ শুরু হয়।[৩৩]

খুব স্বাভাবিকভাবে, জনযুদ্ধের যুগে এই কারণেই কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনে বাঙলার নারীসমাজকে সংগঠিত করার ব্যাপারে খুব বেশি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি।

নাৎসী জার্মানী কর্তৃক সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হওয়ার পরেই তার বীরত্বের কাহিনী বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। সোভিয়েত নারীদের বীরত্বের কাহিনীও প্রচারিত হতে থাকে সর্বত্র। বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সোভিয়েত বীরাঙ্গনা রূপে তানিয়া, সোফিয়া, জয়া, কাসমো ডিস্কায়া, ওলগা বারবোলজ, নাতাশা কভসোভা, মারিয়া পেলিভানোভা, নিনা পোপোভা প্রভৃতি সংগ্রামী মেয়েদের কাহিনী বাঙলা তথা ভারতের শিক্ষিত এবং সচেতন নারীসমাজের মধ্যে সর্বাধিক প্রচারিত হয়।

সোভিয়েত নারীদের ফ্যাসিস্ত-বিরোধী সংগঠন গড়ে তুলবার সংবাদও বাঙালী মহিলাদের অনুপ্রাণিত করে। হিটলারের সোভিয়েত আক্রমণের পরেই ১৯৪১ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর মস্কোতে মহিলাদের একটি ফ্যাসিবিরোধী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন থেকেই গঠিত হয় **'Soviet Women's Anti-Fascist Committee'**। হিটলারচক্রের বর্বর ফ্যাসিস্ত আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সামিল হওয়ার জন্য বিশ্বের নারীসমাজের কাছে একটি ঐতিহাসিক আবেদন প্রচার করা হয়। এর মাধ্যমে বিশ্বের নারীসমাজকে ফ্যাসিস্ত-শক্তিগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য সংযুক্ত মোর্চা গড়ে তোলারও আহ্বান জানানো হয়।[৩৪]

সোভিয়েত নারীদের বীরত্বপূর্ণ কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে চীনের নারীদের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীরত্বপূর্ণ কাহিনীও ভারতের নারীদের উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। মাদাম সান ইয়াৎ সেনের একটি বিশেষ প্রবন্ধ—'চীনা মেয়েদের স্বাধীনতা সংগ্রাম' সেই সময় ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টির সাপ্তাহিক পত্রিকা

'জনযুদ্ধে'র মাধ্যমে।[৩৫]

এই প্রেক্ষাপটেই ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে গড়ে ওঠে নারীদের মধ্যে দেশরক্ষা ও আত্মরক্ষার আন্দোলন। বাঙলা ছিল এর পুরোভাগে। ফ্যাসিস্ত-বিরোধী প্রচারের জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে জাপবিরোধী মেলা প্রভৃতি সংগঠিত হতে থাকে। মহিলারা দলে দলে এইসব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে থাকেন; ক্রমশই গড়ে ওঠে মহিলাদের নিজস্ব সংগঠন—আঞ্চলিক, জেলাভিত্তিক ও প্রদেশগতভাবে।

১৯৪২ সালের ১৩ই এপ্রিল কলকাতায় কমিউনিস্ট পার্টির মহিলা-কর্মীদের উদ্যোগে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুট-এর লাইব্রেরী হলে মহিলাদের একটি ফ্যাসি-বিরোধী সভা ডাকা হয়। এই সভায় বামপন্থী দলগুলির মহিলারা ছাড়াও বিভিন্ন দল ও মতের এবং নির্দলীয় প্রগতিশীল মহিলারাও যোগদান করেন। এই সভা থেকে একটি 'কলকাতা মহিলা আত্মরক্ষা সংগঠন সমিতি' (**Calcutta Women's Self Defence League**) গঠিত হয়। এই সাংগঠনিক সমিতি গঠন করার জন্য সভা আহ্বান করেছিলেন জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলি, সাকিনা বেগম, রেণু চক্রবর্তী, সুধা রায়, মণিকুন্তলা সেন, নাজিমুন্নেসা আহম্‌দ, বিয়াট্রিস টেরান (**Y. W. C. A**), অপর্ণা সেন (**A. I. W. C**) ও ফুলরেণু দত্ত (গুহ)।[৩৬] সভা থেকে সাংগঠনিক সমিতির আহ্বায়িকা নির্বাচিত হন এলা রীড।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৯৪২-এ মহিলা আত্মরক্ষা সাংগঠনিক সমিতির আহ্বায়িকা এবং পরবর্তীকালে কয়েক বছর পর্যন্ত প্রাদেশিক মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সম্পাদিকা পদে অধিষ্ঠিত এলা রীড কিন্তু কোনো বিদেশিনী মহিলা ছিলেন না। তিনি ছিলেন কলকাতার প্রখ্যাত ডাক্তার মৃগেন্দ্রলাল মিত্রের কন্যা, প্রথম ভারতীয় ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষের নাতনী। 'স্টেটস্‌-ম্যান' পত্রিকার বার্তা-সম্পাদক এ্যালেক্স রীডের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। এ্যালেক রীড ও এলা রীড দু'জনেই ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির ঘনিষ্ঠ দরদী। মহিলা আত্মরক্ষা সংগঠন সমিতির দপ্তর প্রথমে কলকাতায় তাঁদের বাড়িতে ২/১ লাউডন স্ট্রীটে এবং পরে ১নং থিয়েটার রোডে কিংস কোর্টে অবস্থিত ছিল। প্রথম প্রাদেশিক সম্মেলনের (১৯৪৩) পর মধ্য কলকাতার ১৩, ওয়েলিংটন স্কোয়ারে লী মেমো-রিয়াল স্কুলের একটি ঘরে সমিতির দপ্তর স্থানান্তরিত হয়। রীড-দম্পতি পরবর্তী-কালে অবশ্য লণ্ডনে চলে গিয়ে সেখানকার কমিউনিস্ট পার্টির কাজে যুক্ত হয়ে-ছিলেন। সুলেখিকা এবং একজন প্রথম সারির সাংবাদিক এলা রীড লণ্ডনে ১৯৮২ সালে মারা যান। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির প্রথমপর্বে এলা রীডের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

যাহোক, 'জনযুদ্ধ' পত্রিকায় মহিলা আত্মরক্ষা সাংগঠনিক সমিতির সভার যে-বিবরণ প্রকাশিত হয় তা নিম্নরূপ:

"গত ১৩ই এপ্রিল কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউট লাইব্রেরী হলে কলকাতার নারীদের এক ফ্যাসিবিরোধী সম্মেলন হয়। চীনা কনসাল

জেনারেলের পত্নী মাদাম পাও সভায় সভানেত্রীত্ব করেন।

"শ্রীযুক্তা প্রণতি দে বলেন, চীন ও সোভিয়েত দেশের মেয়েদের মতো ভারতের মেয়েদিগকেও দেশ ও গৃহরক্ষার জন্য পুরুষের পাশে যোগ্য স্থান গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলি বলেন যে, স্বাধীনতা কখনো অপরের দান হিসাবে আসে না। জাপান আমাদিগকে স্বাধীনতা দিবে না। সভায় শ্রীযুক্তা রেণু চক্রবর্তী, মণিকুন্তলা সেন, নাজিমুন্নেসা আহমদ, স্টেলা ব্রাউন প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়: ১) দেশের জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জাগাইতে হইবে, ২) জনরক্ষার জন্য মেয়েদের শক্তিশালী সংগঠন গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং প্রয়োজন উপস্থিত হইলে মেয়েদিগকে অফিস, কারখানা, এমনকি রণক্ষেত্রেও পুরুষের স্থান পূরণ করিতে হইবে, ৩) মেয়েদের আত্মরক্ষার কৌশল শিক্ষা দিতে হইবে, ৪) জনসাধারণের সহিত ভারতের সৈন্যদের সদ্ভাব স্থাপন করিতে হইবে।"[৩৭]

মহিলা আত্মরক্ষা সাংগঠনিক সমিতির কার্যকরী কমিটির উক্ত সদস্যগণ নারী-সমাজের উদ্দেশে একটি যুক্ত আবেদন প্রচার করে প্রতিটি গ্রামে ও শহরে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি গড়ে তুলতে আহ্বান জানান। এই আবেদনে ৮ দফা কর্মসূচী প্রচার করা হয়: ১) প্রচার আন্দোলন, ২) পঞ্চম বাহিনীর বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা, ৩) সিভিল ডিফেন্সের কাজগুলি সংগঠিত করা, ৪) বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করা, খাদ্য-বস্ত্র ও অর্থ সংগ্রহ করা, ৫) প্রয়োজনবোধে সামরিক সুবিধার্থে অধিকৃত স্থানগুলি থেকে সাধারণ বাসিন্দাদের সরে যেতে সাহায্য করা, তাদের জন্য ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের দাবি আদায় করতে সাহায্য করা, ৬) জেলা বোর্ড, কো-অপারেটিভ বা সরকারী সাহায্যে চাল-ডাল প্রভৃতি ন্যায্যমূল্যের দোকান চালাতে সাহায্য করা, ৭) যুযুৎসু, লাঠি খেলা প্রভৃতিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত মেয়েদের বাহিনী সংগঠিত করা। বিপদের সময় নিজেদের ও প্রতিবেশীদের যাতে রক্ষা করতে পারে তার জন্য এবং গেরিলা-যুদ্ধের সাহায্যের জন্য মহিলাদের একটি আত্মরক্ষা বাহিনী গঠন করা, ৮) 'ফসল-বাড়াও' এবং 'উৎপাদন বাড়াও' আন্দোলনে সহযোগিতা করা।[৩৮]

এরপর থেকেই সুপরিকল্পিতভাবে গ্রামে ও শহরে সর্বত্র স্থানীয়ভাবে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি গড়ে তোলার কাজ চলতে থাকে। সমিতি গড়ার এই কর্মসূচী নিয়ে মহিলাকর্মীরা ছড়িয়ে পড়েন কলকাতার বস্তি ও মধ্যবিত্ত অঞ্চলে, বিভিন্ন জেলার গ্রাম ও শহরের অঞ্চলে-অঞ্চলে। এর ফলে স্থানীয় ভিত্তিতে অনেক ছোট ছোট মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি বা কমিটি গড়ে উঠতে থাকে। এই সময়কার প্রচার-আন্দোলনের যে-বিবরণ কমিউনিস্ট নেত্রী রেণু চক্রবর্তী দিয়েছেন তার অংশবিশেষ নিম্নরূপ:

"…কমিউনিস্ট মেয়েরা প্রত্যেকটি বাড়ি বাড়ি ও দুয়োরে দুয়োরে উপস্থিত

হতে লাগল। দরজা খুলে মেয়েরা বেরিয়ে এলে আমরা তাদের বোঝাতে চেষ্টা করতাম যে বর্তমান বিপদের অবস্থায় আমরা চুপ করে বসে থাকতে পারি না। আমাদের দেশকে রক্ষা ও আমাদের সম্মান রক্ষা—এ তো আমাদেরই করতে হবে। এতে আমাদের স্বনির্ভরতা চাই। তাই জাতীয় সরকার গঠনের জন্য জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার কাজে আমাদেরও সাহায্য করতে হবে। সেই সরকারই পারবে সমস্ত জাতিকে একত্র সমবেত করতে। এই জন্যই জাতীয় নেতাদের মুক্তি আমাদের পেতেই হবে।

"সভায় সভায় এই কথা আমরা শোনাই—বলি, রাশিয়ার মেয়েরা যদি পারে, আমরা ভারতের মেয়েরা কেন পারব না!...প্রথম প্রথম সভায় সমিতিতে মেয়েদের আনাই কঠিন ছিল, আরো কঠিন ছিল বেশিক্ষণ কোন বিষয়ে তাদের মন বসানো। আমাদের কর্মীর সংখ্যাও তেমন বেশি ছিল না। তবু নানা প্রতিকূলতার মধ্যে সেই অল্প সংখ্যক কর্মীরাই ঘুরে ঘুরে মহিলাদের বোঝানোর কাজ করে যান অটুট ধৈর্যের সঙ্গে। কোথাও সভা হবার কথা হলে তারা প্রতিটি বাড়িতে যেত, একবার দু'বার নয়—বহুবার। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ডেকে সঙ্গে নিয়ে আসতে হতো সভায়। শিশুদের সঙ্গে নিয়ে আসতেন মহিলারা।"[৩৯]

মহিলাদের মধ্যে এই সময় আন্দোলন ও সংগঠন গড়ে তোলার কাজে কলকাতা ছিল সবথেকে অগ্রণী। কলকাতায় জাপ বোমাবর্ষণের আগে থেকেই আত্মরক্ষার প্রস্তুতি চলতে থাকে। প্রবীণ মহিলা কমিউনিস্ট নেত্রী কনক মুখোপাধ্যায় এ-প্রসঙ্গে লিখেছেন :

"...প্রতিটি পাড়ায় পাড়ায় বস্তি অঞ্চলে মহিলা ভলান্টিয়াররা জাপবিরোধী প্রচার-স্কোয়াড সংগঠিত করতে থাকে। কলকাতায় বিমান আক্রমণের প্রথম দিন থেকেই অন্তত ১৫টি বস্তিতে মেয়েরা কাজ শুরু করে। তাদের দৈনন্দিন কাজের মধ্যে ছিল : ১) পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে সেখানে কত লোক বাস করে, বিমান আক্রমণের সময় আশ্রয় নেবার মতো কতগুলি পাকা বাড়ি আছে, কতজন মেয়ে ও ছেলে ওয়ার্ডেন আছে, কত লোককে এ. আর. পি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, ঐ পাড়ার মানুষের কি কি অসুবিধা আছে ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহ করা, ২) পাড়ায় পাড়ায় এ. আর. পি. ও প্রাথমিক চিকিৎসা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা, ৩) নিজেরা এ. আর. পি. প্রাথমিক চিকিৎসা শিক্ষা নেওয়া, ৪) ভলান্টিয়ার বাহিনী সংগঠিত করা ও ফ্যাসিবিরোধী প্রচারের মধ্য দিয়ে আত্মরক্ষা সমিতির সদস্য সংগ্রহ করা।"[৪০]

অবশ্য শুধুমাত্র কলকাতাতেই নয়, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সংগঠন ছড়িয়ে পড়তে লাগল মফস্বল জেলাগুলিতেও। বরিশাল, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, সিলেট, ঢাকা, ফরিদপুর, রংপুর, রাজশাহী, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, পাবনা, হুগলী, খুলনা, যশোহর, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলাগুলিতে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী প্রচারের মাধ্যমে,

দেশরক্ষা ও আত্মরক্ষার কর্মসূচীর মাধ্যমে এবং খাদ্য আন্দোলন ও রিলিফের সেবামূলক কাজের মাধ্যমে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির প্রাথমিক কাজ শুরু হলো। এইসব জেলায় যাঁরা সংগঠকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা হলেন—মণিকুন্তলা সেন, সুরবালা সেন, বীণাপাণি দে, শান্তি সেন, স্নেহলতা দাস, শান্তিসুধা ঘোষ, ভানু দেবী, যুঁইফুল বসু, কল্পনা দত্ত, আশা দত্ত, প্রীতি হালদার; এছাড়া কনক দাশগুপ্ত (মুখার্জি), রেণু রায় (চক্রবর্তী), জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলি, কমলা চ্যাটার্জি (মুখার্জি) প্রমুখেরা তো ছিলেনই। এ-প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, শিক্ষিত মুসলিম পরিবার থেকেও মহিলারা এই আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। ১৯৪২-এর ১৩ই এপ্রিল যখন কলকাতায় **Calcutta Women's Self Defence League** গঠিত হয়েছিল তখন সাকিনা বেগম তার অন্যতম সংগঠকরূপে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই সময়ে খুলনা জেলার যে রিপোর্ট 'জনযুদ্ধে'র পাতায় পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ :

"খুলনা—সাতক্ষীরা মহকুমার রসুলপুরে নারীদের ভিতর যথেষ্ট চেতনা দেখা গিয়েছে। তাঁহারা সংঘবদ্ধ হইতেছেন। মুসলিম নারীদেরই উৎসাহ বেশি। এখানে একটি নারী আত্মরক্ষা সমিতি গঠিত হইয়াছে। তছমিনা খাতুন এই সমিতির সম্পাদিকা।"[৪১]

বস্তুতই, পূর্ববাঙলার জেলাগুলিতে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির অধিকাংশ সভাতেই মুসলিম মহিলাদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য। যাহোক, ১৯৪২-এর জুন মাস থেকে শুরু করে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে সমগ্র বাঙলা জুড়ে গড়ে উঠেছিল মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির অসংখ্য শাখা।

এরপর মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির কর্মযজ্ঞ অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল জেলায় জেলায়, এমনকি গ্রামের প্রত্যন্ত প্রান্তেও। প্রথম যখন বঙ্গদেশে জাপানী বোমা পড়ে তখন সুরক্ষা ব্যবস্থার প্রশ্নটি অতি তীব্রভাবেই অনুভূত হয়। এই পর্বে নারী-আন্দোলনের মূল কর্মসূচী ছিল তিনটি : এক) দেশরক্ষা ; দুই) জাতীয় নেতাদের মুক্তি ও জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা ; তিন) দুর্ভিক্ষে মৃত্যুর হাত থেকে জনগণকে রক্ষা করা।

প্রথম পর্যায়ে, ১৯৪২-এর সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ার দিকে, মহিলাদের মধ্যে আত্মরক্ষা সপ্তাহ পালনের জন্য ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এই আত্মরক্ষা সপ্তাহের প্রধান কর্মসূচী ছিল জাপবিরোধী প্রচার। প্রতিটি অঞ্চলে মহিলাদের স্কোয়াড, বৈঠক-সভা, সাধারণ সভা, চিত্র-প্রদর্শনী, প্রভাতফেরী, জননাট্য, বিবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতির মাধ্যমে জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশরক্ষার কাজে সর্বস্তরের মানুষের ব্যাপক ঐক্য গড়ে তোলার জন্য আবেদন জানানো হয়। আত্মরক্ষা সপ্তাহের এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কতকগুলি গঠনমূলক কাজও করা হয় : ১) মেয়েদের মধ্যে এ. আর. পি. প্রাথমিক চিকিৎসা ও ছোরা-লাঠি খেলা শেখার ব্যবস্থা ; ২) ভলান্টিয়ার বাহিনী গঠন করা ; ৩) খাদ্য আন্দোলন সংগঠিত করা। এই প্রচার-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির

সাধারণ সভ্য সংগ্রহের কাজও চলতে থাকে।[৪২]

দ্বিতীয় পর্যায়ে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির কাজ ছিল নভেম্বর, ১৯৪২-এর প্রথম সপ্তাহটিতে কমিউনিস্ট পার্টির আহ্বানে সাড়া দিয়ে 'জাতীয় ঐক্য সপ্তাহ' পালন করা। এই ঐক্য সপ্তাহের রণধ্বনি ছিল : কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি চাই, দমননীতি বন্ধ করো, কংগ্রেস-লীগ এক হও, জাতীয় গভর্নমেন্ট গঠন করো, জাপানীকে রুখে দেশ স্বাধীন করো। এই সব স্লোগানের ভিত্তিতেই ব্যাপকভাবে জনগণের সহি-সংগ্রহ, রাজনৈতিক পত্র-পত্রিকা ও পুস্তিকার ব্যাপক প্রচার এবং বিক্রয়, বৈঠক-সভা ও জনসভা, সাহিত্য প্রচারের মাধ্যমে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করা আর দেশরক্ষার জন্য জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা প্রচার করাই ছিল এই ঐক্য সপ্তাহের বিশেষ উদ্দেশ্য। বলাবাহুল্য, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি এই রাজনৈতিক প্রচার-আন্দোলনে প্রথম থেকেই অংশ গ্রহণ করেছিল।

এই ঐক্য সপ্তাহের আরো বৈশিষ্ট্য এই যে, মোহিনী দেবী, জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলি প্রমুখ কংগ্রেস নেত্রীরাও অনেকে এই দাবীপত্রে স্বাক্ষর দেন ও কমিউনিস্ট মেয়েদের সঙ্গে দেশরক্ষার সংগ্রামে যুক্ত হন (যদিও তখন 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলন পুরোদমে চলছিল)। আবার, মুসলিম ও খ্রীস্টান মহিলারাও এই দাবিপত্রে ব্যাপক সংখ্যায় স্বাক্ষর দেন। এইভাবে মহিলাদের মধ্যে এক দেশপ্রেমিক, ধর্মনিরপেক্ষ এবং ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলন ও সংগঠন গড়ার বাস্তব ভিত্তি রচিত হতে থাকে।

তৃতীয় পর্যায়ে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি ১৯৪২-এর ডিসেম্বর থেকে শুরু করে গোটা ১৯৪৩ সাল জুড়ে বাঙলায় ব্যাপকভিত্তিক খাদ্য-আন্দোলন গড়ে তোলে। ভয়াবহ মন্বন্তর ও খাদ্য-সংকটের মোকাবিলায়, খাদ্য সরবরাহ ও বণ্টনের কাজ পরিচালনায় মেয়েদের নিয়ে ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়ে তোলা হয়। শুধুমাত্র দুর্ভিক্ষ-ত্রাণ বা খাদ্যসংকট মোকাবিলাতেই নয়, জাপবিমান আক্রমণ প্রতিরোধেও 'ফ্রেণ্ডস্ এ্যাম্বুলেন্স ইউনিট'-এর সঙ্গে একত্রে এরা কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। সাইরেন বাজা মাত্রই বস্তিতে বস্তিতে গিয়ে নারী-শিশুদের নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যেতেও এঁরা সাহায্য করতে থাকে। বস্তি অঞ্চলের মানুষদের অসুবিধাগুলি দূর করা এবং বিমান হানার পর আহতদের শুশ্রূষার জন্য রিফিল সেন্টারে কাজ করার জন্যও নারী-ভলান্টিয়ারদের বিশেষ দায়িত্ব ছিল। এই সময় কনট্রোলের দোকানের সামনে লম্বা লাইন পড়লে দোকানীরা লাইনে দাঁড়ানো মানুষগুলোর সঙ্গে অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার, এমনকি নিগ্রহ পর্যন্ত করত। এসব ক্ষেত্রে মহিলা-স্বেচ্ছাসেবিকারা গিয়ে ক্রেতাদের সাহায্য করতেন এবং মহিলা ক্রেতারা যাতে বিধিসম্মত পণ্য-সামগ্রী পান সে বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। বস্তি অঞ্চল থেকে শ্রমজীবী মেয়েরাও এসে এই কাজে যোগ দেন। ৩/৪ মাস আগেও যারা পর্দানশীন ছিলেন, তাঁরাও স্বেচ্ছাসেবিকা হয়ে এগিয়ে আসেন। মধ্যবিত্ত মহিলারাও তাঁদের ঘরের কাজ ফেলে সকাল থেকেই এই কাজে লেগে যেতেন।[৪৩]

এইসব রেখাচিত্র থেকেই সেই সময়কার 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'র প্রশংসনীয় কর্মপ্রচেষ্টা সম্পর্কে বিস্তারিত অবহিত হওয়া যায়। এই সময়কালে কমিউনিস্ট মহিলা ফ্রণ্টের উদ্যোগে সংঘটিত একটি স্মরণীয় ঘটনা হলো বিধানসভা ভবন অভিমুখে মহিলাদের বিশাল 'ভুখামিছিল' (১৭ই মার্চ, ১৯৪৩) পরিচালনা। কলকাতার বস্তিঅঞ্চলসহ উত্তর ও দক্ষিণ শহরতলীর প্রায় ৫,০০০ মহিলা শোভাযাত্রা সহকারে খাদ্যের দাবিতে এবং উচ্চমূল্যের প্রতিবাদে ঐদিন বিধানসভা অভিমুখে যাত্রা করেন। ছেঁড়া ন্যাকড়ার ফালি পরা হাড্ডিসার শত সহস্র মায়ের দল তাঁদের হাড়-জিরজিরে মুমূর্ষ শিশু কোলে নিয়ে কলকাতাবাসীর চেতনায় সেদিন যেন কশাঘাত হেনেছিলেন; ওই বিশালকায় কঙ্কালসার মহিলা-মিছিলের সুশৃঙ্খল ও দৃপ্ত দাবির কাছে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক ছিলেন একেবারেই অসহায়। একশ বস্তা চাল ওই মিছিলকারীদের হাতে তাঁকে সেদিনই তুলে দিতে হয়েছিল।

রেণু চক্রবর্তী লিখেছেন, এটাই হলো মহিলাদের প্রথম সংগ্রামী মোর্চা—যা নাড়িয়ে দিয়ে গেল গোটা শহরকে, পিঠ সোজা করে বসতে হলো সরকারকে। নারী-আন্দোলনে এক নতুন পর্যায় এলো। সম্পূর্ণ মধ্যবিত্ত সমাজের আন্দোলন থেকে কলকাতার মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি পৌঁছল শ্রমিক-গৃহিণীদের স্তরে এবং তাদের বাণী পৌঁছে দিল গ্রামের দরিদ্র মানুষের কাছে।[৪৪] কলকাতার অনুসরণে কমিউনিস্ট মহিলাদের এই ধরনের ভুখামিছিল ছড়িয়ে পড়ল বাঁকুড়া, পাবনা, ফরিদপুর, বরিশাল, রংপুর, জলপাইগুড়ি, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলাতেও। একই সঙ্গে চলতে থাকল ফ্যাসিস্ত-বিরোধী প্রচার।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, বাঙলার নারীসমাজের এই ব্যাপক ভিত্তিক গণ-আন্দোলন এবং সংগঠন গড়ে তুলবার পশ্চাতে ছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সুপরিকল্পিত নেতৃত্ব। কেবলমাত্র বাঙলাতেই নয়, কেরল, অন্ধ্র, আসাম, পঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশগুলিতেও নারী-আন্দোলন এই সময়কালে সংগঠিত রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। কিন্তু বাঙলাই ছিল এর প্রধান কর্মকেন্দ্র। ১৯৪২-এর ২২শে জুলাই পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ার পরই মহিলা ফ্রণ্টকে সংগঠিত করার বিশেষ পরিকল্পনা কমিউনিস্ট পার্টি গ্রহণ করে। ইতিমধ্যেই কলকাতা এবং বিভিন্ন জেলায় পার্টি-সদস্য মহিলাকর্মীরা কমিউনিস্ট পার্টির জেলা কমিটিগুলির নেতৃত্বে কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন। নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হওার পরে মহিলা ফ্রণ্টের কাজ পরিচালনার জন্য প্রাদেশিক কমিটি ও জেলা কমিটির সদস্যদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব দেওয়া হয়। মহিলাদের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষার ক্লাস সংগঠিত করে কর্মী তৈরি করা হতে থাকে। প্রাদেশিক স্তরে ও জেলাস্তরে মহিলা ফ্রণ্টের নেতৃত্বকে গড়ে তুলবার জন্য মহিলা পার্টি-সদস্যদের পার্টি সেল ও ফ্রাকশন গঠন করা হয়। প্রাদেশিক কমিটির তরফ থেকে সারা প্রদেশের নারী-আন্দোলনকে সংগঠিতভাবে পরিচালনা করার জন্য পাঁচ জন মহিলা সদস্যকে নিয়ে প্রাদেশিক মহিলা ফ্রাকশন ও পরে প্রাদেশিক স্পেশাল সেল গঠন করা হয়। এঁদের মধ্যে ছিলেন মণিকুন্তলা

সেন, রেণু চক্রবর্তী, কমলা মুখার্জি, যুঁইফুল রায় ও কনক মুখার্জি। প্রথম তিনজন শুরু থেকেই যুক্ত ছিলেন মহিলা আত্মরক্ষা সংগঠন কমিটির সঙ্গে। যুঁইফুল রায় পরে বরিশাল থেকে কলকাতায় আসেন। পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হওয়ার পর কনক মুখার্জি আণ্ডার-গ্রাউণ্ড জীবন পার হয়ে প্রকাশ্যে এসে ছাত্রফ্রণ্ট ছেড়ে মহিলা ফ্রণ্টে যোগদান করেন।[৪৫]

কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক দপ্তরেই (২৪৯, বহুবাজার স্ট্রীট, কলকাতা) ছিল বাঙলার মহিলা ফ্রণ্টের দপ্তর। সেখান থেকে কমিউনিস্ট পার্টির মহিলা ফ্রণ্টের নামে একটি মাসিক সংবাদ বুলেটিন প্রকাশ করা হতে থাকে। এই বুলেটিনের দ্বিতীয় সংখ্যায় (মার্চ, ১৯৪৩) প্রকাশিত হয় :

"৬ মাসের মধ্যে আমাদের পার্টির মধ্যে মেয়ে সভ্য ১৫১ জন, পার্টি দরদী ৪৩৮ জন, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সদস্য সংখ্যা ৫৯৫৭ ও ৮৯টি মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি গড়িয়া উঠিয়াছে...।"[৪৬]

এই বুলেটিনে পার্টির মহিলা সদস্যদের জন্য যে কর্তব্য পালনের দায়িত্ব ঘোষিত হয়েছিল তা নিম্নরূপ :

১) পার্টিকে মহিলাসাধারণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

২) প্রত্যেকটি দরদী সমর্থককে কর্মী করে তুলতে হবে।

৩) আত্মরক্ষার ভিত্তিতে মহিলাসাধারণকে একত্রিত করতে হবে।

৪) পড়তে পারেন এমন প্রত্যেক মহিলার হাতে 'জনযুদ্ধ' দিতে হবে।

৫) আত্মরক্ষা সমিতিকে রাজনৈতিক স্তরে তুলতে হবে।[৪৭]

অবশ্য কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশে ও পরিচালনায় 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি' পরিচালিত হতে থাকলেও তা কিন্তু কোনো সঙ্কীর্ণতার মধ্যে কখনো আবদ্ধ থাকেনি। দেশরক্ষামূলক প্রচার-আন্দোলনের কাজ, দুর্ভিক্ষ-পীড়িত এবং দুস্থ মানুষকে রিলিফ দেওয়া, তাদের সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সাহায্য করার উদ্দেশ্যে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি সংগঠিতভাবে দলমত নির্বিশেষে অন্যান্য মহিলা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্তভাবেই কাজ করেছে। যেমন, নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন (A. I. W. C.), কংগ্রেস মহিলা সংঘ, মুসলিম লীগ মহিলা সমিতি, মুসলিম নারী আত্মরক্ষা সমিতি, হিন্দু মহাসভা মহিলা সমিতি, খ্রীস্টান মহিলা সমিতি প্রভৃতির সঙ্গে একত্রে কাজ করেছে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি। এদের মধ্যে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির ভূমিকাই ছিল মুখ্য, একথা বিনা দ্বিধায় বলা যায়।

যাহোক, কলকাতার মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির প্রথম সম্মেলন হয় ১৯৪৩-এর ২৮ এবং ২৯শে এপ্রিল। প্রায় ৫০০ মহিলা এই সম্মেলনে যোগদান করেন। এঁরা প্রধানত বস্তি এলাকার এবং মধ্যবিত্ত পরিবারের মহিলা। ২৮শে এপ্রিল (১৯৪৩) প্রকাশ্য অধিবেশন হয় আর্য সমাজ হলে। প্রবীণ কংগ্রেসকর্মী মোহিনী দেবী এই সভায় সভানেত্রীত্ব করেন। তিনি মুক্তকণ্ঠে সমিতির কাজের প্রশংসা করেন এবং এই সংকটের দিনে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। সংগঠন-সম্পাদিকা

এলা রীড মূল প্রতিবেদনটি সভায় পেশ করেন। কমলা চ্যাটার্জি, মণিকুন্তলা সেন ও রেণু চক্রবর্তী প্রস্তাবের উপর তাঁদের নিজস্ব বক্তব্য তুলে ধরেন। শ্রমিকশ্রেণীর এবং অপেক্ষাকৃত দরিদ্র শ্রেণীর মহিলাদের এই সভায় যোগদান ছিল একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।[৪৮]

কলকাতা সম্মেলনের কিছুদিন পরে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির প্রথম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৩-এর ৭-৮ই মে, কলকাতার ওভারটুন হলে। বাঙলায় নারী-আন্দোলনের ইতিহাসে এটি একটি স্মরণীয় ঘটনা। বহু মহিলা 'মহাত্মা গান্ধীর ও জাতীয় নেতাদের মুক্তি চাই', 'ফ্যাসিস্ত হামলাবাজ মুর্দাবাদ', 'সকলের জন্য খাদ্য চাই' ইত্যাদি ধ্বনি দিতে দিতে দলে দলে হেঁটে সভায় আসেন। সম্মেলনে প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত হন সুদূর চট্টগ্রাম থেকে মেদিনীপুর, উত্তরবঙ্গের রংপুর থেকে কলকাতা এবং নিকটবর্তী জেলাগুলো থেকে মহিলাকর্মীরা। অবিভক্ত বাঙলার ২১টি জেলার প্রতিনিধিদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে গঠিত হয় 'নিখিল বঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি' এবং এরই মধ্য দিয়ে নারী-আন্দোলন বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করে।

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির এই প্রথম রাজ্য সম্মেলনেব একটি অসাধারণ সংবাদচিত্র পাওয়া যায় রেণু চক্রবর্তীর লেখায়। তিনি লিখেছেন:

"শতাধিক ডেলিগেট ও চার শতাধিক দর্শকে একেবারে ভরে যায় ওভারটুন হল। সম্মেলনে যোগদানকারীদের মধ্যে শহর-নগর থেকে যাঁরা আসেন তাঁদের অর্ধেক প্রায় শ্রমিকশ্রেণীর এবং শহরের দুর্বলতর শ্রেণীর, বাকী অর্ধেক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। আর জেলা থেকে যাঁরা আসেন তাঁদের অধিকাংশই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে নারী আন্দোলন এখন আর শুধু মধ্যবিত্ত মহিলাদের মধ্যেই সীমিত হয়ে নেই। শ্রমিক-কৃষক-বস্তিবাসী মহিলারা তা নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছেন।

"পোস্টারে পোস্টারে অপরূপ হয়ে উঠেছিল হল। এই সব পোস্টারে মূর্ত হয়ে উঠেছিল মহিলাদের খাদ্যের জন্য লড়াই, ফ্যাসি-প্রতিরোধ, জাতীয় নেতাদের মুক্তি এবং জতীয় ঐক্যের জন্য প্রচেষ্টার দৃঢ় সংকল্প।

"এই সব পোস্টারের পাশাপাশিই ছিল সেই সব সোভিয়েট নারীদের পোস্টার, যাঁরা নিজেদের এবং সমগ্র নারী জাতির মুক্তির জন্য লড়ছিলেন। এই সব ছবি সভায় উপস্থিত মহিলাদের উদ্দীপনা যোগায়। বিশেষ করে নিরক্ষর মহিলাদের কাছে এই সব পোস্টারের ছবির বাণী মুখের শত কথার চেয়ে অনেক বেশী সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। শিক্ষা-সংস্কৃতিহীন পরিমণ্ডল থেকে আসা এই সব মহিলাদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য পোস্টার, ছবি, গান, নাটক ইত্যাদি বহুপ্রকার উপায় অবলম্বন করতে হত ঐ সব দিনে।

"পোস্টার ছাড়াও ছিল হস্তশিল্পের একটি প্রদর্শনী। এই প্রদর্শনীতে দেখাবার চেষ্টা হয় যে ওই তীব্র অর্থসংকটের দিনে, নেহাতই সাময়িক এবং সামান্য

হলেও হাতের কাজ করে কিছু উপার্জন করা যেতে পারে।

"বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারের শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী সভানেত্রী নির্বাচিত হন। তাঁকে স্বাগত জানাবার জন্য ব্যাণ্ড নিয়ে আসে জলি ক্লাবের মেয়েরা। প্রতিনিধিদের স্বাগত জানান শ্রীমতী হেমলতা মিত্র। সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে বাণী পাঠান শ্রীযুক্তা অবলা বসু, রেণুকা রায় এবং হাজরা বেগম।

"শ্রীমতী এলা রীড তাঁর প্রতিবেদনে বলেন যে, এক বৎসর আগে যখন ভারতের মাটিতে জাপানী বোমা পড়ে, তখন থেকেই মেয়েদের মনে ফ্যাসি-বিরোধী চেতনা জাগে। তারা বুঝেছে যে নিজেদের রক্ষা, সেই সঙ্গে দেশ-রক্ষা এবং ফ্যাসিস্তদের ঠেকাতে হলে, এক সঙ্গে হতে হবে। তারপর দেশের এই সাংঘাতিক দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বস্ত্রসংকট, এসবের মোকাবিলা করতে তারা বদ্ধপরিকর হয়। তিনি আরো বলেন যে, সে-দিনের এই এতটুকু সংগঠন আজ এই বিরাট সংগঠন হয়েছে, যার সভ্য-সংখ্যা ২২,০০০।

"খাদ্য-সংকট সম্বন্ধে প্রস্তাবটি পেশ করেন মণিকুন্তলা সেন। সমর্থন করেন বরিশালের যুঁইফুল রায়। অধ্যাপিকা কল্যাণী সেন উত্থাপন করেন হস্ত-শিল্পের বিকাশের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধীয় প্রস্তাব। সমর্থন করেন বরিশালের মনোরমা বসু।

"যুগ যুগ ধরে মেয়েরা যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের অবিচার সয়ে আসছে, সে সম্বন্ধে বলেন অপর্ণা সেন। আর কালবিলম্ব না করে মেয়েদের এখনই এ নিয়ে সংগ্রাম আরম্ভ করতে বলেন তিনি।

"কল্যাণী মুখার্জি বুঝিয়ে বলেন কিভাবে রাজনীতি জড়িয়ে থাকে জীবনের নানা সমস্যার সঙ্গে এবং সে কারণেই তা বর্জন করা যায় না। জাপানী আক্রমণ, খাদ্যসমস্যা, বস্ত্রসমস্যা সব কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে আছে নেতাদের মুক্তি, কংগ্রেস, মুসলিম লীগ প্রভৃতি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের যুক্ত একটি জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্নটি। অতএব মেয়েদের এগুলির জন্যও লড়তে হবে। প্রস্তাবটি সমর্থন করেন ঢাকার নিবেদিতা চৌধুরী।

"আর একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হয় সোভিয়েত নারীদের অভিনন্দন জানিয়ে এবং ফ্যাসি-বিরোধী যুদ্ধের জন্য একটি দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলার দাবির ওপর।

"রাজ্য কমিটির সভানেত্রী হন ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী, সহ-সভানেত্রী, সম্পাদিকা এবং দুইজন সহ-সম্পাদিকা নির্বাচিত হন যথাক্রমে শ্রীমতী ডি. এম. বসু, এলা রীড এবং মণিকুন্তলা সেন ও অমিয়া দেবী।"[৪৯]

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির এই প্রথম সম্মেলনের ঐতিহাসিক বিবরণ থেকে একথা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এইসময় সমিতি কেবলমাত্র ফ্যাসিস্ত-বিরোধী প্রচার, ত্রাণ ও সেবামূলক কাজই করত না, নিম্নবর্গের মহিলাদের আর্থিক স্বয়ম্ভরতা অর্জনের প্রশ্নটিরও তারা সমাধান করেছিল কুটির ও হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ দেওয়ার মাধ্যমে। সমিতির প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে এজন্যই গড়ে ওঠে 'নারী সেবা সংঘ'।

এই সংঘ একদিকে যেমন নানা ত্রাণমূলক কাজ পরিচালনা করত, তেমনি যুদ্ধ ও মন্বন্তরের সময় যৌন-রোগের শিকারে পরিণত হাজার হাজার অসহায়া পতিতা মেয়েদেরও বেশ্যাবৃত্তির অন্ধকার সুড়ঙ্গ থেকে আলোয় নিয়ে আসার দায়িত্বও গ্রহণ করেছিল। এদিক থেকে সংঘের প্রচেষ্টা ছিল সত্যিই অতুলনীয়।[৫০]

'নারী সেবা সংঘ' গড়ে ওঠে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি এবং অন্যান্য বেসরকারী ও মিশনারী ত্রাণ সংগঠনগুলির মিলিত উদ্যোগে। এলা রীড ছিলেন এর প্রধান উদ্যোক্তা। এই সংঘের (প্রতিষ্ঠা-১৯৪৪) সভাপতি হন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং সম্পাদকদ্বয় ছিলেন শ্রীমতী সীতা চৌধুরী ও ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।[৫১] নিরাশ্রয়, নিরালম্ব, অসহায় ও অনাথ মেয়েদের সামাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠা করাই ছিল 'নারী সেবা সংঘে'-র প্রধান উদ্দেশ্য।

যাহোক, কিছুকালের মধ্যেই মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত হয় বাঙলার সর্বত্র, সব জেলাতেই। বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের বরিশাল, চট্টগ্রাম. ময়মনসিংহ প্রভৃতি বোমা-বিধ্বস্ত জেলাগুলিতে ত্রাণ ও সেবামূলক কাজের মাধ্যমে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। প্রথম দিকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং রক্ষণশীল সমাজ থেকে এদের কাজকর্মে তীব্র বাধার সৃষ্টি করা হয়েছিল। সমিতির বিরুদ্ধে সত্যিই সেদিন নিন্দা ও কুৎসার বান ডেকেছিল। এর পশ্চাতে অবশ্য কমিউনিস্ট-বিরোধী ও ফ্যাসিস্ত-সমর্থক রাজনৈতিক দলগুলিও সক্রিয় ছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সর্বস্তরের জনগণের ব্যাপক সমর্থন পেতে শুরু করে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি।

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সাধারণ সম্পাদিকা এলা রীড ১৯৪৩-এর জুলাই মাসে সমিতির বুলেটিনের প্রথম সংখ্যায় 'নতুন কি কি কাজ করা দরকার' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে লেখেন :

> "আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি যা ছিল এবং আছে সব বিষয়ে সচেতন আমরা হতে পেরেছি এবং সেসব দূর করতেও আমরা পারব। কারণ আমরা সখের সমিতি গড়িনি। নিজেকে বাঁচানো, দেশকে বাঁচানোর দায়দায়িত্ব নিয়েই আমরা বাঙলাদেশব্যাপী সক্রিয় দল গড়ে যাচ্ছি। এই ধরনের মহিলা আন্দোলন ও সংগঠন শুধু বাঙলাদেশে কেন ভারতবর্ষেই এই নতুন। আমরা ভরসা করি আমাদের কর্মীগণ যে অক্লান্ত পরিশ্রমে এই সমিতির গোড়াপত্তন করেছেন তাকে শেষ উদ্দেশ্য পর্যন্ত ধীরে ধীরে এগিয়ে নিতে তারা নিশ্চয়ই পারবেন, এ কাজে লোক পাওয়া যায় না, টাকা পাওয়া যায় না—তা ভুল। ঠিক মত বোঝাতে পারলে, ঠিক জায়গায় আঘাত করতে পারলে দলে দলে কর্মী আমরা পাবো—পরিচালনার অর্থ আমরা পাবো। বাঙলার মেয়েরা আত্মরক্ষায়, দেশরক্ষায় তাদের যোগ্য স্থান নিশ্চয়ই নেবে—যোগ্যতার পরিচয় নিশ্চয়ই দেবে।"[৫২]

একথা সত্যি, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির কাজে অর্থের অভাব ঘটত প্রায়শই।

বিশেষ করে কমিউনিস্ট মেয়েদের সংগঠন এই অভিযোগে প্রথম দিকে 'বেঙ্গল রিলিফ কমিটি' (যার সভাপতি ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়) সমিতিকে অর্থসাহায্য করতে আদৌ ইচ্ছুক ছিল না।[৫৩] অথচ কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের মহিলা নেত্রীবৃন্দ, যেমন—স্নেহলতা গাঙ্গুলি, নির্মলবালা সান্যাল এবং শাহাজাদী খাতুন কিংবা শবেদা খাতুন সমিতির অনেক সম্মেলনেই উপস্থিত ছিলেন। 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'র কমিউনিস্ট সংগঠকগণও সবসময় চেষ্টা করতেন কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের সমর্থক মহিলা নেত্রীদের সমিতির কাজে বেশি মাত্রায় যুক্ত করতে।

এরপর মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির দ্বিতীয় সম্মেলনটি হয় বরিশালে (মে, ১৯৪৪)। ইতিমধ্যে প্রায় প্রতিটি জেলা ও মহকুমা স্তরেও মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বরিশাল সম্মেলনের সময় সমিতির সদস্য সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল প্রায় ৪৫,০০০। বরিশালের সর্বজন শ্রদ্ধেয়া মনোরমা বসু (যিনি 'মাসীমা' নামেই সুপরিচিত) ছিলেন বরিশাল সংগঠনের প্রধান উদ্যোক্তা। তাঁর পরিচালিত 'মাতৃমন্দির' ছিল সমিতির কাজের প্রধান কেন্দ্র। যাহোক, বরিশাল সম্মেলন অত্যন্ত সফল হয়েছিল, এর পরেই সমিতির প্রভাব আরও দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এই সম্মেলন প্রসঙ্গে মণিকুন্তলা সেন লিখেছেন :

"কলকাতা থেকে পশ্চিমবঙ্গের সব জেলার প্রতিনিধিরা একসঙ্গে এলেন। যশোর, খুলনা থেকেও মহিলারা এলেন এদের সঙ্গে। আমরা বরিশাল জেলার প্রতিনিধিরা প্রায় দু'তিনশো মেয়ে, সুসজ্জিত মিছিল নিয়ে স্টীমার ঘাটে সকাল বেলা অতিথিদের অভ্যর্থনা করতে গেলাম। ফেরার সময় বড় রাস্তাগুলো ঘুরে শ'চারেক মেয়ের মিছিল এগিয়ে চললো। রাস্তার দু'পাশে দর্শকদের ভিড়। এমন দৃশ্য এ শহরে নতুন। আমাদের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, যুদ্ধ-বিরোধী স্লোগান, বন্দীমুক্তি আর নারী ও শিশুর মানপ্রাণ রক্ষার দাবিতে স্লোগান শুনে সবাই অনেকটা বুঝতে পারলেন সম্মেলনে আমরা কি করতে যাচ্ছি।"[৫৪]

এইভাবে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি বাঙলার ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনে নিঃসন্দেহে এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেছিল। সমাজের পশ্চাৎপদ এবং নিরক্ষর অংশের নারীদের, বিশেষ করে রক্ষণশীল মুসলিম নারীদের সংগঠিত করে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনে সামিল করার কাজে সমিতি অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। এর প্রধান কৃতিত্ব অবশ্য সেইসব কমিউনিস্ট নারী-কর্মীদের, যাঁরা এর জন্য দিবারাত্রি পরিশ্রম করেছিলেন।

৬. ফ্যাসিস্ত-বিরোধিতায় অন্যান্য গণসংগঠনের ভূমিকা :

জনযুদ্ধের নীতি অনুসারে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী কার্যধারা সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছে দেবার উদ্যোগ বাঙলার কমিউনিস্ট পার্টি গ্রহণ করে। এরকম কয়েকটি গণসংগঠন বা গণকমিটি গড়ে উঠেছিল জনযুদ্ধের যুগেই। সমাজের নানা স্তরের ব্যাপক অংশের জনসাধারণকে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করাই ছিল এক্ষেত্রে

কমিউনিস্ট পার্টির প্রধানতম লক্ষ্য। তাছাড়া কার্যসূচী রূপায়ণেও স্বয়ংসম্পূর্ণ গণসংগঠনগুলি অতিদ্রুত নিজস্ব দায়িত্ব পালন করতে পারে বলে এগুলির উপর পার্টি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। এরকমই তিনটি সংগঠন বা গণকমিটি হলো : (ক) কিশোর বাহিনী, (খ) জনরক্ষা সমিতি, (গ) পিপল্‌স রিলিফ কমিটি (P. R. C)। এগুলির সংক্ষিপ্ত কার্যধারা নীচে তুলা ধরা হলো :

ক) কিশোর বাহিনী :

প্রাক্তন ছাত্রনেতা গৌতম চট্টোপাধ্যায় 'কিশোর বাহিনী'র উদ্ভব সম্পর্কে এক প্রবন্ধে লিখেছেন :

"…ফ্যাসিবাদের প্রচ্ছন্ন সমর্থক ও ঘোরতর কমিউনিস্ট-বিরোধী, কলকাতার বহুল প্রচারিত একটি দৈনিক পত্রিকা কিশোরসমাজের মধ্যে নিয়মিত ও পরিকল্পিতভাবে সোভিয়েত বিরোধিতা ও কমিউনিস্ট বিরোধিতার বিষ ছড়াতে থাকে। তার বিরুদ্ধে প্রগতিশীল মতাদর্শে কিশোরদের উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে, সাধারণভাবে ছাত্র ফেডারেশনের ও বিশেষভাবে অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে একটি সহযোগী সংগঠন—কিশোর বাহিনী। বাঙলাদেশের হাজার হাজার ছেলেমেয়ে এই সংগঠনের পতাকার নীচে দেশপ্রেম, জনসেবা ও সমাজতন্ত্রের আদর্শে সংগঠিত হয়। পরবর্তীকালে এই সংগঠনের অবিসংবাদী নেতা হয়ে ওঠেন প্রতিভাবান তরুণ কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য। দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে জনসেবার কাজে সর্বত্র অগ্রণী হয় কিশোর বাহিনীর ছেলেমেয়েরা, প্রশংসা অর্জন করে বয়োজ্যেষ্ঠদের, দলমত নির্বিশেষে।"[৫৫]

'কিশোর বাহিনী' গঠিত হওয়ার সংবাদ প্রকাশিত হয় 'জনযুদ্ধ' পত্রিকায়। এই পত্রিকায় লেখা হয় :

"…'কিশোর বাহিনী' গড়ে ওঠে ১৩৪৯ সালের ১লা বৈশাখ। কলকাতায় কিশোর দল ভারতসভা হলে সমবেত হয়। তিনশো ছোট্ট ছেলেমেয়ে। সব পাড়ার মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়ে। কিছু কিছু বড় ঘরের ছেলেমেয়েও এসেছে। সবার মুখে আনন্দ হাসি। আজ 'কিশোর বাহিনী'র উদ্বোধন। নিজের সভা তারা নিজেরাই চালাচ্ছে।"[৫৬]

এ-প্রসঙ্গে সরোজ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন :

"কিশোর বাহিনী গড়ে তোলার পশ্চাতে অন্যতম প্রধান অবদান ছিল তরুণ কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য-র। সেই সময় সপ্তাহে একদিন জনযুদ্ধের পাতার একটি অংশ বরাদ্দ থাকত 'কিশোর বাহিনী'-র জন্য, তার সম্পাদক ছিলেন সুকান্ত ভট্টাচার্য। কিশোর বাহিনীর আদর্শ 'জনযুদ্ধ' পত্রিকায় মাধ্যমে প্রচারিত হলো :

"কিশোর বাহিনীর আদর্শ :

শিক্ষা! স্বাস্থ্য! সেবা! স্বাধীনতা!

••• ••• ••• •••

"হিন্দু-মুসলমান, চাষী-মজুর, গরীব-বড়লোক সব ছেলেমেয়েই আমরা কিশোর বাহিনীতে এক হব। আমাদের নিজেদের একতায় আর দেশের লোকের সহানুভূতিতে যতটা সম্ভব আমরা আমাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খেলাধূলা, আমোদ-উৎসবের অভাব পূর্ণ করব।

"আমরা বুঝি জাপানী ডাকাতদের হাত থেকে আমাদের সোনার দেশকে বাঁচাবার জন্য বাপ-মায়ের সাথে আমাদেরও লাগতে হবে। আমাদের ছোট্ট শক্তিতে যতটুকু সম্ভব সাহায্য করতে হবে।

"সোভিয়েট ও চীনের বীর ছেলেমেয়েদের আদর্শে পৃথিবীর সমস্ত ছেলে-মেয়েদের সাথে আমরাও এক হয়ে দাঁড়াব।"[৫৭]

বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, 'কিশোর বাহিনী'র তরুণ সংগঠকেরা সত্যিই কিশোর-কিশোরীদের দেশরক্ষা ও ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আদর্শেই অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছিল। বাঙলার কিশোর বাহিনীর সংগঠক অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য একটি পুস্তিকায় লিখেছিলেন:

"হিটলারী ফ্যাসিবাদের দানবীয় যুদ্ধের সময় শিশুদের খাঁটি স্বদেশপ্রেম শেখবার, দেশপ্রেমিক সৈনিক হিসেবে গড়ে উঠবার কেন্দ্র চাই—তাদের একটি প্রতিষ্ঠান চাই। এখানেই বাঙলার কিশোর আন্দোলন ও কিশোর সংগঠন 'কিশোর বাহিনী'-র ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা। কিশোরদের বাদ দিয়ে দেশকে রক্ষা করা যাবে না, দেশের মানুষকে দুর্ভিক্ষ ও খাদ্যাভাবের হাত থেকে বাঁচাতে পারা যাবে না।"[৫৮]

জনযুদ্ধের পাতায় সুকান্ত ভট্টাচার্য লিখলেন—'দরদী কিশোর'-এর কাহিনী। কিভাবে একটি কিশোর ছেলে কয়েকদিনের মধ্যে একটি কিশোর বাহিনীর ভলান্টিয়ার দল গঠন করতে সক্ষম হলো, তাকে নিয়েই রচিত হয়েছিল এই উদ্দী-পনাময় কাহিনী।[৫৯]

মোটকথা, দ্রুতগতিতে কিশোর বাহিনী গড়ে উঠতে শুরু করে পাড়ায় পাড়ায়, জেলায়-জেলায়। কিশোর বাহিনীর জন্য সদস্য কার্ড-এর প্রচলন হলো। অবশ্য পালনীয় কর্তব্যসমূহের মধ্যে যেগুলো উল্লেখযোগ্য তা হলো: ১) নানারকম খেলাধূলা ও আমোদ প্রমোদ, ২) ব্যায়াম ৩) গান শেখা, ৪) বনভোজন বা ভ্রমণ, ৫) হপ্তায় একদিন বা দুদিন বসে নিজের দেশের বা অন্যদেশের কথা ও ঘটনা আলোচনা করা, ৬) কুচকাওয়াজ, লাঠি ও ছোরা খেলা শেখা, ৭) হাতে লেখা বা ছাপানো পত্রিকা প্রভৃতি প্রকাশ করা, ৮) লাইব্রেরী করা ও রচনা প্রতিযোগিতা চালানো, ৯) খাদ্য সরবরাহের লাইনে স্বেচ্ছাসেবক হওয়া, সমাজসেবা, সভা-সমিতি ও অন্যান্য জনহিতকর কাজ করা।[৬০]

কিশোর বাহিনীর উদ্যোগে বাস্তবিকপক্ষেই কলকাতা ও জেলা শহরগুলির

বহুস্থানে দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের জন্য লঙ্গরখানা খোলা হয়েছিল এবং ফ্যাসিস্ত-বিরোধী জনসেবামূলক কাজে এদের নিযুক্ত করা হয়েছিল। 'জনযুদ্ধে' নিয়মিত এইসব সংবাদ প্রকাশিত হতো। 'কিশোর বাহিনী' পরিচালিত হতো 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন'-এর অফিস ৮/২, ভবানী দত্ত লেন, কলিকাতা থেকেই। তরুণ কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য-র সুদক্ষ নেতৃত্ব আর পরিচালনায় 'কিশোর বাহিনী' অল্পদিনের মধ্যেই সাধারণ মানুষের দৃষ্টি ও ভালোবাসা আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল।

খ) জনরক্ষা সমিতি :

১৯৪৩ সালের ভয়াবহ মন্বন্তরের সময় থেকেই খাদ্য-সঙ্কট, কালোবাজারী, খাদ্য পাচার, মজুতদারী প্রভৃতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে 'জনরক্ষা সমিতি' গড়ে উঠতে থাকে বাঙলার প্রতিটি জেলায়, শহরে-গ্রামে সর্বত্র। সমস্ত গণসংগঠন, অর্থাৎ শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-মহিলাদের মধ্য থেকেই জনরক্ষা সমিতির সদস্য সংগৃহীত হতে থাকে। কলকাতায় জনরক্ষা সমিতির আন্দোলন ব্যাপক রূপ পরিগ্রহ করে। সরকারী দোকান থেকেই সে-সময় গাড়ি-গাড়ি আটা-চাল পাচার হতো। সরকারী আমলাতন্ত্র এই কুকাজে মজুতদারদেরই সাহায্য করত এবং এর বিরুদ্ধেই গড়ে ওঠে এক প্রচণ্ড আন্দোলন।

এইসব সমস্যা আলোচনার জন্যই ১৯৪৩ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি থেকে কয়েক-দিন ধরে খাদ্য ও জনরক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে ভূপেশ গুপ্ত-র উপরেই এ-সম্পর্কিত দায়িত্ব অর্পিত হয়। কলকাতার টাউন হলে অনুষ্ঠিত হয় সর্বভারতীয় খাদ্য সম্মেলন। এই প্রসঙ্গে সরোজ মুখোপাধ্যায় তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন :

> "প্রতিটি জেলায়, প্রতিটি মহকুমায় খাদ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সারা এপ্রিল মাস ধরে। হুগলী, মেদিনীপুর, যশোহর, নদীয়া, ময়মনসিংহ, হাওড়া, রংপুর, রাজশাহী প্রভৃতি জেলা থেকে প্রেরিত সম্মেলনের রিপোর্ট 'জনযুদ্ধের' পাতায় প্রকাশিত হতে থাকে।
>
> "ঢাকা শহরে ও পল্লী অঞ্চলে ৬৫ টির ও বেশি জনরক্ষা কমিটি গঠিত হয়েছিল।
>
> "খাদ্যসঙ্কটের সমাধানের জন্য কমিউনিস্ট পার্টি স্বেচ্ছাবাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। এক আবেদনে বলা হয় :
>
> "১লা মে-র মধ্যে বাঙলায় ১৫,০০০ সুশিক্ষিত, শৃংখলাবদ্ধ ভলান্টিয়ার করিতে হইবে—যাঁরা খাদ্যসংকট সমাধানে, এ. আর. পি-র কাজে, আত্মরক্ষার চেষ্টায় জনগণকে পরিচালিত করিতে ও সাহায্য দিতে পারিবেন। যাঁরা পঞ্চম বাহিনীকে কোণঠাসা করিতে পারিবেন। যাঁরা বোমার হামলার সময় দেশবাসীর মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবেন।"[৬১]

অল্পকালের মধ্যেই বাঙলার জেলায় জেলায় এই স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহের কাজ

শুরু হয়ে যায় পুরোদমে। বিশেষ করে 'কৃষক সভা' জনরক্ষা সমিতির স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠনে সব থেকে অধিক সাফল্য প্রদর্শন করে। রংপুর জেলার নাম এক্ষেত্রে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।

কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে সেই সময় কলকাতা ও সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে যে অ্যান্টি রেইড প্রিকশান বা A. R. P. ভলান্টিয়ার্স গড়ে তোলা হয়, জনরক্ষা সমিতির স্বেচ্ছাসেবকেরা তাতেও সক্রিয় ছিল। এই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর উপর দায়িত্ব ছিল কলকাতা শহরে জাপানী বোমারু বিমান হানার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ও আক্রান্তদের সাহায্য করা। ১৯৪২ সালের ২০শে ডিসেম্বর থেকেই বারংবার জাপ-বোমারু বিমানের হানা কলকাতা ও শহরতলীতে শুরু হয়ে যায়। কমিউনিস্ট পার্টি এই সময় এ. আর. পি. স্বেচ্ছাসেববকদের একই সঙ্গে ব্যবহার করতে থাকেন আক্রান্তদের সাহায্য ও ফ্যাসিবাদ-বিরোধী প্রচারকরূপে।

১৯৪৩ সালের 'জনযুদ্ধ' পত্রিকায় 'বাঙলার বক্ষে আবার জাপ হানা' শীর্ষক একটি সংবাদে লেখা হয়:

"বাঙলা বিপজ্জনক এলাকা বলে ঘোষিত। আত্মরক্ষার জন্য, সকলের জীবন রক্ষার জন্য এ. আর. পি-কে ভালোভাবে চালু করুন। শেলট্যারের ব্যবস্থা করুন। আগুন নেভানোর দল বাড়ান। এ. আর. পি-র গলদ দূর করুন।"[৬২]

এই সব বিবরণের মধ্য দিয়ে সহজেই বোঝা যায় যে, উপরোক্ত কাজকে কমিউনিস্ট পার্টি সেই সময় কতখানি গুরুত্ব দিয়েছিল।

১৯৪৩ সালে গড়ে ওঠা পি. আর. সি এবং পিপলস্ ফ্লাড কমিটি সেইসময় মন্বন্তর, মহামারী, বন্যা ও জাপ বোমারু বিমান আক্রমণের বিরুদ্ধে এক অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছিল। সাধারণভাবে এই জাতীয় জনকল্যাণকর সমিতিগুলিতে সর্বদলের অস্তিত্ব থাকলেও তা প্রধানত পরিচালিত হয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টি, বিশেষ করে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী সংগঠনগুলির দ্বারা।

'পিপলস্ রিলিফ কমিটি' গঠিত হয় ১৯৪৩ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর। অবশ্য তারও পূর্বে, ঐ বছরের আগস্ট মাসে, 'পিপলস্ ফ্লাড কমিটি' গঠিত হয় দামোদর ও অজয় নদের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত লক্ষ লক্ষ নরনারীকে সাহায্যের জন্য। সরোজ মুখার্জি এ-প্রসঙ্গে লিখেছেন:

"কৃষক-সভা ও মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সঙ্গে রিলিফের কাজে যোগ দেয় পিপলস্ রিলিফ কমিটি ও বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন। ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ ও সোভিয়েত সুহৃদ্ সমিতির কর্মীরাও রিলিফের কাজে এগিয়ে এসেছিলেন। সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে সভাপতি এবং অধ্যাপক নীরেন রায়কে সম্পাদক করে 'পিপলস্ ফ্লাড কমিটি' গঠন করা হয়েছিল।...

"এই সময়েই কমিউনিস্ট পার্টির বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির পক্ষে মুজফ্ফর

আহ্মদ উদ্যোগী হয়ে বিভিন্ন গণসংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে ২৯শে সেপ্টেম্বর (১৯৪৩) ভারত সভা হলে এক সভা ডাকেন। একটি কেন্দ্রীয় রিলিফ সংগঠন গড়ার প্রস্তাব গৃহীত হয়। সংগঠনের নাম দেওয়া হয় 'পিপলস্ রিলিফ কমিটি'। নওসের আলিকে সভাপতি এবং নীরেন্দ্রনাথ রায় ও চৌধুরী মোয়াজ্জেম হোসেনকে (লাল মিঞা) যুগ্ম-সম্পাদক করে ও ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে কোষাধ্যক্ষ করে ২৫ জনের একটি কমিটি নির্বাচন করা হয়। কার্যকরী কমিটিতে ছিলেন—মুজফফ্র আহ্মদ, বঙ্কিম মুখার্জি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়; স্নেহাংশু আচার্য, আবদুল্লাহ রসুল, পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী, আবদুল মোমিন, মহম্মদ ইসমাইল, হীরেন মুখার্জি, জে. সি. গুপ্ত, গোপাল হালদার, সোমনাথ লাহিড়ী, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, এলা রীড, মণিকুন্তলা সেন, কনক মুখার্জি প্রমুখ। ডাক্তারদের মধ্যে ছিলেন ডাঃ বিজয় বসু, ডাঃ নারায়ণ রায়, ডাঃ অমিয় বসু, ডাঃ মণি বিশ্বাস প্রমুখ।"[৬৩]

পি. আর. সি-র এই কমিটিতে যেসব কমিউনিস্ট-সদস্যের নাম রয়েছে এঁরা প্রায় প্রত্যেকেই ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক স্তরের নেতা। সুতরাং এর দ্বারাই বোঝা যাচ্ছে যে, পি. আর. সি-র উপর সেই সময় কমিউনিস্ট পার্টি কতটা গুরুত্ব আরোপ করেছিল। পি. আর. সি-র অফিস ছিল ৬২, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা। এখান থেকেই রিলিফের কাজের মধ্য দিয়েই পি. আর. সি প্রায় প্রতিটি জেলাতেই নিজস্ব শাখা অথবা একটি মেডিকেল স্কোয়াড তৈরি করে। এই সময় পি. আর. সি-এর পরিচালনায় সারা বাঙলায় প্রায় ১৬৭টি লঙ্গরখানা পরিচালিত হতো।[৬৪]

'জনযুদ্ধে'র পাতায় এই সময়পর্বেই ক্ষুধিতের সেবায় সাহায্য প্রেরণের আবেদন জানিয়ে একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই বিবৃতিটিতে স্বাক্ষর করেন। 'ক্ষুধিতের সেবায় সাহায্য করুন: মৃতপ্রায় নরনারীকে বাঁচান' শীর্ষক এই বিবৃতিটিতে বলা হয়:

"বাংলাদেশের ক্ষুধিত ও মৃতপ্রায় নরনারীকে বাঁচাইবার ভার সহৃদয় দেশবাসীরাই না লইলে কে লইবে? সেজন্যই আজ দিকে দিকে দেশবাসীর মধ্যে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। বহু দাতা অকাতরে অর্থ, বস্ত্র ও অন্নদান করিতেছেন, কত জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান ও দেশভক্ত কর্মী ক্ষুধিতের অন্নদান সেবায় অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন।

"কলিকাতা 'জনরক্ষা সমিতি' ও 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি' প্রায় দেড় বৎসর ধরিয়া নানাভাবে সেবাকার্য করিয়া আসিতেছেন। কন্ট্রোল দোকানে জনসাধারণের চাউল পাইবার সুবন্দোবস্ত, পাড়ায় পাড়ায় যথাসাধ্য কয়লা সরবরাহ ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া বুভুক্ষু নরনারীকে বিনামূল্যে বা অল্পমূল্যে খাদ্য দান, শিশুদের মধ্যে খাদ্য বিতরণ ও কলেরা নিবারণের ব্যবস্থা, অনেকগুলি ক্যান্টিন চালানো ইত্যাদি বহু সেবাকার্যের ভার ইহারা

লইয়াছেন। ইহাদের চেষ্টায় ও স্থানীয় মহানুভব জনসাধারণের সাহায্যে বর্তমানে কলিকাতার বিভিন্ন এলাকায় প্রায় ৩৫টি খাদ্য বিতরণ কেন্দ্র হইতে বিনামূল্যে বা অল্পমূল্যে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে প্রায় দশ সহস্র নরনারী ও শিশু প্রত্যহ খাদ্য পাইতেছে।"[৬৫]

বিবৃতিটিতে যাঁরা স্বাক্ষর করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হলেন—'বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ', 'ময়মনসিংহের মহারাজা', 'কাশিম বাজারের মহারাজা' প্রমুখ ধনী জমিদারগণ। শ্রেণীগতভাবে এঁদের কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত কোনো সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকার কথা ছিল না, কিন্তু তৎকালীন পরিস্থিতিতে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী ব্যাপক ফ্রন্ট গড়ার যে সিদ্ধান্ত কমিউনিস্ট পার্টি নিয়েছিল—এ ছিল তারই বাস্তব স্বীকৃতি। তবে অনুমতি হয় যে, এইসব রাজা-মহারাজার স্বাক্ষর-সংগ্রহের পশ্চাতে কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন নেতৃস্থানীয় সদস্য স্নেহাংশুকান্ত আচার্যের বিশেষ প্রচেষ্টা রয়েছে। শ্রীআচার্য নিজেও ছিলেন ময়মনসিংহের রাজপরিবারভুক্ত; সুতরাং তাঁর পক্ষে 'পিপলস রিলিফ কমিটি' বা 'জনরক্ষা সমিতি'তে সমাজের উচ্চকোটির ব্যক্তিদের সমবেত করা সম্ভবপর হয়েছিল।

উপসংহার

১৯৪৪ সালের গোড়াতেই নাৎসী জার্মানীর বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন যে জয়ী হতে চলেছে, এটা প্রায় নিশ্চিত হওয়া গিয়েছিল। কারণ, পূর্ব ও পশ্চিম ফ্রন্টে হিটলার সেই সময় সত্যিই তার ঘর সামলাতে ব্যস্ত ছিল। ইতিমধ্যে ইতালির পতন ঘটেছে এবং জাপানী আক্রমণকেও ব্রিটিশ ও আমেরিকা রুখে দিতে সক্ষম হয়েছে। দেশে দেশে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলন ও সংগ্রাম নিশ্চিতভাবে তখন চূড়ান্ত বিজয়ের সম্মুখীন। ভারতবর্ষের সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনেও পরিলক্ষিত হচ্ছিল এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব। এই পরিস্থিতিতে বাঙলার 'ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'কে উঠিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব আসে সংঘের দ্বিতীয় সম্মেলনে (১৯৪৪)। কিন্তু ঐ সময় সংঘের অস্তিত্ব অটুট রাখার প্রয়োজন বহু সদস্যের কাছে অপরিহার্য মনে হয়েছিল। তাই সংঘ টিকে থাকল আরো একবছর, অর্থাৎ তৃতীয় সম্মেলন পর্যন্ত (১৯৪৫)।

১. ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের বিলুপ্তি :

সংঘের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৪ সালের ১৫ই থেকে ১৭ই জানুয়ারি, কলকাতার 'ভারত সভা' হলে। এই সম্মেলনেই লেখক ও শিল্পী সংঘের নাম আর 'ফ্যাসিস্ত-বিরোধী' রাখা উচিত কিনা তা নিয়ে তীব্র বিতর্ক চলে। 'ফ্যাসিস্ত বিরোধী' কথাটি 'নেতি বাচক' (Negative)—এই সমালোচনার প্রত্যুৎত্তর দেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সভার সভাপতি প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং আবুল মনসুর আহম্মদ। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বক্তব্যে বলেন :

> "ঐ কথাটিতে আমাদের দেশের স্বাধীনতার জন্য বিশেষভাবে সংগ্রাম চালানোর কথাও বোঝায়। কারণ স্বাধীনতা ব্যতিরেকে শিল্পকলা নিশ্চিতভাবে ম্রিয়মান হবে। ফ্যাসিজম্ ও তার সর্ববিধ শয়তানী রূপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং আমাদের দেশের উদারহৃদয় অথচ দীর্ঘকাল ধরে অত্যাচারিত জনগণের সঙ্গে শিল্পী ও সাহিত্যিকদের যোগাযোগ স্থাপনের জন্য বিশেষভাবে সংগ্রাম—'ফ্যাসিস্ত বিরোধিতা' কথাটির মধ্যে প্রকাশ পায়।"[১]

খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবী এবং সাংবাদিক আবুল মনসুর আহম্মদ বলেন :

> "ভারতের হিন্দু ও মুসলমানের জীবনাদর্শের এবং ঐতিহাসিক শিক্ষা ফ্যাসিবাদের বিরোধী। কাজেই ভারতের লেখক ও শিল্পীদের ফ্যাসিস্ত-বিরোধিতা একটা নেতিবাচক ভাববিলাসিতা নহে। ইহার মধ্যে আমাদের জীবনের যোগ আছে।"[২]

সুতরাং বিতর্ক উঠলেও 'ফ্যাসিস্ত-বিরোধী' নাম পরিবর্তনের বিষয়টি সাময়িক-ভাবে স্থগিত থাকে। এই নামের বিলুপ্তি ঘটে সংঘের তৃতীয় সম্মেলনে। ১৯৪৫-এর ৩রা মার্চ থেকে ৮ই মার্চ যখন এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তখন যুদ্ধের গতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গেছে। ফ্যাসিস্ত-শক্তির পরাজয় তখন সুনিশ্চিত। পূর্বদিক থেকে সোভিয়েত লালফৌজ ও পশ্চিম দিক থেকে ব্রিটিশ ও মার্কিন বাহিনী ছুটে চলেছে বার্লিন দখলের জন্য। স্তালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন তখন নতুন শক্তি নিয়ে যেন জেগে উঠেছে। আর, এশিয়ার বুকে জাপ-আগ্রাসনবাদীরা দ্রুত গতিতে পিছু হটছে। একের পর এক যুদ্ধে ঘটছে তাদের পরাজয়।

এই পরিস্থিতিতেই কলকাতার মহম্মদ আলি পার্কে অনুষ্ঠিত হয়েছিল 'ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে'-র তৃতীয় সম্মেলন। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। সভাপতিমণ্ডলীর অন্যান্য সদস্যেরা ছিলেন—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাবতী দেবীসরস্বতী, ধীরেন সেন (সম্পাদক, অমৃতবাজার পত্রিকা), শেখ গোমানী (কবিয়াল) ও পশুপতি ভট্টাচার্য (মৃৎশিল্পী)।

সভাপতিমণ্ডলীর নির্বাচিত সদস্যদের দেখেই বোঝা যায় যে, গ্রামীণ লোক-সংস্কৃতির সঙ্গে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী সাংস্কৃতিক আন্দোলন ইতিমধ্যে আরো অধিক মাত্রায় ঘনিষ্ঠতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। সম্মেলন উপলক্ষে যে-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় তাতেও প্রতিফলিত হয়েছিল লোকসংস্কৃতির জীবন্ত ঐতিহ্য।

যাহোক, এই সম্মেলন থেকেই 'ফ্যাসিস্ত-বিরোধী' নামের বিলোপ ঘটিয়ে 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ'কে পুনর্জীবিত করা হয়। সম্ভবত বিগত সম্মেলনে নাম নিয়ে যে-বিতর্ক দানা বেঁধেছিল তারই পরিপ্রেক্ষিতে অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল এই নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত।[৩] তাছাড়া ফ্যাসিস্ত-শক্তির পরাজয় সুনিশ্চিত হওয়ায় এই 'অভিধা'টি টিকিয়ে রাখার সত্যিই আর কোনো প্রয়োজন অনুভূত হয়নি।

২. বার্লিনের পতন ও ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনের শেষ অধ্যায়ঃ

আন্তর্জাতিক মে-দিবস উদযাপনের দিনটিতেই লালফৌজ বার্লিনের রাইখস্ট্যাগের মাথার উপর উড়িয়ে দিল লাল পতাকা। এইভাবেই ঘটল ফ্যাসিস্ত-শক্তির চূড়ান্ত পতন। এই উন্মাদনাময় পরিস্থিতিতে বাঙলার রাজধানী কলকাতা শহরের (যা ছিল ভারতের ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনের পীঠস্থান) তৎকালীন মানসিকতার একটি অনবদ্য চিত্র ফুটে উঠেছে প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা রণেন সেন-এর লেখায়:

"সেই সময় লালফৌজের অগ্রগতিকে সংবর্ধনা জানিয়ে আমাদের শ্রমিক কমরেডরা গান লেখেন 'জয় জয় লালফৌজ, তেরা হ্যায় তুফানী মৌজ, তুনে পায়া হ্যায় এওজ—এ দুনিয়াকে সামনে…'এবং ইরশাদের নেতৃত্বে প্রধানত

বিড়ি শ্রমিকরা বস্তিতে বস্তিতে ও জনসভায় এই গান করতেন। গানটা সত্যিই অপূর্ব হয়েছিল।

"১৯৪৫-এর মার্চ নাগাদ আমরা দিন গুনতে লাগলাম কবে লালফৌজ বার্লিন দখল করবে, লালঝাণ্ডা রাইখস্টাগের উপর উড়াবে। সে আর এক উৎকণ্ঠা। অসংখ্য শ্রমিকসভা করে আমরা যুদ্ধজয়ের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করি ও বলি যে সকালের কাগজে বা রেডিওতে যখনই শুনবেন যে বার্লিনে লালঝাণ্ডা উড়েছে, তখনই কাজ বন্ধ করে মিছিল নিয়ে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে জমায়েত হবেন ও সেখান থেকে ব্যাণ্ড সহযোগে কলকাতা পরিক্রমণ করা হবে।"[৪]

অবশেষে সেই দিনটি এলো। ২রা মে তারিখে বার্লিনে নাৎসী বাহিনী আত্মসমর্পণ করল। হিটলার সস্ত্রীক আত্মঘাতী হওয়ায় নাৎসী পরাজয় সম্পূর্ণ হলো। ৩রা মে এই সংবাদ পৌঁছে গেল ভারতে। ৪ঠা মে কলকাতার রাজপথে বেরুলো বিজয়-মিছিল। এই অবিস্মরণীয় ঘটনার যে সংবাদভাষ্য প্রকাশিত হয় আমি তা উদ্ধৃত করছি :

"৪ঠা মে শুক্রবার বার্লিনের পতন উপলক্ষে উৎসব করার জন্য কলকাতার রাস্তায় পঁচিশ হাজার মানুষের মিছিল বেরিয়েছিল। মিছিলের ডাক দিয়েছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির বাঙলা কমিটি। বস্তুত প্রায় প্রত্যেকটি শিল্পের শ্রমিকরা এই বিরাট মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন, সঙ্গে এনেছিলেন বিরাট বিরাট পোস্টার যাতে দেখানো হয়েছিল লালফৌজের গৌরবমণ্ডিত অগ্রগতি এবং দাবি জানানো হয়েছিল কংগ্রেস নেতাদের মুক্তির ও কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের।

"সারা ভারত কিষাণ সভার সাধারণ সম্পাদক বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় এম. এল. এ. ওয়েলিংটন স্কোয়ারে পতাকা উত্তোলন করেন, তারপর সেখান থেকে মিছিল শুরু হয়। পতাকা উত্তোলনের সময়ে সেই বিরাট সমাবেশ থেকে মুষ্টিবদ্ধ হাত উত্তোলিত করা হয়। মিছিলের সামনে লালপতাকা হাতে ছিলেন বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়, ভবানী সেন, মুজফফর আহ্মদ, রেজ্জাক খান, নীরেন রায় ও অন্য নেতারা। তাঁদের সামনে একদল সাইকেলারোহী, পিছনে প্রায় ৫০০ জন মহিলা। তারপর ইউনিয়নের পর ইউনিয়ন ও দলে দলে ছাত্র। মিছিলের সামনে আরও ছিলেন লীগ নেতা লাল মিঞা ও কংগ্রেস-নেতা ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। এই দুজনের মধ্যে কংগ্রেস ও লীগের সেরা ঐতিহ্য মূর্ত হয়ে উঠেছিল।

"দু'মাইল লম্বা মিছিলটি রাস্তা দিয়ে যাবার সময়ে প্রচুর ভিড় হয়েছিল এবং বারান্দায় ও ছাদে দাঁড়িয়ে প্রচুর মানুষ মিছিল দেখেছিলেন।...

"সারাদিন ধরে ট্রাম ও বাস লালঝাণ্ডা নিয়ে শহরে চলাচল করছিল।... চিত্তরঞ্জন এভেন্যু দিয়ে যখন মিছিল যাচ্ছিল তখন বহু ব্রিটিশ ও মার্কিন সৈনিক মিছিলকে স্বতঃস্ফূর্ত অভিবাদন জানায়। সন্ধ্যেতে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে

ভবানী সেনের সভাপতিত্বে এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়, যাতে লাল-ফৌজের ভূমিকা নিয়ে বক্তব্য রাখেন সোমনাথ লাহিড়ী।

"মিছিলে সর্বত্র সমান উদ্দীপনা ও উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়, যার দ্বারা সহজেই বোঝা যায় যে বার্লিনের পতন শুধুমাত্র একটি সামরিক বিজয় নয়, মানব-সমাজের স্বাধীনতা লাভের ইতিহাসে একটি মাইলস্টোন।"[৫]

[ইংরাজী থেকে অনূদিত]

৩. বাঙলার ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলন : একটি বিশ্লেষণ

১৯৩৫ থেকে ১৯৪৫, এই একদশক কালব্যাপী বাঙলা দেশ অনেক রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটপরিবর্তনেরই সাক্ষী। কিন্তু একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, ঐ দশকে বাঙলার সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে 'ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলন' সত্যিই এক নতুন চেতনা সঞ্চার করেছিল। কমিউনিস্ট পার্টির 'জনযুদ্ধের নীতি' প্রযুক্ত হয়েছিল সারা ভারতবর্ষেই। ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও তাই কমবেশি ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলন সংগঠিত হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে বাঙলার অবদান ও ভূমিকা ছিল অনন্য ও অতুলনীয়। অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বাঙলাদেশেই কেন এই আন্দোলন এমন ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করল সেই প্রশ্ন সঙ্গতভাবে উঠতেই পারে। প্রধানত ৩টি কারণকে এক্ষেত্রে চিহ্নিত করা যায় :

১. আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাঙালী মনীষার অবাধ বিচরণ ও রবীন্দ্র-যুগের প্রভাবে বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে আন্তর্জাতিক বিশ্ব-মানবতাবোধের প্রসার।
২. জাতীয় কংগ্রেস-বিরোধী বামপন্থী রাজনৈতিক চিন্তাধারার অবাধ ক্ষেত্র ছিল অবিভক্ত বাঙলা।
৩. তিরিশের দশক থেকে বাঙলায় মার্কসবাদী-লেনিনবাদী কমিউনিস্ট মতবাদের প্রসার-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি।

১৯৪১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টির অনুসৃত ফ্যাসিস্ত-বিরোধী নীতি এবং জাতীয় কংগ্রেসের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী নীতির মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্যই ছিল না। বরঞ্চ, কমিউনিস্ট পার্টিই জাতীয় কংগ্রেস অপেক্ষা অধিকতর আপসহীনভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জঙ্গী আন্দোলন পরিচালনা করেছে, যদিও কমিউনিস্টদের প্রভাব ও সাংগঠনিক শক্তি কোনোভাবেই জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে তুলনীয় ছিল না। এই কারণেই তারা জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরে থেকে নিজস্ব রণনীতি পরিচালনায় তৎপর ছিল।

জনযুদ্ধের যুগেই কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে জাতীয় আন্দোলনের বিচ্ছেদ ঘটে। যেখানে কমিউনিস্টদের শক্তি বেশি ছিল না সেখানে উত্তাল জাতীয় আন্দোলনের স্রোতে (৪২-এর আগস্ট-আন্দোলন) তারা ভেসে যায়, কিন্তু যেখানে তারা অপেক্ষাকৃত অধিক শক্তিশালী ও সংগঠিত ছিল সেখানেই তারা নিজেদের রাজনৈতিক লাইন জনসাধারণকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছে এবং সাফল্যও লাভ

করেছে। এই রকম একটি ক্ষেত্রই ছিল তৎকালীন বাঙলাদেশ।

বাঙলায় ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলন নিঃসন্দেহে পরিচালিত হয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টির প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে। কিন্তু কোনোরূপ সঙ্কীর্ণতার ছাপ তাতে ছিল না। ফ্যাসিস্ত-বিরোধী ব্যাপক যুক্তফ্রন্ট গঠনের 'ডিমিট্রভ-থিসিস' বাঙলায় প্রায় আক্ষরিকভাবে অনুসৃত হয়। সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ফ্রন্টসহ ছাত্র, মহিলা, শ্রমিক ও কৃষক—সমস্ত ফ্রণ্টেই কমিউনিস্ট পার্টি অকমিউনিস্ট এমনকি কমিউনিস্ট-বিরোধী ব্যক্তিদেরও ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনে সামিল করার জন্য সর্বদা চেষ্টা চালিয়ে গেছে এবং সফলও হয়েছে। 'ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে' এরকম অনেক প্রতিষ্ঠিত ও উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বই যোগদান করেন। এঁরা কমিউনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন না, কিন্তু আন্তর্জাতিক মানবতাবাদ ও কমিউনিস্টদের উদার আমন্ত্রণকে উপেক্ষাও করতে পারেননি। তাই জাতীয় আন্দোলনের প্রবল স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েও অতুলচন্দ্র গুপ্ত, তারাশঙ্কর, বুদ্ধদেব বসু, সজনীকান্ত দাস, যামিনী রায়, সত্যেন্দ্রনাথ বসু কিংবা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় থেকে শুরু করে উদয়শঙ্করকে পর্যন্ত ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনে সামিল করা সম্ভব হয়েছিল; অন্তত কিছুদিনের জন্য হলেও এঁরা সবাই সাড়া দিয়েছিলেন কমিউনিস্টদের আন্তরিক আহ্বানে। ফ্যাসিস্ত-বিরোধী গণসংগঠনগুলি অবশ্যই পরিচালিত হয়েছিল কমিউনিস্টদের নেতৃত্বেই, কিন্তু তারা সেগুলিকে কোনোদিন ছলেবলে অথবা কৌশলে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করতে চায়নি। সেইজন্য দেখা গেছে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি কিংবা বিধানচন্দ্র রায়ের সহযোগিতা এবং সাহায্যও এই সংগঠনগুলি লাভ করেছিল। 'মহিলা-আত্মরক্ষা সমিতি' ও 'জনরক্ষা সমিতি'-র মতো গণসংগঠনগুলির কার্যসূচীতেও এই কারণে বহু কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগপন্থী নেতা আর কর্মী সানন্দে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বলাবাহুল্য, কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক পি. সি. যোশী-র উদার মানসিকতা এক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। এমনকি কমিউনিস্ট-বিরোধী প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠী পর্যন্ত এই সত্য স্বীকার করেই লিখেছেন :

"পিপলস রিলিফ কমিটির মাধ্যমে দুর্ভিক্ষত্রাণে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে, চোরাবাজারী, মজুতদারীর বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়ে, কংগ্রেস নেতাদের নিঃশর্ত মুক্তি চেয়ে, জাতীয় প্রতিরক্ষার জন্য জাতীয় সরকার দাবি করে, সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি, ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ গঠন করে পি. সি. যোশী সমালোচনার মোড় বেশ কিছুটা ঘুরিয়ে দিতে পেরেছিলেন। তাঁদের দাবি ছিল পার্টিই দেশকে বাঁচাবে, এমনকি ধ্বংসমূলক কাজ থেকে কংগ্রেস 'দেশভক্ত'দের সরিয়ে নেবে। অবশ্যই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু এর মানবিক দিকটাও প্রশংসার্হ'।"৬

কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন সম্পাদক পি. সি. যোশীর অবদান সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও ছিল অনস্বীকার্য। বাঙলায় 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' ও

তার শাখা সংগঠনরূপে গণনাট্য সংঘে-র প্রতিষ্ঠার পশ্চাতেও ছিল পি. সি. যোশীর দূরদৃষ্টি। প্রধানত তাঁরই আগ্রহ ও উৎসাহে বাঙলার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রটি ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলনের যুগে উর্বরতর হয়ে ওঠে এবং সেই কর্ষিত মাটিতে ফলতে শুরু করে বহুমূল্য সোনালী ফসল।

ফ্যাসিস্ত-বিরোধী সাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল গণনাট্য সংঘের বহুমুখী সাংস্কৃতিক আন্দোলন। সঙ্গীত-নাটক-নৃত্য-চিত্রকলা ও সাহিত্যের অন্যান্য শাখাসহ মননশীল সৃষ্টিচেতনার সর্বক্ষেত্রেই এই সময় বাঙলায় এক নবযুগের সূচনা হয়েছিল, যাকে বোধহয় বাঙলার দ্বিতীয় রেনেসাঁ বললে অত্যুক্তি হবে না। তথাপি অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠী তাঁর সাম্প্রতিক রচনায় শ্লেষসহকারে মন্তব্য করেছেন—জনযুদ্ধের জিগির তুলে 'ভারত ছাড়ো' সমর্থকদের পঞ্চমবাহিনী ঘোষণা করে, শ্রমিকদের ধর্মঘট থেকে দূরে রেখে, দেশভাগের প্রস্তাব এনে—তাঁরা (অর্থাৎ কমিউনিস্টরা) যে ভূমিকা পালন করেছিল, তাতে ম্যাক্সওয়েল টটেনহ্যামরা মজা পেলেও বুদ্ধিজীবীরা বিভ্রান্ত হয়েছিলেন।[৭] সন্দেহ নেই, অধ্যাপক ত্রিপাঠীর এ-ধরনের মন্তব্য অত্যন্ত অগভীর ও বিদ্বেষ-প্রসূত চেতনার অভিব্যক্তি মাত্র। বাঙলাদেশের যেসব বুদ্ধিজীবী ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন (রবীন্দ্রনাথ সহ) তাঁরা অতি সচেতনভাবেই তা করেছিলেন। বরঞ্চ উগ্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ধাক্কায় বিভ্রান্ত হয়েছিলেন সজনীকান্ত দাস, সুবোধ ঘোষ, বুদ্ধদেব বসুর মতো বুদ্ধিজীবীগণই, যাঁরা শেষপর্যন্ত এই আন্দোলন ও সংঘ পরিত্যাগ করে পরবর্তীকালে বিপরীতমুখী অবস্থান গ্রহণ করেন।

প্রকৃতপক্ষে, ফ্যাসিস্ত-বিরোধী সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাধ্যমেই বাঙলার শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতির যে-ধারাটি ছিল প্রায় সম্পূর্ণরূপে জনগণ-বিচ্ছিন্ন তা ক্রমশই হয়ে উঠতে থাকে গণমুখী। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার প্রয়োগ ঘটতে থাকে বাঙলার সাংস্কৃতিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে। এ-প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো—বাঙলার লুপ্তপ্রায় লোকসংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন। যাত্রা, কবিগান, জারিগান, তরজা, পাঁচালী ও লোকনৃত্যের আঙ্গিককে আত্মীকরণ করেই বাঙলায় আত্মপ্রকাশ করে এক নতুন গণসংস্কৃতি। এমনকি সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও 'জনযুদ্ধ' ও কিছু পরে 'স্বাধীনতা' পত্রিকা সর্বস্তরের মেহনতী মানুষের আন্দোলন-সংক্রান্ত সংবাদ পরিবেশন ও রিপোর্টাজধর্মী রচনাদি প্রকাশের মাধ্যমে এবং তীক্ষ্ণধার সম্পাদকীয় বক্তব্য পাঠকদের কাছে পৌঁছে দিয়ে এক নতুন ধরনের মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করে গণচেতনার পথ উন্মুক্ত করে দেয়।

ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী কর্মী ও নেতৃত্বের কাছে এই পথ মোটেই কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। তাঁদের একদিকে সম্মুখীন হতে হয়েছিল উগ্র জাতীয়তাবাদী ফ্যাসিস্ত-সমর্থক দল ও গোষ্ঠীগুলির সশস্ত্র আক্রমণের এবং অপরদিকে তাঁরা শিকার হয়েছিলেন ব্রিটিশ সরকারের সন্দেহ এবং পুলিশী

উৎপীড়নের। মহাফেজখানায় সংরক্ষিত গোপন দলিলপত্র প্রমাণ করেছে যে, কমিউনিস্টদের ব্রিটিশ সরকার কখনোই সন্দেহের ঊর্ধ্বে রাখেনি, বরঞ্চ এঁদের সম্পর্কে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী সরকার অধিক মাত্রায় সচেতন ও ভীত ছিল।

এছাড়া কমিউনিস্টদের জাতীয়তাবাদী মহল থেকে দেশদ্রোহী ও বিশ্বাস-ঘাতক আখ্যায় ভূষিত করা হয়েছিল। অন্তত পক্ষে দশজন কমিউনিস্ট কর্মীকে এই সময়কালে উগ্র জাতীয়তাবাদীরা হত্যা করে। এঁদের মধ্যে ৮ জনের নাম সংগ্রহ করা গেছে। এঁরা হলেন: (১) প্রদ্যোৎ সরকার (ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৪২); (২) সোমেন চন্দ (ঢাকা, ৮ মার্চ, ১৯৪২); (৩) সুভাষ নাগ (১৯৪২); (৪) ফণী চক্রবর্তী (ময়মনসিংহ, জুলাই, ১৯৪৩); (৫) সুনীল নাগ (ঢাকা, মে, ১৯৪৪); (৬) ভানু মজুমদার (ময়মনসিংহ, জুলাই, ১৯৪৪); (৭) যতীশ চক্রবর্তী (বেলঘরিয়া, ডিসেম্বর, ১৯৪৪) এবং (৮) গোলাম শরীফ (ইনি অবশ্য মে, ১৯৪২-এ চট্টগ্রামে জাপবোমা বর্ষণে নিহত হন)। একমাত্র গোলাম শরীফকে বাদ দিলে বাকী সাতজনকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয় তাঁদের বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শের জন্য। ফ্যাসিস্ত-বিরোধী ছাত্রকর্মী, এমনকি মহিলাদের উপরেও এই সময় বর্ষিত হয় তীব্র কুৎসা এবং পরিচালিত হয় শারীরিক আক্রমণ। অসংখ্য ফ্যাসিস্ত-বিরোধী কর্মী এইসব আক্রমণে আহত হন। আক্রমণকারীদের অধিকাংশই ছিলেন ফরওয়ার্ড ব্লক কিংবা আর. এস. পি দলভুক্ত কর্মী। জাতীয় কংগ্রেস থেকে আক্রমণের প্রচেষ্টা ছিল অনেক কম।

যাইহোক, যত কমিউনিস্ট কর্মী ফ্যাসিস্ত-সমর্থকদের হাতে খুন হয়েছেন, তার থেকে অনেক গুণ বেশি কর্মী প্রাণ হারিয়েছেন দুরারোগ্য ব্যাধি, অনাহার ও দুর্ঘটনায়। সুতরাং পিঠ বাঁচানোর রাজনীতি সেসময় কমিউনিস্ট পার্টি করেনি, এই সত্য দৃঢ়ভাবেই উচ্চারণ করা যেতে পারে। আর, এই ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়েই প্রসারিত হয়েছে কমিউনিস্ট পার্টির গণভিত্তি, এটাও ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত ঘটনা।

বাঙলার ফ্যাসিবাদ-বিরোধী এই আন্দোলনকে অনেকেই অবশ্য প্রধানত একটি বুদ্ধিজীবী-আন্দোলন রূপেই দেখাতে চান। তাঁদের মতে, শহরাঞ্চলের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ই ছিল এই আন্দোলনের মূল শক্তি। সমাজের উচ্চশিক্ষিত, রাজনীতি-সচেতন ও আন্তর্জাতিকতার ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ নর-নারীদের একটা অংশই এই আন্দোলনে সবথেকে বেশি জড়িয়ে পড়েছিলেন। সমাজের শ্রমজীবী জনগণ এবং নিম্নবর্গের মানুষ এই আন্দোলনে তেমন উল্লেখযোগ্যভাবে যুক্ত ছিলেন না।

কিন্তু এই অভিমত বা ব্যাখ্যা বোধহয় সবটা গ্রহণযোগ্য নয়। একথা সত্য যে, ফ্যাসিবাদের ঘনায়মান বিপদ সম্পর্কে সাধারণ-স্বল্পশিক্ষিত মানুষ কিংবা সমাজের শ্রমজীবী অংশ প্রথমদিকে একেবারেই সচেতন ছিলেন না। সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হওয়ার পূর্বে অথবা বাঙলার মাটিতে জাপানী বোমাবর্ষণের আগে পর্যন্ত এই আন্দোলন তাই ব্যাপক গণভিত্তি লাভ করতে পারেনি; কিন্তু

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ফ্যাসিস্ত-শক্তির হিংস্র থাবা যখন মানবসভ্যতা বিনাশে উদ্যত তখন সেই চরম বিপদের কিনারায় দাঁড়িয়ে বাঙলার শ্রমিক-কৃষক ও সাধারণ নিম্নবর্গের মানুষ কিন্তু ব্যাপকভাবে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এমনকি যারা ব্রিটিশের শত্রু জাপানকে স্বদেশের মিত্র মনে করে ফ্যাসিস্ত-সমর্থক হয়েছিল, তারাও যখন দেখল যে জাপানী বোমা ভারতবর্ষের মাটিতে গরীব ভারতবাসীকেই রক্তাক্ত করছে তখন তাদের অনেকেরই শুভবুদ্ধি জাগ্রত হয়েছিল। 'দেবে না জাপানী উড়োজাহাজ / ভারতে ছুঁড়ে স্বরাজ'—এই চেতনা যতই জাগ্রত হতে শুরু করল ততই সাধারণ মানুষের মধ্যে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী ঘৃণা তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকল। ১৯৪৩ সালে থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে 'কৃষকসভা', 'এ. আই. টি. ইউ. সি' এবং 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'র নেতৃত্বে যেসব বিরাট সভাসমিতি-সম্মেলন ও প্রচার-আন্দোলন সংগঠিত হয় তাতে অংশগ্রহণকারী শ্রেণী-মানুষদের দিকে তাকালেই বোঝা যায় যে, 'জনযুদ্ধে'-র পর্যায়ে বাঙলার ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলন নিছকই মধ্যবিত্ত বা বুদ্ধিজীবী-পরিচালিত আন্দোলন ছিল না, এ আন্দোলনে সত্যিই সামিল হয়েছিলেন সর্বস্তরের অসংখ্য সাধারণ মানুষ। 'জনযুদ্ধ' ও 'অরণি' পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টগুলি থেকেই জানা যায়, 'সোভিয়েত সুহৃদ্ সমিতি' বা ফ্যাসিস্ত-বিরোধী অন্যান্য গণসংগঠনগুলি কীভাবে গ্রামে-গঞ্জে ও শিল্পাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং ফ্যাসিস্ত-বিরোধী প্রচার-আন্দোলন সংগঠিত করতে সক্ষম হয়েছিল। ১৯৪৩ সালে পঞ্চাশের মন্বন্তরের সেই প্রচণ্ড ভয়াবহতার মধ্যে দাঁড়িয়েও কৃষকসভা ও বাঙলার কৃষকশ্রেণী কীভাবে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী প্রচার সংগঠিত করেছেন, কৃষকবাহিনী গঠন করেছেন, জাপ-আক্রমণ প্রতিরোধে গেরিলা ট্রেনিং নিয়েছেন এবং একই সঙ্গে নিজেদের দাবি-দাওয়ার আন্দোলনকেও সংগঠিত করেছেন, সেকথা ভাবলে আজ বিস্মিত হতে হয়। বাঙলার শ্রমিকশ্রেণীও শুধুমাত্র অর্থনৈতিক দাবিদাওয়ার মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ না রেখে এই আন্দোলনে তাদের যথাযোগ্য ভূমিকাই সেদিন পালন করেছিলেন।

৪. ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলন ও কমিউনিস্ট পার্টি : একটি বিতর্ক

ভারতবর্ষের ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলন নিঃসন্দেহে পরিচালিত হয়েছিল প্রধানত কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে। বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হওয়ার পরে জনযুদ্ধের যুগে কমিউনিস্ট পার্টিই ছিল এর প্রধান চালিকাশক্তি। এখন এই প্রশ্ন প্রায়শই ওঠে যে, সেই সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় আন্দোলনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে জনযুদ্ধের তত্ত্ব গ্রহণ করে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলন শুরু করা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে উচিত কাজ হয়েছিল কি-না! এ-প্রসঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে ও বাইরে উভয় ক্ষেত্রেই তীব্র মতবিরোধ এবং বিতর্ক রয়েছে। অবশ্য বর্তমান কমিউনিস্ট নেতৃত্বের একটা বড় অংশের অভিমত হলো :

ঐ সময় পার্টি যে-পথ গ্রহণ করেছিল তা সম্পূর্ণ সঠিক ছিল না। এই ভুলের কথা উল্লেখ করে তাঁরা বলতে চেয়েছেন—তৎকালে আন্তর্জাতিক বিরোধটিকে, অর্থাৎ ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সংগ্রামকে, অগ্রাধিকার দেওয়ার ফলে কমিউনিস্টরা ভারতের জাতীয় আন্দোলন থেকে কার্যত সরে দাঁড়ায় এবং এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই তাঁরা 'ভারত-ছাড়ো' প্রস্তাবেরও বিরোধিতা করে। জাতীয় নেতাদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে গণআন্দোলন শুরু হলে সেই আন্দোলনেও তাঁরা অংশগ্রহণ করে না। এছাড়া, যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় বাধা দেওয়া উচিত হবে না, এই ধারণায় বশবর্তী হয়ে কমিউনিস্টরা ধর্মঘট ও সংগ্রাম-বিরোধী মনোভাবও গ্রহণ করেছিল।[৯]

ঐ সময়পর্বে কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রধান তাত্ত্বিক নেতা ছিলেন ডঃ গঙ্গাধর অধিকারী। পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট পার্টির ঐ সময়কার কর্মনীতিকে 'মারাত্মক ভুল' বলে চিহ্নিত করে তিনি লিখেছেন :

"ফ্যাসিবাদ-বিরোধী যুদ্ধে আমাদের সাধারণ সমর্থন ঘোষণা সঠিক ছিল। তাছাড়া, জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশকে রক্ষা করতে হবে, এই কথা বলাও আমাদের পক্ষে সঠিক হয়েছিল। কিন্তু জাতীয় আন্দোলন ছাড়া কি কমিউনিস্ট পার্টি দেশকে রক্ষা করতে পারত? একথা কল্পনা করা কি বাস্তবানুগ ছিল যে, আক্রমণের মুখোমুখি হয়ে দেশের জনসাধারণ জাতীয় নেতৃত্ব ফ্যাসিবাদের পক্ষে চলে গেছে বলে তাঁদের ত্যাগ করবে এবং ফ্যাসিবাদ-বিরোধী দেশপ্রেমিক কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে মিলিত হবে? এই দুটি বক্তব্যই ছিল একেবারে অবাস্তব। জঘন্যতম অন্তর্ঘাতকে প্রতিহত করার এবং কৃষক অঞ্চলগুলিতে প্রকৃত জঙ্গী ফ্যাসিবাদ-বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার, যা প্রকৃতপক্ষে আক্রমণকারীকে রুখতে পারত, একমাত্র পথ ছিল জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়া, তার বিরোধিতা করা নয়। জাতীয় আন্দোলনের এই আবর্তনের মুখে, সেই সম্পর্কে আমাদের ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি, প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদ সম্পর্কে আমাদের মতান্ধ উপলব্ধি ও জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল।[১০]

[ইংরাজী থেকে অনূদিত]

ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলন ও জনযুদ্ধের লাইন-সংক্রান্ত প্রশ্নে কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের বক্তব্য, বিবৃতি ও কোনো কোনো পার্টি-দলিল পর্যালোচনা করে মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক নরহরি কবিরাজ তৎকালীন সময়ে নীতিগত প্রশ্নে কমিউনিস্ট পার্টির ভুলভ্রান্তিগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে নির্দেশ করেছেন :

"১) কংগ্রেস-নেতৃত্ব প্রস্তাবিত 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলনের বিরোধিতা করার ফলে কমিউনিস্ট পার্টি জাতীয় আন্দোলনের মূল স্রোতধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। এই ভুলের জন্য কমিউনিস্ট পার্টিকে পরবর্তীকালে বহু খেসারত দিতে হয়েছে।

"২) আগস্ট আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের কা'রও কা'রও মধ্যে এমন চিন্তা

অবশ্যই ছিল যে জার্মানী ও জাপান—যেহেতু ব্রিটেনের শত্রু, সেই হিসেবে আমাদের মিত্র। কিন্তু ১৯৪২ সালের বিরাট বিশাল স্বতঃস্ফূর্ত গণঅভ্যুত্থানকে জাপানী চর বা পঞ্চম বাহিনীর কার্যকলাপ বলা মোটেই ঠিক নয়।

"৩) সুভাষচন্দ্র ছিলেন একজন দেশপ্রেমিক, যদিও ফ্যাসিবাদের চরিত্র সম্পর্কে তাঁর ধারণা সঠিক ছিল না। তাই তিনি ফ্যাসিবাদের সাহায্য নিয়ে দেশের স্বাধীনতা আনার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। এই সময়ে গান্ধীজী সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে যে মূল্যায়ন করেন সেটিই ছিল সঠিক। তিনি বলেন, 'সুভাষচন্দ্র একজন ভ্রান্ত পথে পরিচালিত দেশপ্রেমিক' (**A misguided patriot**)।"[১১]

ডঃ গঙ্গাধর অধিকারী এবং অধ্যাপক নরহরি কবিরাজ অপেক্ষা অধিকতর উচ্চগ্রামের বিরূপ প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা রণেন সেন-এর বক্তব্যে। তিনি পি. সি. যোশী লাইনের (যা যোশীর **Forward to Freedom** গ্রন্থে বিবৃত) তীব্র সমালোচনা করে লিখেছেন :

"ভারত ছাড়ো আন্দোলনের উপর সাম্রাজ্যবাদের নিপীড়ন ও বুর্জোয়াশ্রেণী আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা কুৎসা প্রচার করা সত্ত্বেও আমরা অটল থাকলাম। আমরা ক্রমেই শ্রেণীবহির্ভূত (নন-ক্লাস) পথে চলতে শুরু করি, সংগ্রাম সংগঠিত ও পরিচালিত করার রাস্তা পরিত্যাগ করে, প্রত্যেক জরুরী ও অত্যাবশ্যকীয় প্রশ্নে নিশ্চুপ থাকলাম। 'ফরোয়ার্ড টু ফ্রীডম' পুস্তকে ধর্মঘট করার কথা ছিল না, প্রতি ছত্রে সংগ্রাম বিমুখতা বিদ্যমান ছিল। কৃষি ও ভূমি-সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় সংগ্রাম পুস্তকে অনুপস্থিত, খাদ্য সংকটের কারণ বিবৃত হল না। উপনিবেশবাদ ও জমিদারতন্ত্র কৃষি ও খাদ্যসংকটের যে মূল কারণ তা অনুচ্চারিত রয়ে গেল।

"পঞ্চমবাহিনীর কল্পিত ক্রিয়াকলাপ অতিরঞ্জিত করা হয়। সাম্রাজ্যবাদ ও আমলাতন্ত্র ছাড় (এ্যালিবাই) পেয়ে গেল। যে কোন মৌলিক পরিবর্তনের কথা উল্লেখের বিরোধিতা শুরু হল। 'সাম্রাজ্যবাদের নিকট ইতিবাচক গঠনমূলক প্রস্তাব উত্থাপন কর, কোনও নেতিবাচক ধ্বংসাত্মক বাক্য উচ্চারণ করবে না।'

"১৯৪৩-এর প্রথম পার্টি কংগ্রেসের প্রস্তাবে—খাদ্য সংকটের জন্য 'পঞ্চম বাহিনী'কে দায়ী করা হল, সাম্রাজ্যবাদকে নয়। কোন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ধ্বনি প্রস্তাবে ছিল না। উদারনৈতিক দৃষ্টিতে জাতীয় নেতাদের মুক্তি চাওয়া হয়। রণদীভের মতে শ্রমিক স্ট্রাইককে শ্রেণীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা ও শ্রেণীর পরাজয় আখ্যা দেওয়া, উৎপাদন বৃদ্ধির উপর সমস্ত জোর দেওয়া, বর্তমান উৎপাদন ব্যবস্থার সমালোচনা এড়ান প্রভৃতি চরম সংস্কারবাদী ধ্যান-ধারণা মার্কসবাদের নামে চালান হয়। কৃষি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে বলা হয় (দলিলে উপস্থিত করা হয়) যদি আমরা ভূস্বামীদের কাছে ঠিক মত প্রস্তাব উপস্থিত করতে পারি তাহলে 'অধিক ফসল ফলাও' আন্দোলনে তারাও যোগ দেবে—

ভূস্বামীদের মধ্যে এক নবচিন্তার উন্মেষ হচ্ছে, ভূস্বামীরা স্বেচ্ছায় কৃষকদের জমি দান করছে, কিষাণ-সভার সঙ্গে সহযোগিতা করছে ইত্যাদি গালভরা, অবাস্তব, শ্রেণীবিরোধী আওয়াজ কংগ্রেসে তোলা হয় ও প্রস্তাব পাস হয়।"[১২]

ডাঃ রণেন সেন-এর এই অভিযোগগুলিকে কোনোমতেই অস্বীকার করা যায় না। কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক পি. সি. যোশী ১৫ই মার্চ, ১৯৪৩ সালে ম্যাক্সওয়েলকে যে ব্যক্তিগত পত্র ও স্বরাষ্ট্রদপ্তরে ১২০ পৃষ্ঠার যে রিপোর্ট পাঠান, তাতেই রণেন সেন-এর অভিযোগের সুস্পষ্ট সমর্থন রয়েছে। অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠীও তাঁর সাম্প্রতিক রচনায় যোশীর ওই পত্র ও রিপোর্টের কথা উল্লেখ করেই কমিউনিস্ট পার্টি ও 'জনযুদ্ধ' নীতিকে আক্রমণ করেছেন।[১৩]

প্রয়াত প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা ও তাত্ত্বিক বুদ্ধিজীবীরূপে খ্যাত দিলীপ বসু কিন্তু তাঁর গবেষণা-নিবন্ধে ডঃ অধিকারী, অধ্যাপক কবিরাজ ও ডাঃ সেন— এই তিনজনেরই উপরোক্ত অভিমত ও চিন্তাধারার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন এবং তৎকালীন পরিস্থিতিতে কমিউনিস্ট পার্টির 'জনযুদ্ধ'-লাইনের অভ্রান্ততাকে সমর্থন জানিয়ে লিখেছেন :

"...যুদ্ধের এই স্তরে যুধ্যমান দুই পক্ষের মধ্যে একদিকে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন অন্যদিকে ফ্যাসিস্ত জার্মানি। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এই যুদ্ধের জয়-পরাজয়ে নিষ্ক্রিয় বা উদাসীন থাকতে পারে না, যুদ্ধের বিরোধিতা করার তো প্রশ্নই ওঠে না, কারণ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে জয়লাভের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গাঙ্গী পূর্বশর্ত হল যুদ্ধে সোভিয়েতের জয় ও ফ্যাসিস্ত-দের পরাজয়—এককে বাদ দিয়ে অন্যকে ভাবা বাতুলতা মাত্র।"[১৪]

অবশ্য দিলীপ বসুর অভিমতের সঙ্গে ডাঃ রণেন সেন-এর বিশ্লেষণের অনেকটাই মিল খুঁজে পাওয়া যায়। জনযুদ্ধের যুগে কমিউনিস্ট পার্টির গৃহীত কোনো কোনো সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা থাকলেও ডাঃ রণেন সেন ঐ একই নিবন্ধে গুরুত্বের সঙ্গে এটাও উল্লেখ করেছেন যে, 'দেউলী জেল-দলিলে' কিছু ভুল থাকলেও (যথা, নাৎসীবাদের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টি ও সাম্রাজ্যবাদের যুক্ত জোট গঠন করা প্রয়োজন প্রভৃতি রায়বাদী ভ্রান্ত বক্তব্য) মোটের উপর মূল বিষয় সঠিক ছিল। দলিলটির প্রধান সার্থকতা ছিল এটাই যে, ঐ দলিলটি যুদ্ধের রূপান্তরকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পেরেছিল এবং সাম্রাজ্যবাদ ও বুর্জোয়া-শ্রেণী থেকে নিজের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষার কথাও বলেছিল। তাছাড়া সংস্কারবাদী ভুলত্রুটি সত্ত্বেও দুর্ভিক্ষের সময়, অধিক খাদ্য ফলাও আন্দোলনে, ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনে কমিউনিস্ট পার্টির অবদান সামান্য ছিল না। পার্টির মূল জনযুদ্ধের নীতি ও ধ্বনি সঠিক ছিল এবং সঠিক ছিল জাতীয় ঐক্য ও জাতীয় সরকার গঠনের আওয়াজও।

প্রকৃতপক্ষে, সেই সময়কার পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও আন্তর্জাতিক ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলন পরস্পর সম্পৃক্ত থাকাই উচিত ছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন হিটলার-জার্মানীর বিরুদ্ধে মরণবাঁচন যুদ্ধে লিপ্ত, সেই সঙ্কটপূর্ণ মুহূর্তে ১৯৪২-এর আগস্ট মাসে হিটলারের নাৎসীবাহিনী মস্কোকে পাশ কাটিয়ে দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছে স্তালিনগ্রাদের দিকে। স্তালিনগ্রাদকে দখল করার পর তার উদ্দেশ্য ছিল ককেশাসের ভিতর দিয়ে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ভেদ করে দিল্লী আসা, আর এর সঙ্গে জাপানও (যে-জাপান ৮ই মার্চ, ১৯৪২-এ বর্মা দখল করে বসে আছে) ভারতের পূর্বদিক বাঙলাদেশ থেকে আক্রমণ করবে এবং দিল্লীতে এসে অক্ষশক্তির সঙ্গে মিলিত হবে। এইভাবে সারা ভারতে যদি ফ্যাসিস্ত অক্ষশক্তি তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারত, তাহলে শুধু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিবাদের পক্ষেই পাল্লা অনেক বেশি ভারী হয়ে পড়ত না, এর ফলে ভারতের স্বাধীনতাও হতো সুদূরপরাহত। এই প্রসঙ্গে প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা এম. বাসবপুন্নাইয়া লিখেছেন:

"একবছরের মধ্যেই মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের উপর ফ্যাসিবাদী বিজয় সম্পূর্ণ হয়েছিল; নাৎসী জার্মানী যুদ্ধ শুরু করার ৯ মাস পরে, ১৯৪০ সালের জুনের মধ্যে ফরাসী আত্মসমর্পণ সাঙ্গ হল; গ্রেট ব্রিটেন নাৎসী লুফৎওয়াফের দ্বারা প্রকৃতপক্ষে অবরুদ্ধ এবং মারাত্মক বোমা আক্রমণের শিকার ছিল; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে পার্ল হারবার আক্রমণের ফলে জাপানী ফ্যাসিবাদের হাতে নাস্তানাবুদ হচ্ছিল। দঃ পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্রগুলির উপর আক্রমণ, আফ্রিকা মহাদেশে রোমেলের সৈন্যবাহিনীর অনুপ্রবেশ, বিশ্বের অক্ষশক্তির দ্বারা বিশ্বজয়ের অভিলাষে নামা এবং নাৎসী হানাদার কর্তৃক ১৯৪১ সালের জুন মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর আক্রমণ—এসব বিষয়গুলি একসঙ্গে জড়িত হয়ে যুদ্ধের চরিত্র এবং পৃথিবীর মানুষ এবং জাতিগুলির উপর এর তাৎপর্যের ক্ষেত্রে একটি মৌলিক পরিবর্তন আনল।"[১৫]

কিন্তু এই সংকটজনক মুহূর্তে কংগ্রেস নেতৃত্বের দু'চারজন ছাড়া আর সকলেই যুদ্ধ-পরিস্থিতির তাৎপর্য সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। অবশ্য জওহরলাল নেহরু বা আবুল কালাম আজাদের মতো নেতারা ব্যতীত অন্য কেউই প্রায় ফ্যাসিবাদের ঘনায়মান বিপদ এবং জাতীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তার সুদূর-প্রসারী প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে মোটেই তেমন সচেতন ছিলেন না। এছাড়া গান্ধীজীর আপসমূলক নীতির কথা তো আজ ঐতিহাসিক সত্য। যুদ্ধ যখন সাম্রাজ্যবাদী স্তরে ছিল (১৯৩৯-৪১) তখন গান্ধীজী ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সঙ্গে দরকষাকষি ও আপস-আলোচনায় বৃথা কালহরণ করেছেন। আসলে বৃহৎ বুর্জোয়াদের স্বার্থেই তিনি কোনো ব্যাপক গণআন্দোলন শুরু করতে চাননি। অথচ সেই সময় কলে-কারখানায়, ক্ষেতে-খামারে সর্বত্র কমিউনিস্টরা তাদের সীমিত সাংগঠনিক ক্ষমতা নিয়েই ধর্মঘট ও বিক্ষোভ-আন্দোলনের দ্বারা ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে যথেষ্ট বিব্রত করে তুলেছিল।

এই কারণেই দেখা যায়, ১৯৪২-এর ২২শে জুলাই কমিউনিস্ট পার্টিকে 'আইনী'

ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত খোদ ব্রিটেনের যুদ্ধকালীন মন্ত্রীসভা গ্রহণ করলেও ভারতের ব্রিটিশরাজ'এই ব্যাপারে মোটেই খুশি ছিলেন না। তখনকার ভাইসরয় লিনলিথগোর সঙ্গে লণ্ডনস্থিত সেক্রেটারি অফ স্টেট এমেরির এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের গভর্নরদের যেসব চিঠিপত্র আদান-প্রদান হয়েছিল তাতে দেখা যায়, জনযুদ্ধের যুগে কমিউনিস্টদের শক্তিবৃদ্ধিতে তাঁরা যথেষ্ট শঙ্কিত বোধ করেছিলেন।[১৬] এম. এন. রায়-গোষ্ঠী সম্পর্কে এই আশঙ্কা কিন্তু ব্রিটিশদের মনে ছিল না। কোনো অবস্থাতেই কমিউনিস্টরা যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছে আত্মসমর্পণ বা আনুগত্য স্বীকার করেনি এর প্রমাণ হলো—জনযুদ্ধ-পর্যায়েও কমিউনিস্ট পার্টি'র নেতৃত্বে সারা ভারতে অসংখ্য শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল ন্যায্য দাবিদাওয়া আদায়ের জন্য। কেরালার মালাবার জেলার কায়ুর গ্রামের চারজন কৃষকসন্তান কমিউনিস্ট সদস্যের ফাঁসির (১৯৪৩) কথা এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাছাড়া অসংখ্য কমিউনিস্ট নেতা ও কর্মী সেই সময়ে ব্রিটিশ কারাগারে নানা অভিযোগে বন্দীজীবন কাটাচ্ছিলেন। ম্যাক্সওয়েলকে লেখা যোশীর পত্রে এই অভিযোগই বারংবার ধ্বনিত হয়েছিল।[১৭]

একথা সর্বজনবিদিত যে, কমিউনিস্ট পার্টি ঐ সময় 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেনি। 'জনযুদ্ধের নীতি'-র ফলেই এই আন্দোলনে যোগ না দিয়ে তারা নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। এই রণকৌশলগত ত্রুটির ফলে হয়তো কমিউনিস্টদের পরবর্তীকালে চূড়ান্ত রাজনৈতিক অসুবিধা ও ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল, কিন্তু তারা নীতিভ্রষ্ট হয়েছিল একথা বোধহয় বলা চলে না। কারণ, ফ্যাসিবাদের ধ্বংসসাধনই ছিল সেই সময়কার যে-কোনো শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এবং গণতান্ত্রিক শক্তির প্রধান লক্ষ্য। বাসবপুন্নাইয়া অত্যন্ত সঠিকভাবেই আত্মসমালোচনার ভিত্তিতে মত প্রকাশ করে লিখেছেন :

"যুদ্ধের পরিবর্তিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের যথাযথ মূল্যায়ন করে সি. পি. আই সেদিন তার রণকৌশল নির্ধারণ করেছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণের সংগ্রামকে কেন সক্রিয়ভাবে সেদিনের ক্রমবর্ধমান ফ্যাসিবাদী আতঙ্কের বিরুদ্ধে বিশ্বের পরাধীন জনগণের সংগ্রামে যুক্ত করতে সি. পি. আই ব্যর্থ হয়েছিল এবং ভুল কোথায় ছিল, তাও ১৯৪৮ সালেই তারা বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু সি. পি. আই-র **রণকৌশলের এই ত্রুটিকে** কোনোভাবেই সাম্রাজ্যবাদের প্রভুত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং ফ্যাসিবাদের থাবা থেকে সমস্ত মানবজাতিকে মুক্ত করার সাধারণ সংগ্রামে প্রয়োজনীয় মৌলিক সম্পর্ক'কে নস্যাৎ করার জন্য বিশ্লেষণ করা ঠিক হবে না।"[১৮] [বড় হরফ আমার—সু. দা]

এই প্রশ্ন অবশ্যই উঠতে পারে যে, কমিউনিস্টরা 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলনে যোগদান করলেই কি দেশে স্বাধীনতা এসে যেত ? কমিউনিস্ট পার্টি কি আদৌ তখন দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তেমন কোনো নিয়ামক শক্তি রূপে গণ্য ছিল ?

যেহেতু কমিউনিস্ট পার্টি তা ছিল না, সেইহেতু অমনটি তারাও নিরর্থক। 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলন শুরু হয়েছিল বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন, নেতৃত্ববিহীন, অসংগঠিত ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট মাত্র ৬ মাসের মধ্যেই এই সহিংস গণবিক্ষোভকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে দমন করতে সমর্থ হয়েছিল এবং এজন্য দায়ী ছিল কংগ্রেস-নেতৃত্বের পরিকল্পনা ও দূরদৃষ্টির অভাব। আজ একথা সকলেই জানেন যে, আন্দোলন শুরু করার কোনো নির্দেশই কংগ্রেস-নেতৃত্ব দেননি। নেতারা বন্দী হওয়ার পরেই (৯ই আগস্ট, ১৯৪২) অসংগঠিত ও বিক্ষুব্ধ জনগণ নিজেরাই সহিংস সংগ্রাম শুরু করে দেয়, যার দায়িত্ব জেলেবন্দী কংগ্রেস-নেতৃত্ব কখনোই নেননি, যদিও একেবারে নীচুতলার কংগ্রেসকর্মীরা এই আন্দোলনে নিজেদেরকে স্বাভাবিক কারণেই যুক্ত করেছিলেন। সুতরাং যে-আন্দোলনে শীর্ষস্তরের কংগ্রেস-নেতৃত্ব কোনোভাবেই যুক্ত ছিলেন না, সেই আন্দোলনে কমিউনিস্টদের যুক্ত না থাকাটা, ফ্যাসিবাদের সেই চরম বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে, খুবই কি বিস্ময়কর ঘটনা ছিল? এতদ্‌সত্ত্বেও কমিউনিস্ট পার্টি জেলে আটক কংগ্রেস-নেতৃত্বের মুক্তির দাবিতে এবং কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের ঐক্যের ভিত্তিতে জাতীয় সরকার গঠনের দাবিতে যেমন সোচ্চার ছিল, তেমনি আন্দোলনকারীদের উপর ব্রিটিশ সরকারের দমননীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদেও ছিল মুখর। এই জটিলতম পরিস্থিতিতেই কমিউনিস্ট পার্টি তার কর্মীবাহিনীকে আহ্বান জানিয়ে নির্দেশ দিয়েছিল—'উন্মত্ত জনতা ও মারমুখী পুলিশের মাঝখানে দাঁড়াও।' বস্তুতপক্ষে, কমিউনিস্ট পার্টি সেই সময়ে আন্তর্জাতিক ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলন ও দেশের জাতীয় আন্দোলন—এই দু'য়ের মধ্যে কোনো চীনের প্রাচীর তুলতে চায়নি। যথার্থ কারণেই তারা ভেবেছিল যে, ফ্যাসিবাদকে ধ্বংস করতে পারলেই সাম্রাজ্যবাদও দুর্বল হয়ে পড়বে (তা হয়েও ছিল) এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামও তার সাফল্য অর্জনে সমর্থ হবে। যাহোক, এই প্রসঙ্গে দিলীপ বসু তাঁর নিবন্ধে যে সমালোচনা করেছেন, সেটাই সম্ভবত গ্রহণযোগ্য বক্তব্যরূপে বিবেচিত হতে পারে। তিনি লিখেছেন:

"...১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলন সম্পর্কে আমাদের পার্টির রণনীতিগত (**Strategic**) পলিসি সঠিক থাকলেও রণকৌশলগত (**Tactical**) প্রশ্নে ঐ সঠিক লাইনকে কার্যকরী করতে গিয়ে কিছু কিছু ভুলভ্রান্তি হয়েছে, সেটাও এই সঙ্গে বলা দরকার।

"স্টালিনগ্রাডে সোভিয়েতের বিজয়ের পরে (ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩), বিশেষ করে ৬ জুন ১৯৪৪ সালে পশ্চিম ইয়োরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলবার পরে যখন বোঝা গেল যুদ্ধে ফ্যাসিবাদ পরাস্ত হবেই, তখন আমরা কোনো কোনো স্থানে সরাসরি যুদ্ধ-প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে পারতাম।"[১১]

মোট কথা, সেই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে (অর্থাৎ 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলন) একা কমিউনিস্ট পার্টিই কিন্তু সম্পর্কচ্যুত ছিল না;

এই আন্দোলনের থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল হিন্দু মহাসভা, মুসলিম লীগ এবং জাতীয় কংগ্রেসের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, জিন্না বা চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারি তো ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সর্বদাই সহযোগিতা করে গেছেন এবং তা কোনো আদর্শ বা নীতির কারণে নয়, সম্পূর্ণতই দলীয় ও শ্রেণীস্বার্থেই তাঁরা তা করেছিলেন। কিন্তু এই প্রশ্নে তাঁদের কি কেউ দেশদ্রোহী বলবেন? অথচ দেখা যাচ্ছে, এ-ব্যাপারে শুধুমাত্র কমিউনিস্টদের দায়ী করেই তাঁদের প্রতি বারংবার অঙ্গুলিনির্দেশ করা হয়েছে। এমনটা হওয়া সত্যিই ইতিহাস-চেতনার লক্ষণ নয়।

প্রসঙ্গত আরো একটা বিষয় উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন। সেটি হলো—ঐ সময়কালেই সমালোচিত কমিউনিস্ট পার্টির জনপ্রিয়তা ও সাংগঠনিক ক্ষমতার অসাধারণ বৃদ্ধি। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে, অর্থাৎ বাঙলা, অন্ধ্র, কেরালা, বিহার, পঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে আনুপাতিক হারে কমিউনিস্ট পার্টি আর তার শাখাসংগঠনগুলির প্রভাব ও সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এটা ঘটেছিল উক্ত জনযুদ্ধের যুগেই। বিশেষ করে বাঙলার কমিউনিস্ট পার্টি ও তার গণসংগঠন-গুলির বৃদ্ধির হার নিম্নবর্ণিত পরিসংখ্যান থেকেই জানা যায়: [২০]

১৯৪১, জানুয়ারি (লেনিন-দিবস)	১৯৪৩, মে (মে-দিবস)	১৯৪৪ (১লা মে)
পার্টি সদস্য→৯, ৩০৮	১৫, ৫৬৩	৫১, ১২৫
সর্বক্ষণের কর্মী→২, ০১৫	২, ৬৩৭	
শ্রমিক ফ্রণ্ট→১৯৬,৬২০	৩০১, ৪০০	
ছাত্র ফ্রণ্ট→২৫, ৮২১	৩৯, ১৫৫	
মহিলাফ্রণ্ট→২২, ৪০০	৪১, ১০০	
কিশোর বাহিনী→৬, ৪০০	৯, ০০০	
জনরক্ষা স্বেচ্ছাসেবক→২৪, ৬১০	৩২, ১৬৬	

এমনকি প্রাদেশিক কৃষকসভার রংপুর সম্মেলনে (১৯৪২) যে-সদস্য সংখ্যা ছিল ৩৫ হাজার মাত্র, তিন বছর পরেই খুলনা সম্মেলনে (১৯৪৫) সেই সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ২ লক্ষ ১৭ হাজার ৩ শত।[২১]

এই পরিপ্রেক্ষিতে স্পষ্টই বলা যায় যে, জনযুদ্ধের সময় থেকেই কমিউনিস্ট পার্টি এক নবজাগ্রত শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করে এবং শ্রমজীবী জন-সাধারণের এক বড় অংশের সমর্থন লাভ করে। জনগণ-বিচ্ছিন্ন কোনো পার্টির পক্ষে তার শক্তি ও সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি কিছুতেই এত দ্রুত সম্ভব হতে পারে না। সুতরাং কমিউনিস্টরা জনযুদ্ধের যুগে জনসাধারণ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল, এই

অভিযোগ খুবই একপেশে এবং তথ্যভিত্তিক নয়।

যাহোক, ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সংগ্রাম ও আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে হিট-লারের পরাজয় ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে। যুদ্ধপরবর্তীকালে '৪৬-এর দাঙ্গা, বন্দীমুক্তি আন্দোলন, আজাদ হিন্দ সেনানীদের বিচার, নৌবিদ্রোহ, তেভাগা আন্দোলন, ধর্মঘট, ছাত্রবিক্ষোভ প্রভৃতির ফলে বাঙলার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ছিল কম্পমান। এই পরিস্থিতিতে ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলন ক্রমশই তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলতে থাকে। যদিও পরবর্তীকালে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধাবার সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-বিরোধী শান্তিআন্দোলন 'গণনাট্য সঙ্ঘ', 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি', 'শান্তি ও সংহতি পরিষদ' এবং 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘে'র নেতৃত্বে বহুদিন পর্যন্তই সক্রিয় ছিল।

সর্বশেষে বলা যায়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ফ্যাসিবাদের পরাজয় ঘটেছে, একথা সত্য। কিন্তু যে-সাম্রাজ্যবাদী শক্তির গর্ভে ফ্যাসিবাদের জন্ম সেই সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের দুর্বার আন্দোলনের ফলে দুর্বল হলেও নতুন রূপে ও কৌশলে বেঁচে থাকার মরিয়া প্রচেষ্টায় রত। সুতরাং ফ্যাসিবাদের ঘৃণ্য মতাদর্শ নতুন পোশাকে, নতুন কায়দায়, পুনরুজ্জীবিত হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে, বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যখন নক্ষত্রযুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছে, তখন বিশ্বের প্রতিটি সৎ এবং শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সচেতন মানুষের আরও সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। কারণ, ইতিহাস আমাদের শিখিয়েছে যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিবাদের পরাজয় না ঘটলে গণতন্ত্র বিলুপ্ত হতো, সমাজতন্ত্রের দুর্গ সোভিয়েত ইউনিয়ন ধ্বংস হয়ে যেত, পৃথিবীর বুক থেকে লুপ্ত হয়ে যেত মানব-সভ্যতা ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলি। আর, ফ্যাসিবাদ পরাজিত হয়েছিল বলেই তো আমরা দেখতে পেলাম ইউরোপের ৮টি দেশে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অভ্যুদয়, এশিয়া-আফ্রিকা ও ল্যাতিন আমেরিকার দেশে দেশে পরাধীন আর নিপীড়িত জাতির দুর্বারগতি মুক্তিসংগ্রাম এবং তার মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে ৫৪টি ঔপনিবেশিক দেশের জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন।

এই সব কিছুর সম্মিলিত ফলেই বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদী শক্তি দুর্বলতর হয়েছে এবং সমাজতান্ত্রিক শিবির হয়েছে অধিকতর শক্তিশালী। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশক থেকে যেসব বরেণ্য মনীষী সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন, যে-সংগ্রামে বলিষ্ঠভাবে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আমাদের কবিসার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে বহু প্রখ্যাত শিল্পী-সাহিত্যিক-বিজ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবীসহ অগণিত শ্রমিক-কৃষক ও মেহনতী মানুষের অগ্রগামী এক ব্যাপক অংশ, অবিভক্ত বাঙলা সেই ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সংগ্রামে তাঁদেরই নেতৃত্বে অগ্রণীর ভূমিকা পালন করেছিল, একথা আজ গর্বের সঙ্গেই আমরা স্মরণ করতে পারি।

নির্দেশিকা

এই গ্রন্থে অসংখ্য খ্যাত-অখ্যাত ব্যক্তি, রাজনৈতিক দল, গণসংগঠন, পুস্তক-পুস্তিকা, পত্র-পত্রিকা এবং তথ্যদলিলের নাম লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। পাঠকের সুবিধার্থে এইসব নামবাচক শব্দের বর্ণানুক্রমিক একটি নির্দেশিকা রচনা করা প্রয়োজন। কিন্তু কাজটি সহজসাধ্য নয়। বিশেষত এই গ্রন্থের প্রায় সর্বত্রই জাতীয় কংগ্রেস, কমিউনিস্ট পার্টি এবং মুসলিম লীগের কথা আলোচিত হয়েছে। সুতরাং এই তিনটি ক্ষেত্রে বর্ণানুক্রমিক নির্দেশিকার কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। তাই এই তিনটি রাজনৈতিক দল ব্যতীত অন্যান্য রাজনৈতিক দলসহ নামবাচক শব্দের বর্ণানুক্রমিক নির্দেশিকা প্রস্তুত করতে সচেষ্ট হয়েছি। এই শ্রমসাধ্য কাজে যদি কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে, আশা করি পাঠকেরা নিজগুণে তা ক্ষমা করবেন। —লেখক

খ

গ

১৮

ত্রুটি স্বীকার

এই গ্রন্থের মুদ্রণকালে যথেষ্ট সতর্ক থাকা সত্ত্বেও প্রেসের ভূতের দৌরাত্ম্য থেকে রক্ষা পাওয়া যায়নি। মুদ্রিত ফর্মা হাতে আসার পর কয়েকটি ভুল আমার দৃষ্টি-গোচর হয়েছে। যেমন, ৯৪ পৃষ্ঠায় চতুর্থ অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় পংক্তিতে '১৯১৪-১৮ সালের' পরিবর্তে মুদ্রিত হয়েছে '১৯৪১-১৮' সাল কিংবা ২৬১ পৃষ্ঠার চতুর্থ অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় পংক্তিতে 'খুলনা সম্মেলনে (১৯৪৬)'-এর পরিবর্তে ছাপা হয়েছে '(১৯৪৫)' সাল। এছাড়া আরও দু-চারটি বানান ভুলও আছে। কিন্তু সেগুলি পাঠকেরা সহজেই বুঝতে পারবেন বলে এই গ্রন্থে কোনো শুদ্ধপত্র সংযোজন করা হলো না। —লেখক